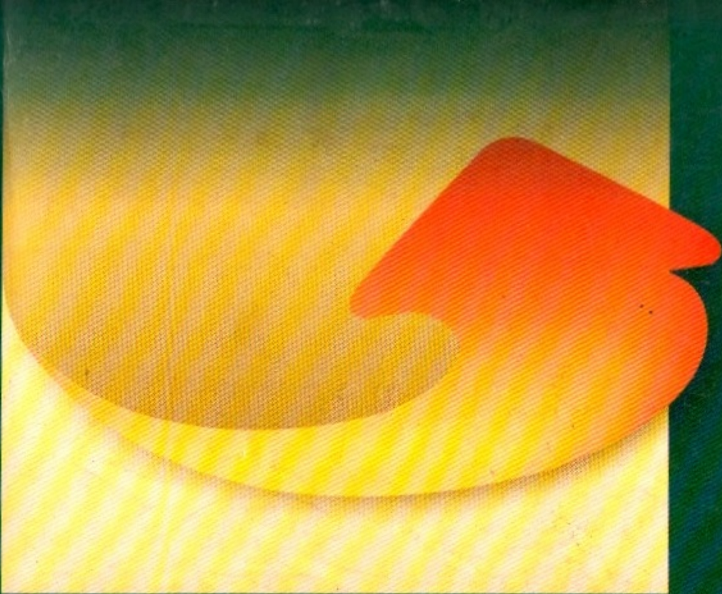

বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস

নওয়াব সলীমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া

আবুল কাসেম হায়দার
সোহেল মাহমুদ

বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস

নওয়াব সলীমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া

আবুল কাসেম হায়দার

সোহেল মাহমুদ

প্যানোরমা পাবলিকেশন, ঢাকা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস
নওয়াব সলীমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া

আবুল কাসেম হায়দার
সোহেল মাহমুদ

প্রকাশকাল
আশ্বিন, ১৪০৬ বাংলা
অক্টোবর, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক
প্যানোরমা পাবলিকেশন্স
৮২২/২ রোকেয়া সরণী, মীরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৮১৬৭২৩, ৮১৬৭২৫

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
বেগম সানজীদা আইয়ুব

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১, ডি. আই. টি. এক্সটেনশন রোড
ঢাকা-১০০০, ফোন: ৪১৯৬৫৪

পরিবেশক
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা, বাড়ী নং-৭
সড়ক নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

প্রাপ্তিস্থান
বুক স্টল, ৩১৭, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা
কারেন্ট বুক সেন্টার, জলসা সিনেমা মার্কেট, চট্টগ্রাম

মূল্য
২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)

Bangladesher Unnyaner Itihas Nawab Salimullah theke Khaleda Zia. Abul Quasem Haidar & Sohel Mahamud Published by Panaroma Publication 822/2, Rokeya Sarani, Mirpur, Dhaka-1216 Price: Taka 250.00 (Two Hundred & Fifty) US $ 10

ISBN 984-31-0529-X

www.pathagar.com

যারা বাংলাদেশের উন্নয়নের অবিকৃত ইতিহাস
জানতে আগ্রহী
সে সকল সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকদের
উদ্দেশে নিবেদিত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭-১০

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১১-৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ ৩৭-৬৬

তৃতীয় অধ্যায়
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ৬৭-১১৬

চতুর্থ অধ্যায়
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১১৭-১৫৯

পঞ্চম অধ্যায়
মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১৬১-২০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ২০৫-২৩২

সপ্তম অধ্যায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩৩-২৯৫

অষ্টম অধ্যায়
জিয়াউর রহমান ২৯৭-৩২৬

নবম অধ্যায়
হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ৩২৭-৩৬৮

দশম অধ্যায়
বেগম খালেদা জিয়া ৩৬৯-৪১৫

একাদশ অধ্যায়
শেখ হাসিনা ৪১৭-৪৫৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

"Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them."
—George Bernard Shaw

ইতিহাস হচ্ছে মানব জাতির এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস হচ্ছে খণ্ডিত ও বিকৃত, আবার কখনো বা সংকীর্ণতায় আড়ষ্ট। ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরার জন্য অবশ্য লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ নিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মূল্যায়ন যথার্থ হতে পারে না। তাই সত্যের সাক্ষ্য দানের জন্য ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও মতাদর্শের ব্যাপারে উদার। ইতিহাসের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে যার যা পাওয়ার যোগ্যতা আছে তাকে সেটি দেয়াই হচ্ছে ন্যায় বিচার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইতিহাস কারো বেলায় নির্মম, আবার কারো ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় পক্ষপাতদুষ্ট। সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নে যার যা ভূমিকা তার স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাস রচনা করা সত্যানুরাগী ও প্রত্যয়ী লেখকদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। ঠিক এ দায়িত্বানুভূতি থেকেই পুস্তকটি রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘকাল ধরে উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এর ফলশ্রুতিতে চলতি শতাব্দীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে মহাদুর্যোগ। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ গঠন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভূত অবদান রেখেছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা লাভের পেছনে ছিল জনগণের বিপুল প্রত্যাশা। কিন্তু পাকিস্তানী রাজনীতিকদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও শোষণ প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের। বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জীবন মানের উন্নয়ন এবং শান্তিতে বসবাস।

জনগণের প্রত্যাশা তথা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও রাজনৈতিক সংগঠন কাজ করেছে। বিশেষ করে স্বনামধন্য রাজনীতিকরা দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। আবার কারো রাজনৈতিক জীবনে হয়তো বাগাড়ম্বর

www.pathagar.com

বেশী পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু প্রকৃত জনকল্যাণে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য নয়। বিগত এক শতাব্দীতে বাংলাদেশের এ ভূখণ্ড ও তার আশে পাশে বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শাসন, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, সামরিক শাসন, গণতন্ত্রের নামে প্রহসন, স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের প্রয়াস এখনো চলমান। এর মধ্যে ভৌগলিক সীমারেখার পরিবর্তনও ঘটেছে। সার্বিকভাবে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের জনগণ বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ কোন সুদূরপ্রসারী সাফল্যের মুখ দেখেনি। বরং শোষণ-বঞ্চনা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটে গেছে তাদের জীবন। শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য বিকাশ সাধিত হয়েছে। তবে অর্থনীতিতে বড় রকমের উল্লম্ফন না ঘটলেও কোন কোন খাতে ক্রমঃপুঞ্জিত সাফল্য উপেক্ষার মত নয়।

মোগল শাসনামলে বা তার পূর্বে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকরূপে জনকল্যাণে নিবেদিত ছিল না। সরকারের দায়িত্বের পরিধিও ছিল সীমিত। ফলে অর্থনীতিতে সুপরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার জনগণ কেবল শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে উন্নয়নের প্রত্যাশা করা ছিল পরিহাস মাত্র। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর নব উদ্দীপনা নিয়ে নতুন দেশ গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন খাতে বেশ সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোতে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধায় পাকিস্তান রাষ্ট্র মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। শোষক ও নিপীড়কের খপ্পর থেকে উদ্ধার পেয়ে সুযোগ এলো স্বকীয়তা নিয়ে এগিয়ে চলার। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা আজো অর্জিত হয়নি। প্রত্যাশা ও বাস্তবতার পার্থক্য বিশাল। যাই হোক দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার নিরিখে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকার সর্বদাই শুনিয়েছেন আশার বাণী, নীতি ও পরিকল্পনার বড় বড় কথা। কিন্তু নিক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তাদের অবদানটুকু জাতির সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

বিশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাছাই করে এ পুস্তকের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ এদেশের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বল্পকালে বঙ্গবিভাগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। এ সময়ের মুসলিম রাজনীতিকদের মধ্যে নওয়াব সলীমুল্লাহ ছিলেন অগ্রণী। এ ভূখণ্ডের শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যায়ে বাংলার নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু

www.pathagar.com

হলে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ফজলুল হক শুধু ক্ষমতার রাজনীতি নয় ; জমিদার ও মহাজনদের শোষণের হাত থেকে বাংলার কৃষকদের রক্ষার জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। বৃটিশ যুগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ সংগঠন গড়ে তোলার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিরামহীন প্রচেষ্টা চালান। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সময়ের সাহসী সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে ছিলেন অসাধারণ। বহু চড়াই-উৎরাইয়ের পরে যখন পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন (১৯৫৮) অপ্রত্যাশিতভাবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন। তাঁর শাসনামলে একদিকে রাজনীতিতে স্বৈরাচার কঠিন রূপ নিয়ে এক দশক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, অপরদিকে পূর্ব বাংলায় প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বৈষম্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

১৯৭১ সালে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভিযাত্রা শুরু হয় ক্যারিশম্যাটিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শোষণ-বৈষম্যহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং এজন্য বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু তিনি অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের উন্নয়ন ও রাষ্ট্র শাসনে সফলতা দেখাতে পারেননি।

জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছিলেন ঘটনা পরম্পরায়। তিনি সামরিক শাসক হয়েও বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং দেশে পরিবর্তনের একটি ধারা সূচনা করতে সক্ষম হন। জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নির্বাচিত সরকারকে বন্দুকের মুখে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করেন এবং প্রায় ৯ বছর ক্ষমতায় থাকেন। তাঁর শাসনামলে কোন কোন সেক্টরে কিছু অগ্রগতি হলেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বিরাট প্রশ্নবোধক সৃষ্টি হয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা যথাক্রমে সরকার গঠন করেন। বেগম জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা গতি সঞ্চারিত হয়। শেখ হাসিনার শাসনামলের প্রথম তিন বছরে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মাত্রা পরিলক্ষিত হয়নি।

www.pathagar.com

গত একশ' বছরে বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের যে সকল নজীর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা উল্লেখিত দশজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকার প্রধানের শাসনামলের কর্মকাণ্ডের বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান.১১টি অধ্যায়ে এ পুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে। এ পুস্তক প্রকাশের সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের এসময়কালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শেষ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য একটি সরকারের সামগ্রিক সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিধি চিত্রায়নের জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছরের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা দরকার। সে বিবেচনায় শেখ হাসিনার সরকারের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়।

পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রথম অধ্যায়ে ভিন্নধর্মী একটি নিবন্ধ সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্ভরযোগ্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পাঠকদের জন্য পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিকদের সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন চুলচেরা মূল্যায়ন করা হয়নি। তবে পাঠকদের অবগতির জন্য সমসাময়িক সমালোচকদের বক্তব্য কিঞ্চিত তুলে ধরা হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নের দায়িত্ব পাঠক ও গবেষকদের জন্য অবশিষ্ট রইল। বস্তুত ইতিহাসের প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্যগুলো পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে একটা কর্তব্য পালনের অনুভূতি থেকেই পুস্তকটি রচনার জন্য লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পাঠক সমাজ এর দ্বারা সামান্যতম উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

আবুল কাসেম হায়দার
সোহেল মাহমুদ

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

"Politics in Bengal in the reality economics of Bengal."
-Sher-E-Bangla A.K. Fazul Haq

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মত বাংলাদেশও দীর্ঘকাল ধরে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিংবদন্তির 'সোনার বাংলা' ইতিহাস পর্যালোচনায় এদেশের পূর্ণাংগ চিত্র নয়। কালের পরিক্রমায় চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে অর্থনীতি অগ্রসর হলেও এদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা সার্বিকভাবে কোনদিনই উন্নততর ছিল না। শাসক গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিত্ত-বৈভবের উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটলেও সাধারণ জনগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে সাদা-সিধে জীবনমান নিয়ে সর্বদাই অস্তিত্বের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। আজো একই অবস্থা চলছে।

প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ, আর্য-দ্রাবিড়দের সংঘাতের যুগ, বৌদ্ধ শাসনামল, হিন্দুদের শাসনকাল, মুসলমানী আমল, বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগ ও পাকিস্তানী-শাসনামল অতিক্রম করে বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত বহু রাজা-বাদশা, নবাব-সম্রাট, লাট-জেনারেল, গভর্নর-প্রেসিডেন্ট এ ভূখণ্ডে তাঁদের শাসনকার্য চালিয়েছেন। তাদের শৌর্য-বীর্য, যুদ্ধ-সংগ্রাম, বিত্ত-ঐশ্বর্যের কাহিনীতে ইতিহাসের পাতা ভরপুর। কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সুখ-দুঃখের কথা ইতিহাসে বিরল। প্রাচীনকালের অর্থনীতির কথা জানা যায় না বললেই চলে। মধ্যযুগের যতটুকু পাওয়া যায় তা প্রধানত বিদেশী পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে। বৃটিশ আমলের ইতিহাস থেকে আমরা এদেশের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতার মোটামুটি চিত্র পাই।

আধুনিককালের মানুষ দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রত্যাশী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে পাশ্চাত্যের এবং দূরপ্রাচ্যের অনেক দেশ বস্তুগত অগ্রগতির শীর্ষে পৌঁছে গেছে। তাই ঐ সব দেশের প্রতি বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের সৃষ্টি হয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। মানুষ এখন চায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনমান। তারা চায় সুষম আয় ও বন্টন ব্যবস্থা, উন্নত অবকাঠামো ও সন্তোষজনক সার্ভিস। কিন্তু বাংলাদেশ আজো এসব ক্ষেত্রে যোজন যোজন পেছনে পড়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক প্রজন্মের কাছে প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে—বাংলাদেশ কী

www.pathagar.com

চিরকালই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল নাকি 'সোনার বাংলা'র বাস্তব স্বর্গ এদেশে একসময় ছিল? আরো প্রশ্ন জাগছে, এদেশে যারা শাসন করেছেন, তাঁরা কি শুধু শোষণই করেছেন নাকি জনগণের কল্যাণে কাজও করেছেন? যারা ক্ষমতায় ছিলেন না, কিন্তু জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদের ভূমিকাই বা কী ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্যই এ গ্রন্থের অবতারণা। এতে বাংলাদেশের ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নির্দিষ্ট সময়কালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যেমনঃ (ক) মুসলিম শাসনামল (১২০০-১৭৫৭); (খ) ইংরেজ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭); (গ) পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১); এবং (ঘ) বাংলাদেশ আমল (১৯৭২-১৯৯৯)। তবে মুসলিম ও ইংরেজ শাসনামলের অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী আলাদা নিবন্ধে এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্রকে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার জীবনকাল বর্ণনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এদেশের আধুনিক ইতিহাসে যে ক'জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকার বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে। দেশের সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতিপ্রবাহ বিশেষতঃ জনগণের কল্যাণের রাজনীতি যথার্থ অর্থেই কতটুকু পরিচালিত হচ্ছে তার একটি চিত্র এতে প্রতিফলনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ

খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির সুস্পষ্ট তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ২৪০০ বছর আগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এসময় বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ৩২০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় প্রধান অংশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। বৌদ্ধরা ১১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করে। এরপর শুরু হয় হিন্দু সেন বংশের রাজত্বকাল। তারা প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় শাসনকার্য চালায়। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া ও লক্ষণাবতী অভিযানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলায় মুসলিম শাসন।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের বিপর্যয় পর্যন্ত মুসলিম শাসন বহাল থাকে। এরপর আসে বৃটিশ বেনিয়াদের শাসন। মুসলিম-পূর্ব বাংলায় মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষি ও পশুপালন। হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনামলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহর গড়ে ওঠে। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুরা পারস্য, আরব, চীন ও আফ্রিকা পর্যন্ত বহির্বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে মুসলমান বণিকগণ নিকট প্রাচ্য

www.pathagar.com

বিশেষতঃ ভারতীয় বণিকদের নিকট থেকে বাণিজ্য দখল করে নেয় এবং ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে এদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটলেও তারা সাথে করে নিয়ে আসে ইসলাম ধর্মের মহান আদর্শ। ইসলাম প্রচারের সুবাদে এখানে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলায় মুসলমানরা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসনকার্য চালায়। এ যুগের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও কৃষি প্রধান। কুটির শিল্পও চালু ছিল। মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে কৃষি কাজের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। সেকালে জমির উর্বরতা ও কৃষিজাত ফসলের স্বল্প মূল্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল। ইবনে বতুতা ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ পরিভ্রমণকালে মেঘনার উভয় তীরে সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত ও ফল-ফলাদির বাগান দেখতে পান। চীনা পরিব্রাজক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কৃষিতে পরিপূর্ণ মাঠ দেখে বলেছেন, 'স্বর্গ এদেশে স্বর্ণ ঢেলে দিয়েছে'। বাদশাহ আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল ধানগাছ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সেকালে বাংলাদেশে উৎপাদিত চাল দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রতিবেশী দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও মালদ্বীপে রপ্তানি করা হত। চাল ছাড়াও এসময় নারিকেল, মরিচ, আদা, হলুদ, পিঁয়াজ ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যও উৎপাদিত হত এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ, আফ্রিকা, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে রপ্তানি হত। ইক্ষুজাত চিনিও রপ্তানি হত। এ সময় পাটের উৎপাদনও হত, তবে তা বাণিজ্যিকভাবে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হত না। আবুল ফজলের বর্ণনামতে, সেকালে বাংলাদেশের জমিতে বছরে তিনবার ফসল ফলানো হত। পর্যাপ্ত জমিতে চাষাবাদ হতো এবং তৎকালে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও কৌশল কৃষিতে প্রয়োগ করা হতো। এক হিসেব মতে তখন বাংলাদেশে প্রায় ৮ কোটি মণ চাল উৎপন্ন হতো যা তখনকার ৩ কোটি লোকের জন্য ছিল বিরাট বাড়তি ব্যাপার। মজার বিষয় হলো, তখন কৃষকরা যে হালের বলদ, লাঙ্গল, কাস্তে ব্যবহার করতো পাঁচশ" বছর পর তা আজো অপরিবর্তিত আছে।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে হিন্দুদের শাসনামলে জমিজমা ব্যক্তি মালিকানায় ছিল। কৃষকরা উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে সরকারকে দিত। সেন রাজত্বের আমলে নগদ অর্থে রাজস্ব পরিশোধ করা হত। মুসলিম শাসনামলেও জমির ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। এ আমলে প্রায় সব সময়ই অধিকাংশ আবাদী জমি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ছিল। শুধুমাত্র 'খাস' জমি নামে অভিহিত কিছু জমি সরাসরি সরকারের আয়ত্ত্বে ছিল। শেরশাহ ভূমি ব্যবস্থাপনায়

www.pathagar.com

যুগান্তকারী পরির্বতন আনেন। তিনি সর্বপ্রথম এক নতুন ভূমি পরিমাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং উৎপাদিত শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করেন। নগদ টাকায়ও তা পরিশোধ করা যেত। বাদশাহ্ আকবরের আমলে উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রীয় রাজস্ব হিসেবে আদায় হত এবং পুরোটাই নগদ অর্থে।

আকবরের আমলে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা ছিল বার ভূঁইয়াদের দখলে। আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল অখণ্ড বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষে ১ কোটি ৬ লাখ ৯৩ হাজার টাকা রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। মোগল যুগে প্রাদেশিক দেওয়ান মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সর্বাপেক্ষা অগ্রগতি লাভ করে। তিনি ভূমি রাজস্ব আদায় পদ্ধতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। তাঁর আমলে রাজস্বের পরিমাণ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, মোগল সাম্রাজ্যে বাংলার রাজস্ব সর্বাপেক্ষা লাভজনক সম্পদে পরিণত হয়। তিনি জায়গীরদারী প্রথার সংস্কার করে জমিদারদের মধ্যে সুষ্ঠুরূপে জমি বন্টন করেন। রাজস্ব আদায়ে যথেচ্ছাচার ও অনিয়ম বন্ধের জন্য তিনি ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফলে কৃষকদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারের বেশী রাজস্ব আদায় করা যেত না। এ সব ব্যবস্থার ফলে ভূমি রাজস্ব এতটা বৃদ্ধি পায় যে, প্রতি বছর দিল্লীর রাজকোষে এ প্রদেশ থেকে এক কোটি টাকার রৌপ্য মুদ্রা জমা হত। কিন্তু সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ মানুষের সঞ্চয় অবশিষ্ট থাকত না।

মুর্শিদকুলি খানের আমলে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় চাউলের দাম ছিল মণ প্রতি মাত্র ০.২৫ টাকা। ষষ্ঠদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তাতে দ্রব্যমূল্যে তেমন প্রভাব পড়েনি। কারণ উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে যে লাভ হত, তার এক বড় অংশ চলে যেত দিল্লীতে এবং অপর এক অংশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মুনাফা হিসেবে বিদেশীরা হস্তগত করতো। মোগল আমল পর্যন্ত জমির উপর ধার্যকৃত খাজনাই ছিল সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কিছু শুল্ক ধার্য করা হতো। অবশ্য তা থেকে রাজস্ব খাতে বড় কোন অংক যোগ হতো না।

যদিও প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজও বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিভিত্তিক, তথাপি সেকালেও এদেশে কিছু উন্নতমানের শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হতো। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে এমন কিছু ঐতিহ্যবাহী শিল্প পণ্য উৎপন্ন হতো যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও কাম্য ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার যে প্রাচীনকালের সে সব গৌরবময় শিল্পজাত পণ্যের মান ছিল উঁচুমানের। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের অধিবাসীরা শিল্প ও কারিগরি নৈপুণ্যে সেরা ছিল। সেকালের বাংলার বস্ত্র শিল্প, ধাতব শিল্প, পাথর ও কাঠ খোদাইয়ের কাজ এবং মৃৎশিল্প তখন বহির্বিশ্বেও খুব সমাদৃত ছিল। বস্তুত তখন

www.pathagar.com

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় শাসকদের মাধ্যমে ততটা ঘটেনি; বরং সাধারণ কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যই বাংলার দূত হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের মসলিন প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববিখ্যাত। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত "পেরিপ্লাস অব দি এরিত্রিয়ান সী" গ্রন্থে রপ্তানী পণ্যের তালিকায় বাংলাদেশের মসলিন বস্ত্রের উল্লেখ আছে। নবম শতাব্দীতে আরব বণিক সুলায়মান লিখেছিলেন যে, বাংলাদেশ এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী করে যা অন্য দেশ তৈরী করতে পারে না। ঐ বস্ত্র এতই সূক্ষ্ম ছিল যে একটি পোশাক একটি অঙ্গুরীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো যায়। মোগল যুগের শাসকরা বাংলায় কাপড় প্রস্তুতের জন্য তাঁতীদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কারখানায় কাজ করার সুবিধা দিতেন। মসলিন ছাড়াও এসময় রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র তৈরী হত। এছাড়া পুরুষদের জন্য তৈরী সোনার কাজ করা টুপি আরব ও পারস্যে রপ্তানি হত। মোগল বাদশাহরা প্রতিটি মসলিন শাড়ীর জন্য তৎকালে ২০০ টাকা দিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনামলে এর দাম নেমে আসে মাত্র ২০ টাকায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পরিব্রাজক মার্কপোলো বাংলাদেশের রপ্তানি তালিকায় চিনির কথা উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ পরিব্রাজক বারবোসা লেখেন যে, বাংলাদেশের চিনি ভারত উপমহাদেশ, সিংহল, মালদ্বীপ ও আরব অঞ্চলে রফতানী হত।

ইবনে বতুতা ও সিবাস্টিয়ান ম্যানরিক উভয়ই লিখেছেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ফুল ও অন্যান্য উপাদান থেকে সুবাসিত তেল প্রস্তুত হত এবং তা প্রাচ্যের প্রায় সর্বত্রই রপ্তানি হত। সে সময় বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত লবণও ছিল অত্যন্ত লাভজনক পণ্য। সিজার ফ্রেডারিক লিখেছেন যে, তৎকালে সন্দ্বীপ হতে প্রতি বছর ২০০ জাহাজ বোঝাই লবণ বিদেশে রপ্তানি হত। হুগলী ও সন্দ্বীপে পর্তুগীজদের লবণ কারখানা ছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদিত হত। বাংলার নবাবগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য লবণের ব্যবসা নিলামে ইজারা দিতেন। অলংকার শিল্পও তৎকালে উন্নত ছিল। এছাড়া কাগজও তৈরী হত।

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে নৌ-শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। সিজার ফ্রেডারিকের মতে, আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্মিত জাহাজের তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দরে নির্মিত জাহাজের অধিক কদর ছিল। তুরস্কের সুলতান মানে উন্নত বলে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ তৈরী করাতেন। ভেনিশীয় পর্যটক মিশিরা বলেছেন যে, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাঠ প্রচুর পাওয়া যেতো। নবাব শায়েস্তা খান ও নবাব মীরজুমলা ঢাকায় রণতরী নির্মাণ করিয়ে তা যুদ্ধে ব্যবহার করাতেন। মীরজুমলা পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ঢাকায় নির্মিত রণতরীতে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের সাথে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, জাভা ও চীনসহ বিশ্বের বহুদেশের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল।

www.pathagar.com

এসময় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত নৌপথেই সংঘটিত হত। মুসলিম যুগে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। চীনা পর্যটক মোইসিন ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী পাণ্ডুয়ায় আসার পূর্বে প্রথমে সুমাত্রা দ্বীপ হয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছান এবং সেখান থেকে সোনারগাঁও হয়ে পাণ্ডুয়ায় যান। এ ঘটনা থেকে মনে হয় যে, এ পথ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হতো। তখন বাংলাদেশ থেকে মসলিন, সোনা, রূপা, রেশম, চীনা বাসন, পিতল, লোহা, চন্দন, চিনি, আদা, সিঁদুর, পারদ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হত। ব্যবসায়ে লেন-দেনের মাধ্যম ছিল টাকা ও কড়ি। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ পর্যটক ডুয়ার্তে বারবোসা বাংলাদেশ পরিভ্রমণকালে 'বেঙ্গল' নামক শহরে প্রচুর দেশী-বিদেশী বিশেষত আরব, পারস্য, আবিসিনিয়া ও ভারতের ব্যবসায়ীদের দেখতে পান। ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, বাকলা, সপ্তগ্রাম, শ্রীপুর প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতো। ঢাকা শহর থেকেও প্রতি বছর শত শত জাহাজ ভর্তি চাল, চিনি, মোম, লাক্ষা, মাখন, বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হত। ইটালীর পরিব্রাজক নিকোলা মানুচি ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ সফরকালে এখান থেকে রেশমবস্ত্র ও সূতীবস্ত্র ইউরোপ, তুরস্ক ও পারস্যে রপ্তানি হতে দেখেছেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমশাহের আমলে (১৩৮৯-১৪০৯) বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। চীনা পর্যটক মাহুয়েন তাঁর বর্ণনায় এ সমুদ্র পথে বাংলায় বিপুল বহির্বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেন। শায়েস্তা খানের শাসনামলেও (১৬৬৪-১৬৮৯) ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটে। তিনি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করেন। ফলে ইংরেজরা বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে তারা কেবল ঢাকা থেকেই এক লক্ষ পাউন্ডের বস্ত্র ক্রয় করতো। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তারা রপ্তানি পণ্যের মূল্য বাবত ২ লক্ষ পাউন্ডের রৌপ্য আমদানি করে। ওলন্দাজগণ প্রায় সমমূল্যের পণ্য বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করতো। ইউরোপ থেকে রৌপ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। ঐ সব রৌপ্য ঢাকাও রাজমহলের টাকশালে মুদ্রায় পরিবর্তন করা হয়, ফলে তা দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খান বাংলার শাসক হিসেবে ঢাকায় অবস্থানকালে (১৬১৭-১৬২৩) দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে। এ সময় দেশে যুদ্ধবিগ্রহ না থাকায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ঢাকার মসলিন ও সিল্ক মোগল রাজপরিবারের রাজকীয় পোশাকের প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রাচীনকাল থেকে কোন না কোন প্রকারে সরকারী হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল। মুসলিম শাসনামলে সরকারী হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এর প্রধান কারণ ছিল দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে বর্ধিত রাজস্ব প্রদানের জন্য

www.pathagar.com

বাংলার শাসকদের তহবিল বৃদ্ধি পেতো জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন কর আদায়ের মাধ্যমে। জমির খাজনা ধার্য ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করা হয়। বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীদের বাড়াবাড়ি ও দুর্নীতির কারণে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারী কর্মচারীরা দেশের অভ্যন্তরে পণ্য কেনাবেচা করতো এবং অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ব্যবসা কেড়ে নিয়ে একচেটিয়া মুনাফা করতো। তারা যত্রতত্র একই পণ্যের উপর একাধিকবার শুল্ক আদায় করতে থাকে; ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় বণিকরা সরকারী কর্মচারীদের হাতে হয়রানির শিকার হতে থাকে। এরূপ দুর্নীতি সার্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ইসলাম খান সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পর সরকারীভাবে কারখানা, গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ করেন এবং কারিগর ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। ইসলাম খানের মত পরবর্তীতে শায়েস্তা খানও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হন। ধারণা করা হয় যে, দিল্লীর বাদশাহর চাহিদা পূরণের জন্য বাংলার শাসকদের নানা উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হত। তবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহম্মদ আজম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় এসে শায়েস্তা খানের লবণ গুদামের বিপুল পরিমাণ লবণ পানিতে ফেলেছেন। কারণ তিনি এরূপ ব্যবসাকে রাজকীয় সম্মানের পক্ষে হানিকর বিবেচনা করেন। মুর্শিদকুলি খান অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকাকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য চালের একচেটিয়া ব্যবসা এবং রপ্তানি নিষিদ্ধ করেন। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখক বলেছেন যে, মুর্শিদকুলি খান খাদ্যশস্যের দাম সস্তা রাখতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ধনীদের খাদ্যশস্য মওজুদ করতে দিতেন না। প্রতি সপ্তাহেই খাদ্যশস্যের বাজার দরের বিবরণী তৈরি হত এবং গরীব লোকেরা সত্যিই কি দাম দিয়ে এসব জিনিসপত্র কিনছে তা তুলনা করে দেখা হত। যদি দেখা যেত যে, এসব গরীব লোকের কাছ থেকে চলতি বাজার দরের চাইতে এক দামও (পয়সা) বেশি নেয়া হয়েছে তাহলে তিনি সেই ব্যবসায়ী, মহলদার ও ওজনদারকে নানাভাবে শাস্তি দিতেন। তাদের গাধার পিঠে চাপিয়ে সারা শহর ঘোরানো হতো। তিনি সরকারী কর্মচারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার বন্ধ করে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের যথাযথ মর্যাদা দেন, ফলে বহু আরব ও পারস্য দেশীয় বণিক বাংলাদেশে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সাথে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

নৌপথে বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশের সাথে প্রথম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে পর্তুগীজরা ষোড়শ শতকের শেষভাগে। বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্য শুরু করে ওলন্দাজরা। এরপরে আসে ফরাসী, ইংরেজ, বেলজিয়ান ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা। মোগল শাসকরা

www.pathagar.com

ইউরোপীয়দের এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য স্বাগত জানান। ফলে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাংলাদেশ তখন আমদানির চাইতে রপ্তানি করতো বেশি, ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল অনেক বেশি। বাণিজ্য ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য ইউরোপ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-রূপা বাংলাদেশে আমদানী হত। পশ্চিমা বিশ্বে যে পরিমাণ সোনা ও রূপা আহরিত হত, তার একটা বড় অংশ চলে আসতো বাংলাদেশে। প্রতিবছর শত শত বিদেশী জাহাজ বাংলাদেশে আসতো বাণিজ্যের জন্য। বহির্বাণিজ্যের কারণে মোগল সরকার বিপুল রাজস্ব আয় করতো। আমদানীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে মুদ্রা তৈরী করা হত। দিল্লীর বাদশাহকে বাংলার শাসকরা রাজস্ব দিতেন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায়। ফলে আমদানীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের বড় অংশ চলে যেত দিল্লীতে। মুদ্রা অর্থনীতির সুযোগে ইউরোপীয়রা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপক মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৭১৭ সালে সরকার ইংরেজ সরকারকে বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি দেন যা বাংলার অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। উল্লেখ্য যে, বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের অর্থনীতি ও বিপুল সোনা-রূপা আমদানীর মালিক হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতিতে বড় ধরনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। দ্বাদশ শতকে বৃটিশ পণ্যের প্রসারের ফলে বৃটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটলেও বস্ত্র শিল্পে বাংলাদেশের পণ্যের বিশ্ব বাজার সত্ত্বেও এখানে কোন শিল্প বিপ্লব ঘটেনি।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের সম্পদের ও বাণিজ্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব উন্নত ছিল বলে মনে হয় না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কৃষকদের জমির ফসলের মোট একটি অংশ খাজনা বাবদ ব্যয় হয়ে যেতো। বাদবাকি চাষীর পরিবারের নিত্য ব্যয়ের জন্য কাজে লাগতো। সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কৃষকরা কেবল জমির ফসলের উপরই নির্ভর করতো। তাদের জীবনধারণের মানও ছিল সহজ সরল। বিদেশী রপ্তানি পণ্য আমদানিতে সাধারণ মানুষের খুব একটা উপকার হতো না।

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রজাদেরকে ফসলের অর্ধেকই খাজনা হিসেবে দিতে হতো। ইবনে বতুতা এসময়ের বাংলাদেশকে 'অত্যন্ত সম্পদশালী' বলে বর্ণনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের প্রাচুর্যের কথাও অনেকে বলেছেন। তবে এসময় রাজ পরিবার ও সামরিক কর্মচারী ছাড়া সমাজের অন্যান্যদের অবস্থা সাধারণ মানের ছিল। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দী থেকে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ইংরেজ আমলে এরা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফরাসী পণ্ডিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়া বাংলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাংগালী মেয়েদের কোমল প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের অর্থনীতি সেকালের মানদণ্ডে অগ্রসরমান ছিল। ঐ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় ৫০ বছর যাবত মুসলিম শাসকদের আমলে দেশে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল; ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। মুর্শিদকুলি খান প্রতিষ্ঠিত নবাবী শাসনামল এবং পরবর্তীতে শুজাউদ্দিন খান ও আলীবর্দী খানের মত সুদক্ষ শাসকের আমলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। ফলে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৭৩৭ সনের দিকে ঢাকার শাসন ব্যবস্থা অযোগ্য শাসকদের হাতে গেলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে থাকে। ১৭৪২ সনে মুর্শিদাবাদে মারাঠা আক্রমণ শুরুর আশংকায় অনেকে ঢাকায় চলে আসে। তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর আমবাগানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার অর্থনীতির চাবিকাঠি চলে যায় ইংরেজদের হাতে।

সপ্তদশ শতকে সম্রাট হুমায়ুন সুবে বাংলাকে 'জান্নাত-আবাদ'(স্বর্গরাজ্য) এবং পরবর্তীতে আওরঙ্গজেব 'জাতির স্বর্গ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সকল মোগল নথিপত্রে বাংলাদেশকে বলা হয়েছে 'ভারতের স্বর্গ'। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখক বাংলাদেশকে 'জান্নাতুল বিলাদ'(জাতির স্বর্গ) বলে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ আমলে সেই বাংলার চেহারাটাই পাল্টে যায়। পিটার জে, মার্শাল বলেন যে, নবাবী আমলে বাংলার যে চিত্র ছিল, কোম্পানী আমলে তা অতিশয় ম্লান দেখতে পাই।

ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশ

১৭৫৭ সালে বাংলায় বৃটিশ কোম্পানী শাসনের সূত্রপাত হলে পর্তুগীজ, ফরাসী ও ওলান্দাজ বণিকদের আনাগোনা প্রায় থেমে যায়। মাত্র অর্ধ শতকের ব্যবধানে বৃটিশ শাসনের ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রপ্তানিকারক বাংলাদেশ আমদানিকারকে পরিণত হতে থাকে। কোম্পানী আমল শেষ না হতেই বাংলাদেশ বৃটিশ শিল্প পণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রপ্তানি পণ্য হিসেবে থাকে কেবল কিছু কৃষি কাঁচামাল।

১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত বাণিজ্যের প্রধান অংশে তারাই বিচরণ করতো। বস্তুত বাংলাদেশে বৃটিশরা শাসন ও বাণিজ্যের জন্যই শেকড় শক্ত করে অবস্থান করছিল। বরং শাসনের চাইতেও বাণিজ্যিক মুনাফাটি তাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অবশ্য লাভজনক ব্যবসার স্বার্থেই শাসন ব্যবস্থায় তাদের সুদৃঢ় কর্তৃত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। সে কারণেই কোম্পানী শাসকরা প্রতিরক্ষা ও

www.pathagar.com

রাজস্ব আদায়ের প্রতিও সমভাবে মনোযোগী হয়। কোম্পানী কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের বড় অংশ ব্যয় করা হতো সেনাবাহিনী পোষণের এবং রপ্তানি উদ্বৃত্ত বজায় রাখার জন্য। কোম্পানী শাসকরা রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। ১৭৮৯ সালে তারা বাধ্যতামূলকভাবে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে তাকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণা দেয়। ১৭৫০ সালের তুলনায় ১৭৮৯ সালে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। বাণিজ্যিক ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য জমির খাজনা বার বার বৃদ্ধি করা হয়। এতে করে কৃষকরা ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। ১৭৬৮ থেকে ১৭৮৯ সময়কালে বাংলাদেশে আকাল ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। তবুও সরকার জমি ইজারা বন্দোবস্ত দেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও কোম্পানী আমদানির এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করে। লবণ থেকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ রাজস্ব আদায় করা হতো। ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত প্রায় সকল পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা হয়। ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষিজ উৎপাদন প্রধানত দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাই পূরণ করতো বিদেশে তেমন রপ্তানি হতো না। এ সময় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। কারণ এ সময় ইউরোপ শিল্পায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের পেছনে ছিল। ইংরেজ কোম্পানী বাংলাদেশের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে। দেশীয় শিল্প-কারখানা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে থাকে; বিশেষত গ্রামীণ কুটির শিল্প ভেঙ্গে পড়ে এবং কৃষিজ কাঁচামালের রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃটিশরা বাংলাদেশ থেকে সস্তায় কৃষি পণ্য ইউরোপে নিয়ে গিয়ে তা সেখানকার শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগাতে থাকে। নীল চাষ ছিল এমনি এক স্বার্থ বিরোধী উৎপাদন ব্যবস্থা। একইভাবে পাট উৎপাদন করিয়েও তারা ইউরোপীয় কারখানায় পাঠাতো কাঁচামাল হিসেবে।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে বৃটিশরা তাদের শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করে, কিন্তু ফলশ্রুতিতে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় ঘটে। উপমহাদেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বৃটিশরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ দেশে সস্তায় কৃষি পণ্য উৎপাদন করে তা ইংল্যান্ডের শিল্পায়নে কাজে লাগানো। বিংশ শতকের শুরুতে তারা পানি সেচ প্রর্বতন এবং সরকারী কৃষি বিভাগ ও বাজারজাতকরণ বিভাগ চালু করে কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখে যা পরবর্তীতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বৃটিশরা উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পূর্ব বাংলায় কৃষির উন্নতির জন্য তেমন কিছু করেনি। ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বঙ্গ অঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য সেচ ব্যবস্থা লাভজনক নয়। পূর্ব বাংলায় রপ্তানিযোগ্য পাট ও চা ছাড়া অন্য কোন পণ্যের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল না। ফলে বাংলাদেশের কৃষির সম্ভাবনাকে বিকশিত করার তেমন কোন উদ্যোগ তারা নেয়নি।

www.pathagar.com

১৭৬৫ সালে বাংলাদেশের জনগণের জীবিকা ছিল প্রধানত কৃষি নির্ভর। এ সময় একজন ক্ষুদ্র কৃষকও উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে খাজনা দিতে পারতো। তবে মহাজন ও ব্যবসায়ী ঋণের উপর তাদের নির্ভরশীলতা ছিল। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার জীবন যাত্রা সম্পর্কে ইউরোপীয় একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন যে, গণদারিদ্রই হচ্ছে এখানকার বৈশিষ্ট্য। এর একশ' বছর পরেও কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্বই দশক থেকে বৃটিশরা নীলচাষ নামে অভিনব এক কৃষি কাজে বাংলার চাষীদের নিয়োজিত হতে বাধ্য করে। বাংলাদেশে উৎপাদিত নীল ছিল ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের অন্যতম একটি কাঁচামাল। স্বদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার দায় পরিশোধের জন্য ভারত থেকে বৃটেনে অর্থ পাচারের উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনে নীলের চাহিদাকে কৃত্রিমভাবে, হয়তো কিছুটা বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে দেয়।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় পাটের উৎপাদন শুরু হলে এখানকার পাট চাষীদের জীবনধারণের মান কিছুটা উন্নত হয়। ঢাকার তৎকালীন জমিদার লারমিনী উল্লেখ করেন যে, পূর্ব বাংলায় পাট চাষের কারণে এখানকার কৃষকদের পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী কৃষক শ্রেণী বলে মনে হয়। তখন পাটের মূল্য সমপরিমাণ চালের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কখনো কখনো এক মণ পাটের মূল্য তিন মণ চাউলের অপেক্ষাও বেশি ছিল। তখন অবশ্য পাটের উৎপাদন ব্যয়ও চালের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা ২৫% বেশি ছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সিরাজগঞ্জের মাছিমপুরে এ অঞ্চলের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে সেটি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। পরে পাট শিল্পের প্রসার ঘটে কলকাতায়। বিগত সাতশ' বছরের চালের মূল্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সম্ভবত সপ্তদশ শতকে বিশেষতঃ শায়েস্তা খানের আমলে বাংলায় চালের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল। ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য লাভের পর থেকে চালের মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পে বিপর্যয়ের ঘনঘটা দেখা দেয়। মোগল আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল বস্ত্র কারখানা পরিচালিত হত অষ্টাদশ শতকে তা ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। ইংরেজরা বলপূর্বক তাঁতীদের কাছ থেকে কম দামে কাপড় ক্রয় করতো। ১৭৭০ সালে দুর্ভিক্ষে বহু তাঁতী মারা যায়। ফলে তাঁতীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অনাগ্রহ দেখা দেয়। ১৭৭৫ সালে সোনারগাঁয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা কাপড়ের মূল্য কম দিতে চাইলে তাঁতীরা প্রতিবাদ করে। তখন কোম্পানীর সিপাহীরা তাঁতীদের উপর অত্যাচার চালায়। মোগল আমলে যেখানে একখানি উত্তম ঢাকাই মসলিনের মূল্য ছিল ২০০ টাকা ১৭৯৩ সালে কোম্পানী আমলে তা কমে ২০ টাকায় আসে।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সাথে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস পায়। কারণ ইংরেজরা বহির্বাণিজ্যে অধিকতর আগ্রহী ছিল। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হোঁচট খেতে থাকে। এদিকে কোম্পানী নবাবের নিকট থেকে নির্ধারিত টাকা আদায় করতো এবং সেই টাকা দিয়ে কাপড় ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে ইংল্যান্ডে নিয়ে বিক্রি করতো। এভাবে তারা উভয় দিক থেকে লাভবান হবার মাধ্যমে এদেশ থেকে বিপুল সম্পদ পাচার করতে থাকে। মোগল আমলে যেখানে তারা ইউরোপ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে আসতো, বাংলার কর্তৃত্ব গ্রহণের পর তারা তাও বন্ধ করে দেয়। বরং বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে যে সব জাহাজ দক্ষিণ ভারতে যেয়ে খালি ফিরত কর্নওয়ালিশ পরে ঐ সকল জাহাজে লবণ ক্রয় করতে নির্দেশ দেন। এতে করে বাংলার লবণ শিল্পও হুমকির সম্মুখীন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নানা উপায়ে ইংল্যান্ডে যে কত সম্পদ পাচার করেছে তার হিসেব করা কঠিন। অধ্যাপক জে. সি. সিনহার হিসেবে ১৭৫৭-১৭৮০ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ৩৮০ লাখ পাউন্ড স্টার্লিং বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যায়। অপর এক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৬৫-১৭৭১ সময়কালে সরকারী হিসাবেই বাংলাদেশের সরকারী আয়ের তিন ভাগের একভাগ উদ্বৃত্ত হিসেবে বিলেতে পাচার হয়েছে। কোম্পানীর বিলেতী কর্মচারীদের বেতন এবং ব্যবসায়ের লাভের হিসেব এর বাইরে।

মোগল আমলে সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল জমির খাজনা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা দখল করে জমির খাজনাসহ অন্যান্য কর বৃদ্ধি করে। ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য কর ছিল পরোক্ষ। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৬০ সালে আয়কর ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করা হয়। বৃটিশ শাসনামলে সরকারী ব্যয়ের প্রধান খাত ছিল–সামরিক ব্যয়, শাসন কার্যের ব্যয় এবং 'হোম চার্জ'। হোম চার্জের নামে বৃটিশরা এদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করে। এক হিসেব মতে ১৯১৪-১৯১৫ সালে হোম চার্জ হিসেবে ২কোটি পাউন্ড (তখনকার ১৫ কোটি টাকা) ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়।

অপরদিকে ১৮০০ সালে চালের দর ছিল টাকায় ১ মণ ৫ সের। ১৯১৪ সালে টাকায় ৩৭ সের। সাত বছর পর ১৮২১ সালে চালের দর হ'ল টাকায় ৩০ সের। ১৮৭৫ সালে হ'ল টাকায় মাত্র ১৭ সের। ১৯২৫ সালে বৃটিশদের শোষণের ফলশ্রুতিতে মূল্য দাঁড়ায় টাকায় মাত্র ৪ সের। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত এদেশে বিলেত থেকে তেমন কাপড় আমদানী হত না। ১৮১৪ সালে কলকাতায় ইংল্যান্ড থেকে ৮ লাখ গজ কাপড় আমদানী করা হয়। ১৮২১ সালে তা বৃদ্ধি পেল ২ কোটি গজে। ১৮৩৫ সালে আমদানী হয় ৩৫ কোটি গজ। ১৮৭৫ সালে ৬১ কোটি গজ। ১৯২৫ সালে বিলেত থেকে আমদানীকৃত কাপড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬ কোটি গজে। ১৯১৩ সালে ভারত থেকে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ চাল এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মণ গম ইংল্যান্ডে পাচার করা হয়। সেই সংগে দেড় কোটি মণ তুলাও নিয়ে যাওয়া হয়। আর পাট পাচার হয় আড়াই কোটি মণ।

www.pathagar.com

এসময় চা নিয়ে যাওয়া হয় ৩৬ লক্ষ মণ। ১৯১৮-১৯ সালে চাল পাচার করা হয় ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ মণ।

মীরজাফর যখন ক্ষমতায় বসলো তখন বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এ কোম্পানী দীর্ঘকাল বেসরকারী বাণিজ্যে বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারের আনুষ্ঠানিক ভূমিকা তখন কম ছিল। উপমহাদেশে বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে প্রথম রেলপথ চালু হয়। বাংলাদেশের বেসরকারী ইংরেজ মূলধনে ইস্টার্ন রেলওয়ে স্থাপিত হয়। অবশ্য সরকার পরে তা ক্রয় করে নেন। রেল লাইন প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনীতিতে সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রকার শুল্ক আরোপের মাধ্যমে সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের পূর্বে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৯২৩ সালে ট্যারিফ বোর্ড, ১৯২৮ সাল রাজকীয় কৃষি কমিশন ও ১৯০৮ সালে 'বাংলাদেশ ধান ও চাল অনুসন্ধান কমিটি' উল্লেখযোগ্য।

মোগল সম্রাট ফররুখশিয়র ১৭১৭ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলায় ব্যবসা করার অনুমতি দেন। পরবর্তীতে মোগল সাম্রাজের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অস্থিতিশীলতার সুযোগে তারা ১৭৫৭ সালে বাংলার ভাগ্য বিধাতা হয়ে ওঠে এবং ১৭৬৫ সালের মধ্যে তারা সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত কোম্পানী ও সরকারী কর্তৃত্বের সমন্বয়ে তারা বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে যায়। তাদের সময়কালে কোম্পানীর কর্মচারীদের লোলুপতা চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন করে। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য ও শিল্প-শ্রমিক ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপ, বাধা-নিষেধ সব মিলিয়ে বাংলার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়; যেমন-লবণ ব্যবসায় রাষ্ট্র ও সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৩ সালে ভারতের বাজার বৃটেনের সকল কোম্পানীর জন্য খুলে দেয়া হলে সে দেশের কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্য ভারতের বাজারে অবাধে প্রবেশের সুযোগ পায়। ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতীয় পণ্য খোদ ভারত ভূমিতেই বৃটিশ পণ্যের কাছে মার খেতে থাকে। বিশেষ করে বাংলার বস্ত্র ও লবণ শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়ে। অবাধ বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে বাংলার বস্ত্র, রেশম, চিনি ও জাহাজ শিল্প স্থবিরতার পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। আমদানি ব্যবসা ভারতের শিল্পের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানে এবং তার ফলশ্রুতিতে ব্যবসার মুনাফা চলে যায় ইংরেজদের পকেটে।

বাংলায় বৃটিশদের শাসনকালে তাদের সহায়তাকারী দেশী দালাল-মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। এরা বৃটিশ বেনিয়াদের সহায়তায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত মুনাফা লুটে। এরা ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু বণিক-মুৎসুদ্দি শ্রেণী। কোম্পানীর দালাল

www.pathagar.com

হিসেবে এরা বেনিয়াদের রপ্তানি মূল্যের উপর ১.৫% থেকে ২.৫% পর্যন্ত কমিশন নিত। এমন কি ছোট ছোট শহর, বন্দর, গঞ্জে ও বেনিয়াদের দালাল ছিল। বেনিয়াদের রপ্তানি বাণিজ্য বাংলার সার্বিক অর্থনীতিতে কোন ইতিবাচক ফল দিতে না পারলেও শহরভিত্তিক একটি বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। কোম্পানী বিনাশুল্কে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিলে মীর কাশিমের সাথে লড়াই হয়। অত্যধিক মুনাফা ও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার মোহ বেনিয়াদের এমনভাবে পেয়ে বসে যে, তারা দেশীয় লোকদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। ইংরেজদের নিপীড়ন সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে

> 'বাংগালীদের চোখে কোম্পানীর কর্মচারীরা ছিল মনুষ্যরূপী পঙ্গপাল। এপঙ্গপালদের আক্রমণে বাংলার হাট, বাজার, গঞ্জ ও সকল শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এক দশকের মধ্যেই। হাট-বাজারে গিয়ে এরা উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের বলপ্রয়োগে বাধ্য করতো তাদের কাছে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে। ... এদের দুঃশাসন ও অত্যাচারের ফলে সকল আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হয়ে দেশ একটি জংলী সমাজে পরিণত হলো। কার্থেজ বিধ্বংসের পর বাংলাদেশই বোধ হয় এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতি ধ্বংসের দ্বিতীয় নজীর'।

'এটি একটি মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা যে, তৎকালীন সরকার সম্পদের উৎস সম্প্রসারণের জন্য শিল্পোন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট না হয়ে সুপরিকল্পিত এবং বিধিবদ্ধভাবে এদেশের প্রাচীন কলা ও শিল্পসমূহের ধ্বংস সাধন করার নীতি অনুসরণ করেছে। এর পরিণিতিতে দেশ আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং নগরায়ন বন্ধ হয়ে যায় ও বাংলার বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র কৃষিজাত সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষি, জলবায়ু, আবহাওয়া ও প্রকৃতিদত্ত উর্বরতার সংযোগের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ও অভাবের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্থায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্রের ফলে মানুষের কর্মপ্রেরণা ও উদ্যমও হারিয়ে যায়।' (বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত)

বৃটিশের দুশ' বছরের শাসন ও শোষনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমানরা। উইলিয়াম হান্টার বলেন যে, একশ' সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হান্টার আরো বলেন যে, গত পঁচাত্তর বছরে বাংলায় মুসলমান পরিবার হয় উৎখাত হয়েছে, না হয় আমাদের শাসনামলের নয়া সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বস্তুত বৃটিশরা এদেশে তাদের শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে ইংরেজদের স্বাগত জানাতে পারেনি। মুসলমানরা ইংরেজী ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণে শাসক গোষ্ঠী সহজেই অফিস-আদালতের চাকরী-বাকরী থেকে বাদ পড়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেংগে দেয়। সূর্যাস্ত আইনের অধীনে যে সব বনেদি জমিদার তাদের জমিদারী হারায় তাঁদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এ ছাড়াও 'লাখেরাজ সম্পত্তির' মালিক হাজার হাজার মুসলমান পরিবার ১৮২৮ সালের 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে' নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মুসলমানরা এদিকে সরকারী পদ থেকে অপসারিত হয়, অপরদিকে ভূমির উপর অধিকার হারায়। এমনি পরিস্থিতিতে ইংরেজরা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হিন্দুদের মধ্য থেকে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করে। চাকরী ক্ষেত্রেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য দেয়া হয়। এটা ছিল বৃটিশদের divide and rule policy-এর অনিবার্য ফলশ্রুতি। উইলিয়াম হান্টার বলেন যে এ পর্যন্ত যে সব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোট খাট স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করল এবং তাদের ঘরে সেসব ধন-দৌলত জমা হতে লাগলো যেগুলো পূর্বে মুসলমানদের আলমারীতে তাদের ঘরেই জমায়েত হত।

জমিদার ছাড়াও বৃটিশ বণিকরা বাংলায় যে কিছু বণিক দালাল ও মহাজন সৃষ্টি করে তাদেরও প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। বস্তুতপক্ষে ইংরেজ শাসনামলে এদেশে জমিদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি যে বিত্তশালী অকৃষক সামাজিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল তারা মূলত হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠী তো বটেই এমন কি আগেরকার মুসলিম অভিজাত পরিবারগুলোও ক্রমাগত নব্য হিন্দু জমিদারদের অধীনস্থ রায়তে পরিণত হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে (১৭৯৩) প্রজাদের উপর জমিদারদের ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছিল। কিন্তু সকল জমিদার ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। সরকার বাধ্য হয়ে ১৭৯৯ সালে জারীকৃত রেগুলেশনে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে জমিদাররা সরকারী অনুমতি ছাড়াই প্রজাকে বন্দী করা ও বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, প্রয়োজনে প্রজাকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদকরণ এবং প্রজাকে দৈহিক নির্যাতনের অধিকার লাভ করে। জমিদারদের এধরনের কাজ আবার আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেত না। এ সময় জমির উপর কৃষকের কোন মালিকানার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। প্রায় এক'শ বছর পরে ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হবার পর জমির উপর প্রজাদের শর্তভিত্তিক মালিকানা-স্বত্ব স্বীকৃতি পায়। ইতোমধ্যে বাংলার কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বংগ বিভাগ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশ

১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ফলে জমির উপর প্রজা চাষীদের জমির উপর শর্তভিত্তিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেও এক শ্রেণীর গ্রাম্য মহাজনের উদ্ভব ঘটে যারা ঋণ দিত এবং সুদে-আসল আদায়ে কৃষকদের নিঃস্ব করে দিত। জমির ফসল ঘরে উঠার আগেই তার সিংহভাগ মহাজনের ঘরে চলে যেতো। হিন্দু উঠতি বুর্জোয়া ও পুঁজিপতিরা এ শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশ বণিকরা ভারতবর্ষ তথা বাংলায় ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করে। ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানার কাঁচামাল সস্তায় এদেশ থেকে আমদানীর জন্য তারা পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। এ উদ্দেশ্যে তারা নির্ধারিত কয়েকটি কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের বাধ্য করতো। বাধ্যবাধকতামূলক চাষাবাদে কৃষকদের কোন উন্নতি হয়নি। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জেলাগুলোতে ব্যাপক নীল চাষে কৃষকদের বাধ্য করানোর ফলে ধান চাষের জমি কমে যায়। ধান উৎপাদন কমে যাওয়ায় চালের দাম বৃদ্ধি পায়। রেল লাইন বসানোর ফলে সেচ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। উনিশ শতকের শেষদিকে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র কৃষি-উৎপাদন ৪২% ভাগ হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছিল ভিন্ন চিত্র। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলোতে ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য জমি ছিল উর্বর এবং পানি সেচের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ছিল সহজতর। জনসংখ্যার তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণও ছিল পর্যাপ্ত। পক্ষান্তরে, এসব এলাকা নীল চাষের জন্য ততটা উপযোগী ছিল না। ফলে এদিকে ইংরেজদের আগ্রহ ছিল কম। উর্বর জমি ও সহজ চাষাবাদ ব্যবস্থার কারণে এসব অঞ্চলে নতুন জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে, ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। জমির উপর চাপও ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

এ সময় এলাকায় ধান ও পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিম বাংলা থেকে বহু কৃষক নীল চাষের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব বাংলায় আসে। ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়। কোলকাতা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার বিশেষ ভূমিকা ছিল। আবার কলকাতা ও ডান্ডির পাটকলের কাঁচামালও যেতো পূর্ব বাংলা থেকে। এক হিসেবে ১৮৪৪-১৯৪৫ সালে সমগ্র বাংলায় উৎপাদিত ধানের প্রায় ৩৫% ভাগ ময়মনসিংহ, বরিশাল, ত্রিপুরা, দিনাজপুর ও রংপুর জেলাতেই উৎপন্ন হত। পাট উপাদনে পূর্ব বাংলার ছিল একক প্রাধান্য। তখন বাংলার ৯২% ভাগ পাটই উৎপাদিত হতো পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলার ধান ও পাটের উৎপাদনের সাথে জড়িত কৃষকরা ছিল প্রধানত মুসলমান। ধান ও পাটের বাণিজ্যিক মুনাফার প্রতি লক্ষ্য করে বিড়ম্বিত মুসলমান প্রজাকুল এ দুটো ফসল

www.pathagar.com

উৎপাদনের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠে। ১৮৭২ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে পাটের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এসময় রংপুরে ১৭৭%, ফরিদপুরে ৫২৫%, ময়মনসিংহে ৫১৪% এবং রাজশাহীতে ৫১৪% বৃদ্ধি পায়। পাটের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলার সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। মুসলমান চাষী প্রজারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আশান্বিত হয়ে ওঠে। এ সময় এখানকার কৃষি ব্যবস্থায় যুগান্তকারী অগ্রগতির ধারা সূচিত হয়। '... পৃথিবীর সর্বাধিক পাট উৎপাদন কেন্দ্র পূর্ব বাংলায় কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির একটি ভিত্তি রচিত হয়।' পাটের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্ব বাংলার সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকলে তারা তাদের সন্তানদের অধিক হারে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে শুরু করে। তারা পাট উৎপাদনের পাশাপাশি পাট ব্যবসাতেও ঝুঁকে পড়ে এবং পাটকলগুলোতে শ্রমিকের চাকরী নিতে থাকে। এভাবে মুসলমান কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে এবং তারা একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ব বাংলার প্রায় সকল জেলাতে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগুরু। তারা প্রায় সকলেই ছিল কৃষি কাজের সাথে জড়িত। কিন্তু মজার বিষয় হল যে, মুসলমানরা ছিল প্রজা, অথচ জমিদার ছিল প্রায় সকলেই হিন্দু। উদাহরণস্বরূপ ১৮৮১ সালে বগুড়া জেলায় মুসলমানরা ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু জমিদাররা ছিল প্রায় সকলেই হিন্দু। মাত্র ৫ জন ছিলেন মুসলমান। ১৯৯১ সালে রাজশাহী জেলায় ৭৮% ভাগ মুসলমান বাস করতো। পক্ষান্তরে মাত্র ২ জন ব্যতীত সকল জমিদারই ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ। এমন কি জমিদারের কর্মচারী নায়েবদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। জমিদাররা জমির উপর নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও 'আবওয়াব' (কল্যাণ) নামক অবৈধ কর আদায় করতো। এমন কি জমিদারের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষেও প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হতো এবং তা আদায়ে জোর জুলুম করা হত। ও'মলি বলেন,

> "Many of the Naibs were unscrupulous and took for themselves a good share of the fines imposed. The majority of the Naibs were moreover Hindus, who have little sympathy with Muhammadan tenants."

জমিদারদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৮৭৩ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইউসুফশাহী পরগনায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে তা বগুড়া জেলায়ও

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় বৃটিশ শাসকদের টনক নড়ে এবং তারা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে সক্রিয় হয়। ১৮৮৫ সালে 'বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইন' জারী করা হয়। এ আইন যদিও পূর্ববর্তী আইনগুলোর তুলনায় উন্নততর, কিন্তু জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরাজিত সমস্যার কোন চূড়ান্ত সমাধান দিতে পারেনি। হিন্দু জমিদারগণ ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে সমবেত হয় এবং তীব্র সমালোচনা করে। তারা 'দি বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে সংস্থা গঠন করে। দৃশ্যত জমিদাররা জমির উপর প্রজাদের অধিকার প্রদানের আইনকে মেনে নিতে পারছিল না। বাংলায় গভর্নর জেনারেলের পরিষদে জমিদারদের অনেক প্রতিনিধি ছিল, কিন্তু রায়ত বা প্রজাদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এ সময় প্রজাদের পক্ষে পরিষদে একমাত্র মুসলিম সদস্য স্যার আমীর আলী জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি পরিষদে বলেন,

> "As far as I am concerned, it was a labour of love, for I cannot help taking a keen interest in the measure. The bulk of the peasantry in Eastern Bengal, numbering seven million of souls, belong by my faith, and naturally have claim upon the Muhammadan member for the time being in your Excellency's Council. In Eastern Bengal, the agrarian troubles are aggravated by religious differences and the fact that many of the Zaminders are new comers. The new landlords, generally speaking, have little or no sympathy with their peasantry, most of whom are Mussalmans. If the law gives them power, say, of enhancement, it is worked without compunction and without mercy. I say this advisedly."

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় বৃটিশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় দেড়শ' বছর পরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে বড় বড় পরিবর্তন সাধিত হয় তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরী-বাকরীতে হিন্দুদের চেয়ে বেশ পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছিল। এ সময় সরকার ও প্রশাসনের উঁচুস্তরের পদগুলো ছিল ইংরেজদের দখলে। এর পরের মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলোতে প্রধানত হিন্দুরা এবং সর্বনিম্ন স্তরের পদগুলোর কিছু মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন উইলিয়াম হান্টার ঃ

www.pathagar.com

সারণী-১ঃ উচ্চতর পদে ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা (১৮৭১)

	বিভাগের নাম	ইংরেজ	হিন্দু	মুসলমান
১	সিভিল সার্ভিস	২৬০	০	০
২	বিচার বিভাগ	৪৭	০	০
৩	পুলিশ অফিসার (গেজেটেড)	১০৬	৭	৫
৪	ইঞ্জিনিয়ার	১৫৪	১৯	০
৫	চিকিৎসা বিভাগ	৮৯	৬৫	৪
৬	জনশিক্ষা	৩৮	১৪	১
৭	কাস্টম, অন্যান্য	৪১২	১০	০

সারণী-২ঃ দায়িত্বশীল পদে হিন্দু-মুসলমানের অবস্থান

	বিভাগের নাম/পদের নাম	হিন্দু	মুসলমান
১	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর	১১৩	৩০
২	আয়কর বিভাগ	৪৩	৬
৩	রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	২৫	২
৪	নিম্ন আদালতের জজ	২৫	৮
৫	মুন্সেফ	১৭৮	৩৭
৬	হিসাব বিভাগ (জনকল্যাণ)	৫৪	৬
৭	অন্যান্য (জনকল্যাণ)	১২৫	৪

সারণী-৩ঃ পেশাজীবী/বুদ্ধিজীবীদের বিবরণ (১৮৮১)

	পেশার নাম	হিন্দু	মুসলমান
১	হাইকোর্ট জর্জ	২	০
২	ব্যারিস্টার	১০	১৭
৩	উকিল	২৭২	১৭
৪	এর্টর্নি	১৮	০
৫	মোক্তার	৪২০	৮৯
৬	শিক্ষক (অধ্যাপক)	১৫৬৭	৫১১

www.pathagar.com

এসময় ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সে উত্তেজনা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তাকে প্রশমিত বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এ.ও.হিউম নামক এক ইংরেজ আমলাকে দল গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সংগে হিউম পরামর্শ করে "ভারতীয় কংগ্রেস" নামে একটি দল গঠনের ব্যবস্থা নেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৮৫ সালে এ দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ প্রধানত হিন্দুরাই কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়। তবে এসময় কিছু মুসলমানও এ দলে যোগ দেয়। কিন্তু অচিরেই বালগঙ্গাধর তিলকের ন্যায় কতিপয় কংগ্রেস নেতার উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড মুসলমানদেরকে কংগ্রেস থেকে দূরে ঠেলে দেয়। মুসলমানরা উপলব্ধি করতে থাকে যে, কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মুসলমানরা তাদের পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উঠে আসতে সক্ষম হবে না। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্ব আসলে হিন্দুদের স্বার্থকেই ভারতীয় স্বার্থ বলে চালিয়ে দিতে তৎপর ছিল। মুসলমানরা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইংরেজদের সাথে দর কষাকষির জন্য ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' নামে পৃথক দল গঠন করে।

মুসলমানরা শুরু থেকেই ইংরেজী ভাষা-সংস্কৃতির প্রবর্তনকে সুনজরে দেখতে পারেনি। ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি মুসলমানদের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরববোধ ছিল। ইংরেজদের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে তারা সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখেছে। মুসলমানদের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে বলে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানরা এরূপ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আইন প্রবর্তনের ফলে মুসলমানরা যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দিক থেকে ক্রমশঃ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। হাজী শরীয়তউল্লাহ, নিসার আলী তিতুমীর বৃটিশ ও হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে নেতৃত্ব দেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ 'ফরায়েজী আন্দোলন' গড়ে তোলেন। তিনি ১৮৩৮ থেকে ১৮৬০ সনের মধ্যে বৃটিশ শাসক ও হিন্দু জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এর আগে ১৮৩১ সালে সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইংরেজ সৈন্যদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' তথা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহে বাংলার বহু সৈনিক অংশ গ্রহণ করে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেয়।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমনের ফলশ্রুতিতে ভারতের মুসলমানরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ উক্ত বিদ্রোহের সূচনা মুসলমানদের মধ্যে থেকে ঘটেছিল বলে ঔপনিবেশিক শাসকরা বিশ্বাস করতো। তারা ভেবেছিল যে, মুসলমানরা দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বশেষ মরণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলমানদের ভূমিকা তেমন জোরালো ছিল না, তথাপি একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিধায় বাংলার মুসলমানদেরকে বৃটিশ রাজশক্তি সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ইতোপূর্বে 'ফরাজী আন্দোলন' এবং 'ওহাবী আন্দোলন'-কে দমন করার ফলে বাংলার মুসলমানরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাবধানী হয়ে পড়ে। ডব্লিউ, হান্টার ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ সময় বৃটিশ কর্মকর্তাদের মনে মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস বিরাজ করছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেছেন "deepest depths of degradation and decay" হিসেবে। লর্ড এলেনবরো বলেন যে, ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের একটি জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বস্তুতপক্ষে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের এরূপ অবিশ্বাসের কারণে ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকেই তারা হিন্দু-প্রীতি দেখিয়ে আসতে থাকে। একই কারণে তারা নানাভাবে মুসলমানদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে চাকরীতেও পড়ে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বৈষম্যমূলক নীতি ও শোষক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা বিচ্ছিন্নভাবে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব আরো প্রবল হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের দীর্ঘকালীন বৈষম্যমূলক নীতির ফলশ্রুতিতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলার মুসলমানরা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। নওয়াব আবদুল লতিফ এসময় মুসলমানদের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন। তিনি স্যার সৈয়দ আহমদের মত বৃটিশ সরকারের সাথে বৈরিতার পরিবর্তে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর সাথে যুক্ত হন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নতুন প্রেক্ষাপটে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরী ও জীবিকার উপায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করা।

তাঁরা কৌশল হিসেবে সরকারের প্রতি আবেদন-নিবেদন এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন মত চাপ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সৈয়দ আমীর আলী ও নবাব আবদুল লতিফ উভয়ই মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁরা

www.pathagar.com

মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে চাননি। তাঁরা পাশ্চাত্যের উদার ও বস্তুবাদী রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের ছিলেন ঘোর বিরোধী। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতা দিয়ে ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর দু'টি গ্রন্থ যথাক্রমে The Spirit of Islam (১৯৮৯) ও A History of Islam (১৮৯১) লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় এবং তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ভারতের শিক্ষিত মহলে বই দু'টি অসামান্য জনপ্রিয়তা পায়। তিনি ইসলামকে উনিশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবিদ্যা ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে পুনর্মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের উচিত তাদের বিচারশক্তি বা ইজতিহাদকে প্রয়োগ করে সমকালীন অবস্থার আলোকে এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামকে পুনর্মূল্যায়ন করা। ১৮৭৭ সালে তিনি National Mohammadan Association গঠন করেন। এ সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়সঙ্গত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেন। আমীর আলী ছিলেন একটু আধুনিকতাবাদী। তিনি প্রাচ্য ভাষায় পরিচালিত স্কুল ও মাদ্রাসা তুলে দিয়ে তার অর্থ দিয়ে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বৃটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। নওয়াব আব্দুল লতিফ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি আমীর আলীর চিন্তাধারাকে কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে করতেন। ইংরেজ সরকার নওয়াব আব্দুল লতিফের মতামতকেই বেশী গুরুত্ব দেয় এবং মাদ্রাসাগুলো বহাল রাখে। উনবিংশ শতকের শেষদিকে কালকাতার নগরকেন্দ্রিক মুসলিম সমাজ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাধারার পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বাংলার মুসলমান সমাজে তাঁরা আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলে এদলে যোগ দেয়ার প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন বাংলার এ দুই প্রভাবশালী নেতা নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী উভয়েই স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মত বলেন যে, কংগ্রেস দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। কংগ্রেস প্রথমত সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়ে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ জাতীয়তাবাদীদের সংগঠিত করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া জোরদার করতে থাকে। উল্লেখ্য, তখন ভারতে বিশেষত বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে মূলত হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত লোকদেরকেই

www.pathagar.com

বোঝাত। কংগ্রেস গঠনের প্রথম দিকে কিছু মুসলমান প্রতিনিধি বাংলা ও অন্যান্য এলাকা থেকে অংশগ্রহণ করলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে অচিরেই তাদের মোহভংগ ঘটে।

উনবিংশ শতকের শেষে একদিকে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর মুজাহিদ আন্দোলন, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী আন্দোলন দ্বারা উজ্জীবিত হচ্ছিলেন। অপরদিকে বালগংগাধর তিলকের মত উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা ১৮৯৫ সালে হিন্দু দেবতা গণেশ ও মারাঠাদের জাতীয় বীর শিবাজীর স্মরণে গণউৎসবের আয়োজন করে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে শাণিত করছিলেন। এসময় হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের ফলে মুসলমান জনসাধারণের প্রতি এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু বাবু বা ভদ্রলোকের আচরণ হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুটা উন্নাসিক। এ শ্রেণী নব্য মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়কে ভাল চোখে দেখতে পারেনি। তাঁদের আশংকা ছিল যে, নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে সরকারী চাকরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এতদিন তারা যে একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল তার অবসান ঘটবে। এ মনোভাবের দরুনই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা দেখা দিতে শুরু করে। উইলিয়াম হান্টার তাঁর গ্রন্থে ভারতের মুসলমানদের দুর্দশা ও বৈষম্যের তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার ফলে মুসলমানদের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সেই সংগে উগ্র হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক তৎপরতা মুসলমানদেরকে আরো সচেতন করে তোলে। তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, হিন্দু নেতৃত্বাধীন কোন সংগঠন বা আন্দোলনে শরীক হয়ে তাদের কোন লাভ নেই। মুসলমানদের প্রতি হিন্দু নেতৃত্বের উন্নাসিকতার মাত্রা যত বাড়তে থাকে, ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ততই মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়তে থাকে। বৃটিশদের উদ্যোগেই তাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কংগ্রেস গঠন করা হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস দ্রুত ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের সংগঠনে পরিণত হয়। সংগঠনটি ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে যা বৃটিশদের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না।

বৃটিশরা এ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে ক্রমান্বয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বশীল মুখপাত্রে পরিণত করার জন্য সুযোগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়। তারা সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত বিরোধগুলোতে একের বিরুদ্ধে অপরকে প্ররোচিত করে। ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানরা তখন কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ সুযোগে বৃটিশরা মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ধারণা দিতে সমর্থ হয় যে, ইংরেজ

www.pathagar.com

সরকারের আনুকূল্যের উপরই মুসলমাদের উন্নতি ও ভাগ্য নির্ভরশীল। একই সঙ্গে তারা হিন্দু-মুসলিম দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান বৈরিতাকে স্থায়ীরূপ দিতে নানা ষড়যন্ত্র আঁটিতে থাকে। কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ইংরেজদের এসব ষড়যন্ত্রকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে বরং বিভিন্ন ইস্যুতে মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ফলে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে বিপর্যস্ত মুসলমানরা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে নিজেরা পৃথকভাবে চলার নীতি গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষাপটেই স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ও বৃটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য দল হিসেবে কংগ্রেসের গড়ে উঠতে ব্যর্থতার কারণেই বহু মুসলিম নেতা একে একে কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পৃথক উপায় খুঁজতে থাকেন। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য ইংরেজ সরকার বঙ্গ বিভাগের কর্মসূচীকে সফলভাবে কাজে লাগায়। কিন্তু বঙ্গ বিভাগকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা গ্রহণ করে 'মহা আশীর্বাদ' হিসেবে। "কেননা প্রায় দেড়শত বছরব্যাপী কোলকাতা শহরের পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহার হতে গিয়ে পূর্ব-বাংলাকে গতিহীন একটি জনবসতি হিসেবে পড়ে থাকতে হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি দূরতম নগর-কোলকাতাকেন্দ্রিক হওয়াতে পূর্ববাংলার নব্য বিকশিত শ্রেণীসমূহের পক্ষে তাতে অংশগ্রহণ করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তার ওপর দূর-দূরান্ত থেকে গিয়ে অগ্রসরমান হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে টিকে থাকাটা ছিল প্রায় অসম্ভব। এই সব অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক সমস্যা ছাড়াও সামাজিক সমস্যা কম ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। আর এই ব্যাপারটিই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে দুই ধরনের চিন্তা গড়ে তোলে। প্রথমত, পূর্ববাংলায় যাদের বাসস্থান তাদের পক্ষে উপরোক্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক কারণকে অতিক্রম করে সংখ্যালঘু হিসেবে চাকরী, ব্যবসা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে টিকে থাকা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। ফলে তাদের মাঝে বিকল্প একটি কেন্দ্র গঠনের প্রতি আগ্রহ ছিল পুরো মাত্রায়। দ্বিতীয়ত, কোলকাতায় কিংবা তার আশেপাশের জেলাগুলোতে যাদের বাস ছিল তারা কোলকাতা ভিন্ন দূরবর্তী কোন বিকল্প কেন্দ্র গঠন স্বাভাবিকভাবেই সমর্থন করতে পারে নি। কেননা পূর্ব বাংলার কোথাও যদি বিকল্প কোন কেন্দ্র সৃষ্টি হয় তাহলে কোলকাতায় এসকল মুসলমানদের একটি স্থায়ী সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কেননা মুসলমানদের ভিতরে উদ্বৃত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হবার ফলে শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি কারণে কোলকাতা

www.pathagar.com

কেন্দ্রিক কেন্দ্রীভবনের একটি সম্ভাবনা থাকে যা মুসলমানদেরকে সম্প্রদায়গতভাবে শক্তিশালী করবে, কিন্তু বিকল্প কেন্দ্র তৈরি হলে তার বিপরীত ধারাটিই বলবৎ হবে। তবে যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম-প্রধান জেলা অবস্থিত ছিল কোলকাতা থেকে অনেক দূরে তাই তারা বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাতে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। আর তাই পূর্ব বাংলার সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী এমন কি ঢাকার আশেপাশের হিন্দু জনসাধারণ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিল।" (আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ ঃ ভাষা আন্দোলন ঃ অর্থনৈতিক পটভূমি)।

একদিকে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের আপাতঃ দৃশ্যমান উদার মনোভাব, অপরদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদদের উত্থান-পর্বে মুসলমানদের জন্য এক ক্রান্তিকাল সৃষ্টি হয়। এ সংকট উত্তরণে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আবির্ভূত হন ঢাকার নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. কামরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা ইনসাইড লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

২. শামসুল কবীর খান ও দৌলতুন্নাহার খানম, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

৩. আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, ভাষা আন্দোলন ঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

৪. এ.জেড.এম. ইফতেখার-উল-আউয়াল, দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গল, ১৮৯০-১৯৩৯, নতুন দিল্লী ঃ বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৯৮২।

৫. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্টেট এন্ড ইকোনোমিক স্ট্র্যাটেজি, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮।

৬. রায়, এইচ. গ্রিভ ও মোজাম্মেল হক (সম্পাদিত), বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিস ফর ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।

৭. সুফিয়া আহমেদ, মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল ১৮৮৪-১৯১২, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬।

৮. আকবর আলী খান, ডিসকভারী অব বাংলাদেশ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

৯. স্ট্যানলি এ. কোচানেক, প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট পলিটিকস এন্ড বিজনেস ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩।

১০. আবদুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩।

১১. আহমেদ ওয়াকিল, মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮।

১২. রমেশ দত্ত, দি ইকোনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম-১, ভারত সরকার, ১৯৭০।

১৩ আহমেদ রফিউদ্দিন, দি বেঙ্গল মুসলিমস,১৮৭১-১৯০৬, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১।

১৪. মোহাম্মদ মোহর আলী, হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, রিয়াদ, ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৫।

১৫. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস (১৯৪৫), কোলকাতাঃ কমরেড পাবলিশার্স, ১৯৮৫ (পুনঃমুদ্রন)।

১৬ আবদুল করিম, সোস্যাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, চট্টগ্রামঃ বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫।

১৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২।

১৮. আর সি মজুমদার, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল. ভল্যুম-১, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা।

১৯. মোহাম্মদ আবদুর রহিম, দি মুসলিম সোসাইটি এন্ড পলিটিকস ইন বেঙ্গল, ঢাকাঃ ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৯।

২০. ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

২১. চিচেরভ, এ.আই, ইন্ডিয়া ঃ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন দি সিক্সটিনথ-এইটিনথ সেনচুরিজ, মস্কো, ১৯৭১

www.pathagar.com

নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ

"When I saw that my nation, the followers of holy Prophet is facing destruction, then I thought that it is preferable that I shall sacrifice myself and be perished to save them from destruction".

-Nawab Salimullah

জন্ম	ঃ	জুন ১৮৭১ ইং ঢাকার খাজা পরিবারে।
পিতা	ঃ	নওয়াব খাজা আহ্‌সানুল্লাহ।
মাতা	ঃ	ফাতিমা খানম।
শিক্ষা	ঃ	স্বগৃহে বৃটিশ ও জার্মান শিক্ষক এবং উর্দু-ফার্সীর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ।
বিবাহ	ঃ	আগষ্ট ১৮৯৩ ইং, প্রথম স্ত্রী-আসমাতুন নেসা খানম, পরবর্তীতে অপর তিনজন স্ত্রী ঃ রওশন আক্তার বেগম, নাযনীন খানম ও আমীযুননেসা খানম।
কর্মজীবন	ঃ	জুনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথমে ময়মনসিংহে এবং পরে বিহারের মুজাফফরপুরে চাকরী।
		❑ ১৮৯৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে ইস্তফা।
		❑ ১৯০১ সালে নওয়াব হিসেবে পিতার স্থলাভিষিক্ত।
		❑ ১৯০২ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কে সি আই উপাধি লাভ।
		❑ ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবারে সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুট পরিধান উৎসবে 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত।
		❑ ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
		❑ ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান এবং মুসলিম লীগ গঠন।
		❑ ১৯১১ সালে বঙ্গবিভাগ রদের প্রতিবাদে বৃটিশ সরকারের কাছে ৮ দফা দাবী পেশ।
		❑ ১৯১২ সালে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে দাবী পেশ এবং প্রতিশ্রুতি লাভ।
খেতাব	ঃ	কে সি আই (১৯০২), নওয়াব বাহাদুর (১৯০৩), জি.সি.আই.ই (১৯১১)।
বিশেষ অবদান	ঃ	বঙ্গ বিভাগের পক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টি, মুসলিম লীগ, ইম্পেরিয়াল লীগ ও মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সলীমুল্লাহ মুসলিম ইয়াতীমখানা, মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা, ঢাকার প্রতি মহল্লায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন।
মৃত্যু	ঃ	১৬ জানুয়ারী ১৯১৫ ইং কলকাতাস্থ ৫৩ ,চৌরঙ্গী রোডে নিজ বাড়ীতে।
মাজার	ঃ	ঢাকার বেগম বাজারস্থ পারিবারিক গোরস্থান।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা নগরের আধুনিকায়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধন, চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং বাগ-বাগিচা, নহর বা ফোয়ারা সৃষ্টি করে সৌন্দর্যবোধের পরিপোষণে ঢাকার নওয়াব পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পরিবারের লোকেরা ঢাকা নগরীর প্রশাসনে বিশেষ অবদান রাখেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে এই বিখ্যাত পরিবার থেকে নওয়াব সলীমুল্লাহর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মময় জীবনে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

নওয়াব সলীমুল্লাহ একদিকে অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অপরদিকে বাংলার মুসলমানদের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করলেও পারিবারিক পর্যায়ে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষা লাভ করেন। বৃটিশ সরকার তাঁর যোগ্যতা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়কে বিবেচনা করে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করে। নওয়াব পরিবারে সলীমুল্লাহই প্রথম ব্যক্তি যিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি জনসাধারণের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার তাঁকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কাছে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি নওয়াব পরিবারের অন্যান্যদের থেকে অগ্রসর ছিলেন। সরকারী চাকরীর প্রতি তার মোহ ছিল না। অচিরেই তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন।

সলীমুল্লাহ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ছিল। বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুসলমানদের কল্যাণে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জীবন ও তাদের আর্থিক সংকট মোচনে তিনি রাজনৈতিক প্রয়াস চালানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও উদার হস্তে দান করতেন। এ উদ্দেশ্যে এমন কি তিনি তাঁর স্ত্রীর মূল্যবান অলংকার মাঁড়োয়ারীদের কাছে বন্ধক রেখে কর্জ করেছিলেন। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকেও তিনি ঋণ করেছিলেন। মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি ঢাকায় 'পঞ্চায়েত'-এর মাধ্যমে "ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহম" জাঁকজমক সহকারে উদযাপনের ব্যবস্থা করতেন এবং এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। ঢাকায় গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতি মহল্লায় নৈশ বিদ্যালয় চালু করেন। তিনি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং নিজ ব্যয়ে সভার আয়োজন করে মুসলমানদের সংগঠিত ও সচেতন করে তোলার অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের চাকরীতে প্রবেশের জন্য তিনি জোর সুপারিশ করতেন এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মকর্তাদের

www.pathagar.com

অফিসে যেয়ে অনুরোধ করতেন। তিনি গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেন। তাঁর কাছে হাত পেতে কোন প্রার্থী কোনদিন প্রত্যাখ্যাত হয় নি। তিনি দামোদর নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের (যাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু) জন্য বিপুল অর্থ দান করেন। তিনি তুর্কী যুদ্ধে পঙ্গু ও আহতদের জন্য রেডক্রিসেন্ট তহবিলে তৎকালে তিন হাজার টাকা ব্যক্তিগতভাবে দান করেন এবং ঢাকা শহর থেকে পঁচিশ হাজার টাকা অনুদান সংগ্রহ করে তুরস্কে প্রেরণ করেন। আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে তিনি তাঁর পিতামহীর নামে "ইসমাতুন্নেসা ওয়ার্ড" প্রতিষ্ঠায় অর্থ প্রদান করেন। একই হাসপাতালে তিনি "কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল" নামে একটি মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করেন। বাংলার সর্বপ্রাচীন ইয়াতীমখানা "ইসলামী ইয়াতীমখানা" ১৯০৯ সালে তাঁরই অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে ঢাকার আজিমপুরস্থ "সলীমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা" নামে পরিচিত।

বঙ্গ বিভাগ ও নওয়াব সলীমুল্লাহ

নওয়াব সলীমুল্লাহ বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠন ও মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন তা একদিকে এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, অপরদিকে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখা একটি স্থায়ী অবয়ব দান করে।

অখণ্ড বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনাটি ছিল মূলতঃ বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যাপার। এর মূল পরিকল্পনায় হিন্দু বা মুসলিম নেতৃবৃন্দের কোন ভূমিকা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলা ছিল তখন বৃটিশ ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ যার আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৮ কোটি। একজন মাত্র গভর্নরের অধীনে এত বড় একটি প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা তথা সর্বত্র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রদেশের আকার ছিল অত্যন্ত বৃহদাকার। তদুপরি নদীবহুল বাংলায় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অসুবিধাজনক ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় ছোটলাট প্রদেশের পূর্বাঞ্চল দেখাশুনা করতে পারতেন না। পাঁচ বছর কার্যকালের মধ্যে একবারও তার পক্ষে পূর্বাঞ্চল পরিদর্শন সম্ভব হতো না। এ জন্য এ অঞ্চলের জেলাগুলোর উন্নতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়তো না। ফলে এর অধিবাসীদের উন্নতির সুব্যবস্থা হতে পারতো না।' ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের কারণ তদন্তে নিয়োজিত কমিটি অভিমত প্রকাশ

www.pathagar.com

করে যে, বিরাট বাংলা প্রদেশের শাসনের ব্যাপারে অসুবিধা বিদ্যমান। বাংলায় নিযুক্ত বিভিন্ন ইংরেজ গভর্নর/ছোটলাটরাও একই অভিমত দেন। মধ্য প্রদেশের চীফ এনড্রো ফ্রেজার শাসন কার্যের সুবিধার্থে বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা পেশ করেন এবং লর্ড কার্জন প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নেন। প্রশাসনিক কারণের পাশাপাশি রাজনৈতিক কারন ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠনের পিছনে ছিল বলে ধারণা করা হয়। 'বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকও রাজনৈতিক তৎপরতা, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ঢং-এ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন ও পাশ্চাত্যের ভাবে ও ভাষায় নিজেদের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা বৃটিশ কর্মকর্তাদের শংকিত করে তোলে'। (এমাজউদ্দিন আহমেদ, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ)

বৃটিশ শাসকরা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বঙ্গ প্রদেশ বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা এর মধ্যে তাদের কল্যাণের ইংগিত খুঁজে পায়। ভারত সরকার প্রথমে ১৯০৩ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে এটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করলে হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ সকলেই তার বিরোধিতা করেন। নবাব সলীমুল্লাহও তা সমর্থন করেননি। নতুন প্রদেশ গঠনের বিষয়টি যখন সরকারী পর্যায়ে সক্রিয় বিচার-বিবেচনাধীন তারই এক পর্যায়ে নওয়াব সলীমুল্লাহ ১৯০৪ সালে ১১ জানুয়ারী ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন এবং সরকারী প্রস্তাবটি সম্পর্কে মতামত আহবান করেন। সকলেই ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ সভায় বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি ছিল ঃ সমগ্র আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার ব্যতীত) এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের যশোর ও খুলনা জেলাদ্বয় নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে ব্যবস্থাপক সভা বিশিষ্ট একটি গভর্নর-শাসিত প্রদেশ গঠন করা যেতে পারে"। হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

লর্ড কার্জন পরিকল্পিত বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে জনমত যাচাই ও তাঁর সরকারের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করার জন্য ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গ সফর করেন। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে জনসভায় বক্তৃতা করেন। তাঁর ঢাকায় আগমন উপলক্ষে নওয়াব সলীমুল্লাহ ব্যাপক ও জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করেন। তিনি বহু টাকা ব্যয়ে ঢাকার রাজপথ সুসজ্জিত করেন। লর্ড কার্জন নওয়াব সলীমুল্লাহর আতিথেয়তা গ্রহণ করে আহসান মঞ্জিলেই অবস্থান করেন। ২০ ফেব্রুয়ারী আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে তিনি এক সমাবেশে ভাষণ দেন। সমাবেশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে যৌথভাবে একটি, প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির পক্ষ থেকে একটি, জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে একটি এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

একটি অর্থাৎ মোট চারটি অভিনন্দন পত্র লর্ড কার্জনকে প্রদান করা হয়। প্রাদেশিক মুসলিম সমিতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রে বলা হয় যে, 'সরকার মুসলমান অধ্যুষিত জেলাসমূহকে আসাম প্রদেশভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন। বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার সাথে আমরা ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে একসূত্রে আবদ্ধ আছি। এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে অসুবিধা হবে। কিন্তু নবগঠিত প্রদেশকে স্বতন্ত্র একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে ঢাকা নগরীকে এর রাজধানী করা হলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না, অধিকন্তু সুবিধাই হবে।' এ মানপত্রটিতে নওয়াব সলীমুল্লাহর চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। অন্য দু'টো মানপত্রে ঢাকা জেলাকে আসামের সাথে যুক্ত করার আবেদন জানানো হয়। লর্ড কার্জন নওয়াব সলীমুল্লাহর সাথে আলোচনায় তাঁর যুক্তিসংগত দাবীকে উপলব্ধি করেন বলে প্রতীয়মান হয়। মানপত্রের জবাবে লর্ড কার্জন বলেন যে, "বঙ্গের প্রশাসনিক ভার অবশ্যই কমাতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ, যত্ন ও প্রশাসনের সুব্যবস্থার জন্যই প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কোন সরকারই আট কোটি লোকের শাসন করতে পারে না। যারা বাংগালী জাতির একত্রাবস্থানের পক্ষে দৃঢ়ভাবে ওকালতি করছেন এবং বঙ্গবিভাগকে নিতান্ত নিষ্ঠুর পদক্ষেপ ও ক্ষতিকর কার্যক্রম বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে এতে তাঁদের উদ্দেশ্যেরই অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে। যারা এভাবে অজ্ঞ কৃষক ও শহরবাসীদের আন্দোলনে উত্তেজিত করছেন, তাদেরকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি। অনেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোক এরূপ মত পোষণ করছেন বলে দাবী করা হয়, তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে ... অতএব যদি এমন কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যাতে ঢাকাতে নতুন প্রদেশের রাজধানী করার ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে এ অঞ্চলবাসী সুশিক্ষিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে, যেখানে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ সুগম হবে, সেই প্রস্তাবে অনুন্নত আসামভুক্ত হওয়ার ভয় দেখিয়ে সেখানকার নেতৃবর্গ যদি এই অঞ্চলবাসীদের ঐ সকল সুবিধা বিসর্জন দিতে উপদেশ দেন, তবে তা সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে কি?" লর্ড কার্জন আরো বলেন, "বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকে এমন এক ধরনের ঐক্য প্রদান করবে যা পুরাতন মুসলমান ভাইসরয় ও রাজাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তারা লাভ করেনি"।

লর্ড কার্জনের প্রস্তাবমত ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠিত হলে মুসলমানদের উন্নতি এবং ঢাকার হৃতগৌরব ফিরে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এসব ভেবে নওয়াব সলীমুল্লাহ সরকারী পরিকল্পনার প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। লর্ড কার্জনের বক্তৃতা থেকে বংগ বিভাগের সরকারী প্রত্যয়ের কথা আঁচ করতে পেরে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলো নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে শুরু

www.pathagar.com

করে। এ দিকে বড়লাট তাঁর পরিকল্পনার প্রতি মুসলমান নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করে বঙ্গ বিভাগের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবটি বৃটেনে বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯০৫ সালের জুন মাসে ভারত সচিব কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারী ঘোষণা দেয়া হয়। লর্ড কার্জন নতুন প্রদেশের নাম দেন 'উত্তর-পূর্ব প্রদেশ' এবং সেভাবেই তা অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ৫ অক্টোবর ভারত সচিব 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামকরণের পরামর্শ দেন। ১৬ অক্টোবর (১৯০৫) নতুন প্রদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়। সরকারের অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয় "চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ, মালদাহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসাম প্রদেশ নিয়ে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত প্রদেশ গঠিত হবে। নতুন প্রদেশের সাথে বঙ্গের সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দার্জিলিং ও (জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারসহ) পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। নতুন প্রদেশের নাম হবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। আয়তন হবে ১,০৬৫৪০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা হবে তিন কোটি দশ লক্ষ।"

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের ঘোষণার সাথে সাথে হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশেষ করে কোলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকরা আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর কংগ্রেসপন্থী সেক্রেটারী কোলকাতাবাসী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তাঁর সাথে আরো নেতৃত্ব দেন ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বর্ধমানের স্যার রাস বিহারী ঘোষ, বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্ত, সিলেটের বিপিন চন্দ্র পাল ও কলকাতার অরবিন্দ ঘোষ। এরা সবাই ১৬ অক্টোবর নতুন প্রদেশ কার্যকর হবার আগেই তা নস্যাৎ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে কংগ্রেস তার অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। নতুন বিভাগ কার্যকর হবার দিন কংগ্রেস শোকদিবস পালন করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন—"বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে।"। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐদিন 'রাখী বন্ধন' উৎসবের প্রচলন করেন। বাহুতে লাল ফিতা বেঁধে, উপবাস করে, সর্ব প্রকার কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে আত্মশুদ্ধির জন্য হিন্দুরা সেদিন সকালে খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গা স্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী তথা মুসলিম বিদ্বেষী চেতনা জাগানোই ছিল 'রাখী বন্ধন' কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। আন্দোলনকারীরা কংগ্রেসের প্রস্তাবমত নব হিন্দুবাদের জনক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুসলিম বিদ্বেষমূলক সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সংগীতরূপে চালু করে। কমরেড মুজাফফর আহমেদ বলেন, আন্দোলনকারীরা বঙ্কিমচন্দ্রের চরম সাম্প্রদায়িক পুস্তক 'আনন্দমঠ' থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতো। মুসলমানদের পক্ষে

www.pathagar.com

আনন্দমঠ ও 'বন্দে মাতরম' গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কবি রবি ঠাকুর "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে রচনা করেন। 'রাখী বন্ধন'-এর দিন গঙ্গা স্নান অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেন। ঐদিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথ পার্শি বাগান মাঠে অখণ্ড বাংলার প্রতীক হিসেবে 'বঙ্গভবন' স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ভাবে 'ফেডারেশন হল' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে প্রদত্ত ভাষণে রবি ঠাকুর বলেন,

> "যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।"

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে এতদুদ্দেশ্যে স্বদেশী আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হন। রবি ঠাকুর নিজেই বলেন, "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল।" অবশ্য তিন মাসের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তীতে তিনি এ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, তথাকথিত স্বদেশী ভাবাপন্ন ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত, প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা যত বাড়তে থাকে রবীন্দ্রনাথ ততই উপলব্ধি করতে থাকেন যে, এ আন্দোলন ধনীদের স্বার্থে, শহুরে মধ্যবিত্তের স্বার্থে, গরীব গ্রামবাসীদের স্বার্থে নয় এবং অনিবার্য কারণেই গ্রামের সাধারণ মুসলমানরা আন্দোলনে শরীক হতে পারবে না। তিনি পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে বিশেষত 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। কংগ্রেসের অবাঙ্গালী মারাঠি নেতা বালগঙ্গাধর তিলক হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 'শিবাজী'কে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেন। হিন্দু নেতৃত্বের উস্কানিতে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং আন্দোলন ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে মোড় নেয়। পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হতে থাকে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তির কৃপায় বাংলার হিন্দুদের মধ্যে নব্য ধনী ও বণিক শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল। তারা লাভ করেছিল কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃত্ব। বৃটিশ আনুকূল্য ও আশীর্বাদে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়, ফলে তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভব হয়

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এবং কোলকাতাকেন্দ্রিক কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দু শোষক গোষ্ঠীর। বামপন্থী লেখক কমরুদ্দিন আহমদ বলেন যে, "বংগদেশের বর্ণ হিন্দুরা বংগবিভাগের বিরুদ্ধে আরম্ভ করে দিল এক ব্যাপক আন্দোলন। কারণ তাদের অস্তিত্বই হয়ে পড়েছিল বিপদগ্রস্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং মহামারী ভিক্টোরিয়ার শাসন কৃপায় হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বণিক সম্প্রদায়ের, তারা লাভ করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃত্ব, সরকারী চাকরী এবং জমিদারী। তাদের মধ্যে থেকেই উদ্ভূত হয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এবং শহর কোলকাতার কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এই বহুমুখী দানব বৃটিশ রাজ্যেরই সৃষ্টি। তাদের স্বার্থ রক্ষা না করে বৃটিশ সরকারের কোন উপায়ও ছিল না। বহু বর্ণহিন্দুদের জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে, কিন্তু তাদের বাসস্থান ছিল কলকাতায়। হিন্দু লেখক, গ্রন্থকার বা সাংবাদিক যারা আদিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। এদের অনেকেরই নির্ভর করতে হত সেখানকার পৈত্রিক সম্পত্তির উপর। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের নির্ভর করতে হত পূর্ববঙ্গের মক্কেলদের উপর। সরকারী অফিস-আদালতের কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের লোক। এ ছাড়াও উভয় বাংলাতেই বাংগালী হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। এমন কি পশ্চিম বাংলায়ও বাঙ্গালী হিন্দুদের সংখ্যা ও উড়িয়াদের তুলনায় ছিল অনেক কম। কাজেই তারা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়ে বৃটিশ পরিকল্পনা (বঙ্গভঙ্গ) বানচাল করার জন্য বদ্ধপরিকর হল।" বস্তুতপক্ষে হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী মুসলমানদের উপর তাদের এতদিনকার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব হারাবে এবং আগের মত শোষণ ও নিষ্পেষণ বন্ধ হয়ে যাবে-এ আশংকায় তারা শংকিত হয়ে পড়ে এবং বংগ বিভাগ প্রতিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতৃবৃন্দ যখন আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন, তখন নওয়াব সলীমুল্লাহ (১৯০৫ সনের জুলাই মাসে) মুসলিম ইনস্টিটিউট পত্রিকায় নতুন প্রদেশ গঠন ও তার ভবিষ্যত সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশ করে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি নতুন প্রদেশ কার্যকর হবার দিন (১৬ অক্টোবর ১৯০৫) ঢাকার নর্থব্রুক হলে এক সমাবেশ আহ্বান করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করল। নওয়াব সলীমুল্লাহ তাঁর ভাষণে বলেন,

> "The creation of the new province this day to which I alluded just now as a good men, will afford us great opportunities for advancement, moral and material."

www.pathagar.com

সভায় নেতৃবৃন্দ *Mohammadan Provincial Union* নামে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটিশ ভারতে বাংলাদেশে এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। নওয়াব সলীমুল্লাহ-এর পৃষ্ঠপোষক, শায়েস্তাবাদের নওয়াব মীর মুয়াজ্জম সভাপতি এবং নওয়াব মোহাম্মদ ইউছুফ খান বাহাদুর নতুন সংগঠনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় নতুন পূর্ববঙ্গ প্রদেশে সুদৃঢ় যৌক্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নওয়াব সলীমুল্লাহ আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। নতুন প্রদেশকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নওয়াব সলীমুল্লাহর সংগ্রামের পূর্ণ সমর্থনে তখন অন্যান্য বাংগালী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে তখনকার উদীয়মান নেতা এ.কে ফজলুল হক, ধনবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলি চৌধুরী এগিয়ে আসেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করে তাঁদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন যেমন-আবদুল রসুল হোসেন, লেয়াকত হোসেন, আবদুল হালিম গযনবী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল কাসেম, দীন মোহাম্মদ, দিদার বখশ, আবদুল গফুর ও আলীমুজ্জামান প্রমুখ ব্যতীত সকল মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবী নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ পারিবারিক কোন্দলবশত প্রথমে বঙ্গ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে কোলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর মত প্রত্যাহার করেন। যে সব মুসলমান বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করেন, তারা ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। মুসলমান ও খৃষ্টান পত্রিকাগুলো বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করে নিবন্ধ প্রকাশ করে। *Muslim Cronicle* প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরে তা প্রত্যাহার করে। কোলকাতায় *Mohammadan Literary Society* সমর্থন ব্যক্ত করে। কোলকাতার মুসলমানরা স্বজাত্যবোধের অনুভূতি নিয়ে বঙ্গ বিভাগ গঠনে সমর্থন ব্যক্ত করে। বিহার ও উড়িষ্যার মুসলিম নেতৃবৃন্দও নওয়াব সলীমুল্লাহর ন্যায় নতুন প্রদেশ গঠনকে স্বাগত জানায়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলাদেশের তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা বঙ্গ বিভগকে সমর্থন করে। তফসিলী নেতা আম্বেদকর বলেন, "সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং এমন কি যুক্তপ্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। এ সব প্রদেশের সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমি হ্রাসকরণ। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বাংগালী মুসলমানদের তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেয়া।" (কে এম মোহসীন; বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ)। পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বাংলা বিভাগের সমর্থনে কথা বলেনঃ

www.pathagar.com

> "আমি বঙ্গ বিভাগ নীতির বিরুদ্ধে নই, বরং সপক্ষে। আমার বিশ্বাস, এর ফলে পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানাভাবে অভাবগ্রস্থ পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হবে। ঢাকায় রাজধানী পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হতে চললো; পূর্ববঙ্গবাসীদের অর্থাগমের পথ মুক্ত হলো; এদেশের রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হবে; দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে; আসাম প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করবে—এটা ভেবে আমার আহ্লাদ হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের কথা ছেড়ে দেই। বাঙ্গালীদের উন্নতির দর্শন অনেকের চক্ষুশূল হতে পারে। কোলকাতা অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ নিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা যে কোন অফিসে তাদের (কোলকাতাবাসীদের) কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই একচেটিয়া হয়ে রয়েছে।" (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ)

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ সার্বিক বিচারে বঙ্গ বিভাগ এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কল্যাণের ইংগিতবহ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার কারণ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এ.বি.এম মাহমুদঃ

> "হিন্দুদের বংগভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মূলকারণগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করিলে এই বিরোধিতার তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হইবে। বাংলা বিভাগ সত্যই তাদের জন্য এক দুর্যোগের ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। নিছক ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা করিয়াই হিন্দু নেতৃবর্গ ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শীঘ্রই নতুন ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে এই অঞ্চলের এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং তৎসঙ্গে নবজাগরণ দেখা দিবে। ফলে পূর্বের ন্যায় আর তাহাদিগকে শোষণ ও নিস্পেষণ করা যাইবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক ইহা তাহারা কোনদিনই সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে নিপীড়িত মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগরিত হইবে এই ভয়ে রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে।" (আতাউর রহমান ও লেনিন আজাদ ১৯৯০)

www.pathagar.com

বাংলা বিভাগের প্রেক্ষিতে হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্ট তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া অবশেষে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'স্বদেশী আন্দোলন' শুরু করে যা অচিরেই 'বয়কট' আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। 'প্রাচীন শিল্প-কারখানা ও হস্ত-চালিত শিল্পসমূহ পুনঃপ্রচলন করার উদ্দেশ্যে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গতি লাভ করে। কোলকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে এসময় বিপ্লবীরা 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' নামে গোপন সশস্ত্র দল গড়ে তোলে। এসময় সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আবার হিন্দু ধর্মের প্রতি কঠোরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

বঙ্গ বিভাগ বিরোধী বা স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে সকল সভা-সমাবেশই অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের উদ্যোগে। এক হিসেবে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রায় তিন হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দও সারাদেশে ব্যাপক সফর করে নতুন প্রদেশ গঠনের সুফল সম্পর্কে তুলে ধরেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ পূর্ব বাংলার মুসলিম জনতার মুখপাত্রে পরিণত হন। উগ্র হিন্দুরা মেনে নিতে না পেরে নওয়াবকে হত্যারও চেষ্টা চালায়। ১৯০৭ সালের ৪ মার্চ তিনি ইসলাম আলী চৌধুরীর আমন্ত্রণে কুমিল্লায় গমন করেন এবং এক জনসভায় ভাষণ দেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে যখন একটি মিছিল রাস্তা দিয়ে এগুচ্ছিল তখন উগ্র হিন্দুরা দাঙ্গা শুরু করে। একজন হিন্দু পুলিশ অফিসার এক মুসলিম যুবককে হত্যা করে। পরের দিন নওয়াব সলীমুল্লাহর সেক্রেটারীকে লাঠিপেটা করা হয়। পরের দিন মুসলমানদের প্রতিবাদ সভায়ও হামলা চলে। গোপন স্থান থেকে হিন্দুরা নওয়াব সলীমুল্লাহর উপর গুলি চালায়। আবার তিনি ট্রেনে চড়ে ঢাকায় ফেরার পথে চাঁদপুরের নিকট তাঁর ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্য উগ্র হিন্দুরা চেষ্টা করে।

নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ কার্যকর হবার পর হিন্দুদের প্রচণ্ড আন্দোলন সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় বিশেষত ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত হতে থাকে। রাজধানী ঢাকা তার হৃতগৌরব ফিরে পেতে থাকে। মুসলমানরা নব উদ্দীপনা নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে থাকে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হলে নতুন প্রদেশের প্রতি প্রত্যক্ষ ও সুদৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। এ দলের পক্ষ থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়, "এই বিভাগ নতুন প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে অবশ্যই উপকারী প্রমাণিত হবে এবং আন্দোলনের পন্থা যথা 'বয়কট' কঠোরভাবে নিন্দা ও দমন করতে হবে।" পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠনের এক বছর পূর্তিতে 'হিন্দুরা জাতীয় শোক দিবস' পালন করে। তারা অব্যাহতভাবে পাঁচ বছর আন্দোলন

www.pathagar.com

চালিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ১৯১০ সালে বঙ্গ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা কমে আসে। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে থাকে। উন্নয়ন কার্যক্রমও চলতে থাকে। এ সময় লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ার আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে, 'জনগণের মধ্যে এই নব প্রদেশের নাগরিক হওয়ার জন্য ভরপুর আত্মগৌরব অনুভূত হচ্ছে। বিরোধিতার প্রকোপ হ্রাস পাচ্ছে। বঙ্গ বিভাগের কতক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুও এখন জনহিতকর কঠিন কর্মসাধনে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছে'। নতুন ব্যবস্থায় মুসলমানদের উন্নতির যে সূচনা হয়েছিল তাতে আশান্বিত হয়ে নওয়াব সলীমুল্লাহ বৃটিশ পার্লামেন্টের নেতা ফেয়ার হার্ডিকে লেখা এক চিঠিতে বলেন ঃ

> "আমরা বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করেছি। এটা আমাদের উপকারে আসবে। এ ব্যাপারে সামান্য কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গ বিভাগ মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং ফলস্বরূপ এখানে তারা গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের স্বার্থকে এখানে যত্নের সাথে দেখা হবে। পুনর্গঠিত জেলা প্রশাসনের অধীনে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য উৎসাহ লাভ করেছে। আগের ব্যবস্থায় এটা সম্ভবপর ছিল না। কারণ প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে যে মনোযোগ লাভের প্রয়োজন ছিল, তা আগের ব্যবস্থা দিতে পারেনি।"

নতুন পূর্ববাংলা প্রদেশ চালু হবার পর রাজধানী ঢাকায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তৎকালীন ঢাকার লেখক মুনশী রহমান আলী তায়েশঃ

> "ঢাকা এক সময় ইসলামী রাজধানী ছিল। অনেক কাল পর বৃটিশ শাসনামলে তা আবার রাজধানীতে পরিণত হল। নব যুগের সূচনা হয়েছে। ঢাকাবাসীর লুপ্ত ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। এখন উন্নতির ধারা বয়ে চলছে। ঢাকাতে একটি সিভিল স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে যে সব স্থানে জাঁকালো সৌধ ও শাহী প্রাসাদ দন্ডায়মান ছিল, আল্লাহর শুকুর সে সব জায়গায় আবার নতুন করে নির্মাণ কাজ চলছে। এইসব উচ্ছন্ন স্থানে নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে। নব নির্মিত এলাকাকে বলা হয় 'নিউ টাউন'।"

পূর্ববাংলার বিভক্তিতে নতুন প্রদেশে যে উন্নয়নের গতি সঞ্চার করে তাতে আশান্বিত হয়ে নবাব সলীমুল্লাহ মন্তব্য করেন ঃ

www.pathagar.com

"বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছে। দরিদ্র মুসলমান যুবকরা এতদিন কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও উপযুক্ত চাকরী পেত না, নতুন প্রদেশে তারা উপযুক্ত চাকরী পাচ্ছে।"

হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

"হিন্দুরা কালক্রমে বুঝতে পারবে যে, পূর্ববাংলা প্রদেশ স্থাপিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বিভক্ত হয়নি, বরং দু'টি সহোদর বা প্রদেশের শাসন, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির সুব্যবস্থা হবে এবং বাঙ্গালী জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।"

লর্ড কার্জন প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচিনারের সঙ্গে সামরিক প্রশাসন ক্ষেত্রে বিরোধের কারণে ১৯০৫ সালেই ইংল্যান্ডে ফিরে যান। লর্ড মিন্টো নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তিনি এসে বাংলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখতে পান। তিনি বাংলা বিভাগকে 'মীমাংসিত বিষয়' বলে মন্তব্য করলে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও পত্রিকাগুলো তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এদিকে কংগ্রেস সমর্থক বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যগণ হেনরী কটনের নেতৃত্বে বঙ্গবিভাগ বাতিল করার জন্য বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভারত সচিব লর্ড মর্লি তাদেরকে বলেন যে, "বাংলা বিভাগ প্রশাসনমূলক, তা পরিবর্তণ সাপেক্ষ নয়।" নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার র‍্যামফিল্ড ফুলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে হিন্দু নেতারা তাঁকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকে। হিন্দুদের চক্রান্তে তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য হন। লর্ড মিন্টো ১৯০৬ সালে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ফুলারের পদত্যাগে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়। তারা নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯১০ সালের শেষ দিকে লর্ড মিন্টোর স্থলে লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তিনি প্রথম থেকেই কংগ্রেস নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপোষ-নীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গ বিভাগ রদ করতে মনস্থ করেন। তাঁর প্রস্তাবে তৎকালীন ভারত সচিব সমর্থন দেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন উন্নয়নের প্রবাহ গতিলাভ করছিল ঠিক সে সময় নতুন প্রদেশের ভাগ্যে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'দিল্লীর দরবার' নামে খ্যাত সমাবেশে বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ এক ঘোষণায় বঙ্গ বিভাগ রহিত করেন। এ ঘোষণায় ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় প্রশাসন উচ্চ

www.pathagar.com

বর্ণের উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সৃষ্ট আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে। অন্য অর্থে 'বঙ্গ বিভাগ রদ' ছিল কংগ্রেসের সাথে বৃটিশ শাসকদের আপোষ রফার ফলশ্রুতি।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের ফলে যারা ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিল, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, পূর্ব বাংলার সেই মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বঙ্গ বিভাগ রদের ঘোষণায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। নওয়াব সলীমুল্লাহ এ ঘটনায় এতটাই মানসিক আঘাত পান যে, তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

নওয়াব সলীমুল্লাহ ১৯১২ সালের ২ মার্চ কোলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির' অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দানকালে বলেন, "যে কায়দায় বঙ্গ বিভাগ রহিত করা হয়েছে, তাতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের হৃদয় কালিমা ও নিরাশা ছায়াপাত করেছে- এটাই আমার বিশ্বাস"। ১৯১২ সালের ৪ মার্চ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ৫ম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলীমুল্লাহ বলেন ঃ

> "I cannot, however, pass on to the matters without referring to are called the Durbar announcement, one of which has unfortunately saddened Mussalman hearts and cast a sombre shadow over Mussalman homes in East Bengal."

শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ঃ "বঙ্গভঙ্গ রদ প্রসংগে আমি বলতে চাই সময়ের ব্যবধানেও এই ক্ষতি মোচন সম্ভব নয়, কেননা এটি ছিল আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য আত্মসম্মান হানিকর একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা।" বঙ্গবিভাগ রহিতকরণে গোটা ভারতের মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ নন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি নিয়ে মুসলমানরা কোন আন্দোলনে যেতে উৎসাহ পায়নি। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভিন্ন ধারার কোন স্বতন্ত্র অন্দোলন গড়ে তোলার মত অবস্থা তখন মুসলমানদের ছিল না। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের তখন রাজনৈতিক কৌশল ছিল সরকারের আনুগত্য করে দাবী আদায় করা। অপরদিকে কংগ্রেসে যে কতিপয় মুসলিম নেতা ছিলেন তারা কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের মতই বঙ্গবিভাগ রদে খুশী হন। তারা বরং অন্যান্য মুসলিম নেতাদেরকে 'মুসলিম লীগ' ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে উৎসাহিত করতে থাকেন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে নওয়াব ভিকারুল মুল্ক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন। তিনি 'আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট'-এ প্রকাশিত

www.pathagar.com

"ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা" শীর্ষক দীর্ঘ আবেগময় প্রবন্ধে বলেনঃ 'বঙ্গ বিভাগ রদ করে সরকার মুসলমানদের প্রতি অসমীচীন উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে।-----সরকার এমন কাজ করেছে যা মুসলমাদের প্রাণে আঘাত হেনেছে।------এটা সত্য যে, নৈরাশ্য মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। 'আমরা কংগ্রেসের সাথে মিলে যাবো'-এমন ধারণা হল নৈরাশ্যের ফল, আর এর জন্য দায়ী হলেন বর্তমান সরকার। এখন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানদেরকে সরকারের উপর ভরসা করার পরামর্শ দেয়া বৃথা। কারোর উপর ভরসা করার সময় এখন আর নেই। আমাদেরকে ভরসা করতে হবে বাহুবলের উপর। আমাদের গৌরবময় পূর্ব পুরুষগণ এই নজীর রেখে গেছেন, যা আমাদের সম্মুখেই রয়েছে।"

নওয়াব সলীমুল্লাহ ভিকারুল মুল্‌ক-এর মতই মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বঙ্গবিভাগ রদে ভগ্ন মনোরথ হলেও বাংলার মুসলমাদের স্বার্থে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বরেই দিল্লীর দরবার উপলক্ষে উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনা করেন এবং ৮ দফা দাবী সম্বলিত এ স্মারকলিপি লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট পেশ করেন। দাবীগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর গভর্নর কোলকাতা ও ঢাকা-এই উভয় রাজধানীতে সমভাবে অবস্থান করবেন;

২. বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর মুসলমানদেরকে সংখ্যানুপাতিক হারে ব্যবস্থাপক পরিষদ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিতে হবে;

৩. পূর্ববাংলার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে; অথবা পূর্ব বাংলার রাজস্ব সেখানকার জেলাসমূহের শাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন খাতেই ব্যয় করতে হবে;

৪. সরকারী চাকরীতে আরো অধিক হারে মুসলমানদেরকে নিয়োগ করতে হবে; এ ছাড়া একজন হিন্দুর পর একজন মুসলমান সদস্যকে বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নিয়োগ করতে হবে;

৫. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এমন একজন অফিসার থাকতে হবে যার পূর্ববাংলা ও আসামের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে;

৬. ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে এমন দু'জন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে যাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা রয়েছে; পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের জন্য একজন যুগ্ম পরিচালক বা সহ-পরিচালক নিয়োগ করতে হবে;

www.pathagar.com

৭. মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা খাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে; মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশগুলো কার্যে পরিণত করতে হবে।

স্মারকলিপিতে নওয়াব সলীমুল্লাহ বড় লাটকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁকে এবং পূর্ববাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অভিযোগ ও দাবী পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এতে নওয়াব সাহেব মনে এত ব্যথা পান যে, তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ারকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন ঃ

> "Everyone is sick all official and Mohamedans are very indignant. The new beautiful town of Dhaka is gone.. A great deal of money wasted and the beautiful grounds will grow into jungles and nice house will be haunted. Mohammedans are gone backward again. They are ruin entirely . The Hindus now come in power and they will use the same against the Mohammedans . All my six years' hard labour has gone and I left broken hearted.

উল্লেখ্য যে, নওয়াব সলীমুল্লাহকে দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু নওয়াব আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন যে, দরবারে বঙ্গবিভাগ রদের ঘোষণা দেয়া হবে। তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে দরবারে বিরত থাকার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ভাইসরয় ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে দিল্লী যেতে বাধ্য করেন। ঐ দরবারেই নওয়াবকে 'জি.সি.আই.ই' পদকে ভূষিত করা হয়। তিনি উপস্থিতভাবে ঐ পদক গ্রহণ করলেও পরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এ বলে যে, "It is a bait, a bribe and a halter of disgrace round my neck" ঢাকায় পৌঁছেই তিনি ঐ পদকের ব্যাজ ছুঁড়ে ফেলে দেন।

১৯১১ সালের ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব সলীমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগে উভয় বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গ বিভাগ রদ পরবর্তী পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা। নওয়াব গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও ঐ সভায় যোগদান করেন। নওয়াব খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গৃহীত সর্ব্বসম্মত প্রস্তাবে মুসলমানদের অনুভূতির

www.pathagar.com

পরোয়া না করে, বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে বঙ্গ বিভাগ রহিত করার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, যেহেতু বঙ্গবিভাগের ওদের ঘোষণাটি স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক করা হয়েছে এবং যেহেতু মুসলমানরা বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যশীল, সেহেতু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। সভায় গোটা বাংলার মুসলমানদের জন্য কোলকাতায় সদর দফতর স্থাপন করে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষে নওয়াব সলীমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ.কে. ফজলুল হক বড় লাটের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী উত্থাপন করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। বৃটেনের ভারত সচিবের অনুমোদনের পর ভাইসরয় ১৯১২ সালের ৮ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ঘোষণায় আরো বলা হয়, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ খোলা হবে। ১৯১২ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। সরকার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সহায়তায় ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করার জন্য নওয়াব সলীমুল্লাহকে নিযুক্ত করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে আর্থিক সংকটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চাপা পড়ে যায়। নওয়াব সলীমুল্লাহর অবর্তমানে নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন নওয়াব সলীমুল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দক্ষিণ হস্ত। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত উভয়ই সম্মিলিতভাবে বঙ্গ বিভাগ, মুসলিম লীগ গঠন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজসহ পূর্ব বাংলার স্বার্থে বহু কাজ করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ ছিলেন 'প্রাদেশিক মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'- এর সভাপতি এবং নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন তার সেক্রেটারী। নওয়াব আলী ছিলেন ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য। তিনি ১৯১৭ সালে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়টি উত্থাপন করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার কাজে পুনরায় অগ্রগতি হতে থাকে। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। পরিষদের সদস্যগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন।

www.pathagar.com

১৯২১ সালের জুলাই মাসে নওয়াব সলীমুল্লাহর স্বপ্নে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা আরম্ভ হয়। কিন্তু তখন আর তিনি ইহজগতে নেই। পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য শিক্ষা বিস্তার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে আগস্ট ১৯৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠিত আবাসিক হলের নামকরণ করা হয় 'সলীমুল্লাহ মুসলিম হল'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্ট সভায় পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলনে নওয়াব সলীমুল্লাহর অবদানের জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটি প্রস্তাব পাস হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন এ.কে.ফজলুল হক। তিনি বলেনঃ

> "In the first meeting of the University Court I moved the resolution recording, the appreciation and gratefulness of the muslims of East Bengal to late Nawab Salimullah who was a true lover of his country and people, and a courage and unselfish fighter for their progress and prosperity."

উল্লেখ্য যে, ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে বাংগালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ, মঞ্চে ভাষন এবং ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে থাকে। কংগ্রেসপন্থী কতিপয় মুসলমানও তাদের সাথে সুর মিলায়। ঢাকায় এক প্রতিবাদ সমাবেশে সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা সাহিত্য বিভক্ত হবে; আর সাহিত্য এক না হলে একতার আশা করা যায় না; এরূপ ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালী জাতির অবস্থা পূর্বেকার বঙ্গ বিভাগ অপেক্ষা বেশী শোচনীয় ও ক্ষতিকর হবে। এতে বাংগালী জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে। বর্ধমানের স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়ের সংগে দেখা করে বলে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হবে 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গ বিভাগ'-এর সমার্থক; তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তারা কোন মতেই উপকৃত হবে না। হিন্দু নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর সফর করে বিভিন্ন প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যদি মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলার মুসলমানরা বেশী উপকৃত হয়, হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মনোপীড়ার কী কারণ থাকতে পারে? তিনি আরো বলেন যে,

www.pathagar.com

গুটিকয়েক রাজনীতিকের মনস্কামনা চরিতার্থ করার জন্য আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার অপরাধে দেশত্যাগ করে যেতে পারি না। বস্তুত বঙ্গ বিভাগের সময় হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যের অবনতি ঘটে, পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি হিন্দুদের ঈর্ষান্বিত মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, হিন্দুরা কখনোই তাদের মঙ্গল চায় না।

মুসলিম লীগ গঠন

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বৃটিশ পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ইংগিত দেন। সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সঠিকভাবে রক্ষিত হবে কিনা এ নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ সময় থেকে তারা শাসনতান্ত্রিক উপায়ে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা জোরদার করার সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ লক্ষ্যে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের ৩৫ জন মুসলিম নেতার সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এ সময়টাতে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা আন্দোলন করছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপিতে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের স্থায়িত্বের বিষয়টি স্থান পাবে না, নওয়াব সলীমুল্লাহ তা আগে-ভাগেই জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে সিমলায় যাননি। অবশ্য এ সময় তাঁর চোখে অস্ত্রোপচারও হয়েছিল বলে সেখানে যেতে পারেননি বলে ভিন্ন মত রয়েছে। নওয়াব আলী চৌধুরী পূর্ব বঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সিমলায় গমন করেন। সেদিন পূর্ব-বাংলার স্বার্থ নিয়ে অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ 'অবহেলা' দেখালেও নওয়াব সলীমুল্লাহ মুসলিম স্বার্থে তাঁর নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে 'মুসলিম অল-ইন্ডিয়া কনফেডারেসী' নামক একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের কাছে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। এদিকে তিনি 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর বিশতম বার্ষিক অধিবেশন ঢাকায় আহ্বানের জন্য উক্ত সংস্থার সেক্রেটারী নওয়াব মহসিন উল মুল্‌ক-কে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ঐ বছরেই ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নিখিল

www.pathagar.com

ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতির অধিবেশন বসে। নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে আয়োজিত এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শরফুদ্দীন। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৫০০ প্রতিনিধি ও ৫০০ -এর বেশী অতিথি দর্শক ও অধিবেশনে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যয় নওয়াব সলীমুল্লাহ বহন করেন। সভায় পেশকৃত বার্ষিক রিপোর্টে ঢাকায় অধিবেশন অনুষ্ঠানে নওয়াব সলীমুল্লাহর সাহস, বদান্যতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা হয়। কনফারেন্সে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তিন দিনের অধিবেশনে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয় এবং তাতে ভারতের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে মোট ৩১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে ১৩ টি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতি ১০টি প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করে। তৃতীয় ও শেষ দিনের সম্মেলনে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ প্রস্তাবিত মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের খসড়াটি বিবেচনার জন্য সকল প্রতিনিধিদের নিয়ে অধিবেশন বসে। নওয়াব ভিকারুল মুলক এতে সভাপতিত্ব করে। নওয়াব সলীমুল্লাহ্ এতে প্রদত্ত সুদীর্ঘ ভাষণে *Muslim All India Confederacy* গঠনের যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন : 'এ মুহূর্তে আমাদের সকলের অধিকতর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতীয় জাগরণ এখন লক্ষণীয়। ... এখন রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদেরকে ১৮৯০ সালের চাইতেও অধিকতর সক্রিয় প্রচারে ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি কাজে লাগাতে হবে এবং আমাদের রাজনৈতিক সংগঠনকে আরো জনপ্রিয় ও প্রতিনিধিত্বমুলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রস্তাবিত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য হলো আমাদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনা। এতে সরকারের প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি সহমর্মিতা অব্যাহত থাকবে।'

নওয়াব সলীমুল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ তাঁর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পথ সুগম করে। প্রস্তাবিত *Muslim All India Confederacy* এর স্থলে সভায় *All India Muslim League* (নিখিল ভারত মুসলিম লীগ) নামটি গৃহীত হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। নওয়াব সাহেব নতুন সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। একই অধিবেশনে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন কমিটির অন্যতম সদস্য।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়ঃ

ক. বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের কোন কাজে গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে তা দূর করা।

খ. ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ ও অগ্রগতি সাধন করা এবং তাদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সশ্রদ্ধভাবে গভর্নমেন্টের কাছে তুলে ধরা।

গ. ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরীভাবের উদ্রেক হলে সংগঠনটির অন্যান্য স্বার্থের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তা রোধ করা।

নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে ব্যাপক গণসংযোগ করেন। তাঁরা বহু জনসভায় ভাষণ দেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ একই সঙ্গে নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁদের এই কর্মতৎপরতা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায়।

১৯০৭ সালের শেষ দিকে কোলকাতার ডালহৌসি ইনস্টিটিউট হলে নওয়াব সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে উভয় বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয় বাংলা এবং আসাম প্রদেশের জন্য যুক্তভাবে 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ এতে সভাপতি নির্বাচিত হন। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও বিচারপতি জাহিদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯০৮ সালে নওয়াব সলীমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভায় "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ" গঠিত হয়। অস্থায়ী কমিটিতে চৌধুরী কাসেমুদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী সভাপতি এবং নওয়াব সাহেব সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠন করার সাথে সাথে নওয়াব সলীমুল্লাহ জেলা পর্যায়ে দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯১০ সালের মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ৩২টি শাখা গঠিত হয়। ১৯০৯ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিয়মিত কমিটি গঠিত হয়। এতে নওয়াব সলীমুল্লাহকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। বঙ্গ বিভাগের প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস, লুটতরাজ তথা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি প্রতিরোধের জন্য ভাইসরয় মর্লি মিন্টোর অভিপ্রায় অনুসারে উভয় বঙ্গের প্রধান জমিদারগণ ১৯০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী বর্ধমানের মহারাজার বাসভবনে

www.pathagar.com

মিলিত হয়ে Imperial League নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ সেখানে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একই উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১৯০৯ সালের ২১ মার্চ Imperial League of Eastern Bengal and Assam গঠন করেন। কমিটিতে প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, সৈয়দ শামসুল হুদা, সিরাজুল ইসলাম, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সংস্থার মাধ্যমে নওয়াব সলিমুল্লাহ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান।

বঙ্গ বিভাগের প্রভাব

বঙ্গ বিভাগের পূর্বে কোলকাতা ছিল শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের আবাসস্থল। তাদের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোলকাতা। পূর্ব বাংলা ছিল কোলকাতার পশ্চাদভূমি। বৃটিশ ভারতের রাজধানী হবার কারণে সকল শোষণ প্রক্রিয়াও আবর্তিত হতো কোলকাতাকে কেন্দ্র করে। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার তৎপরতা শুরু করেছিল তার কেন্দ্রও ছিল কোলকাতা। শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্রও ছিল এ নগরী। বিশ শতকের গোড়াতে কেবল কোলকাতা নগরীতেই ২২টি কলেজ ছিল। বাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ও এখানে ছিল। মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলার জেলাগুলোর প্রতি সরকারের তেমন নজর ছিল না। ফলে উচ্চশিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠেনি। মুসলমানদের সন্তানরা যারা কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিল তারা কোলকাতা থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরীতে কোলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু শিক্ষিতদের সাথে পেরে উঠছিল না। ফলে অনেক শিক্ষিত মুসলিম যুবক বেকার থাকতো। পূর্ববঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলে রাতারাতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের শেষদিকে ভূমি সংস্কারের ফলশ্রুতিতে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পেতে থাকলে মুসলমান কৃষকরা সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করলে লেখাপড়ার প্রতিও তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ সময় ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় মুসলমানদের চাকরীর সুযোগও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বঙ্গ বিভাগের ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি পরিলক্ষিত হয় শিক্ষাক্ষেত্রে। নতুন প্রাদেশিক সরকার শিক্ষার সকল পর্যায়ে সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯০৭-১৯১২ সালের মধ্যে সারা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রীর বৃদ্ধি ঘটে ৩৭%; অথচ পূর্ব বাংলায়ই বৃদ্ধি পায় ৮২.৯% যা ছিল সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। নতুন পূর্ববাংলা

www.pathagar.com

প্রদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয় তা ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, ১৯০৬ সাল থেকে নতুন প্রদেশে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঐ বছর পূর্ববাংলায় ও আসামে কলেজিয়েট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৬৯৮ জন এবং কলেজিয়েট শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো ১,৫৪,৯৫৮ টাকা। ১৯১২ সালে ঐ সমসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৬০ জনে এবং ব্যয় ৩,৮৩,৬১৯ টাকায়। ১৯০৫ সালে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,৯৯,০৫১ জন তা ১৯১০-১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯,৩৬,৬৫৩ জনে। এ সময় প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক শিক্ষা খাতের ব্যয় ১১,০৬,৫১০ টাকা থেকে ২২,০৫,৩৩৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় শিক্ষা ব্যয়ও ৪৭,৮১,৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯০৮-১৯০৯ সাল নাগাদ ৮১৯ টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থপিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৫,৪৯৩ জন। পূর্ববাংলায় ১৯১০-১১ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫৫০টি এবং ছাত্রী সংখ্যা ১,৩১,১৩৯ জন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ১৯০৭-১৯০৮ সালের ১২৯৯টি মক্তব থেকে ১৯১১-১২ সালে ১৫৪৮ টিতে বৃদ্ধি পায়। একই সময় মক্তবগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪০,১৮৮ থেকে ৫৪,৭০৩-এ। এসময় মাধ্যমিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানদের জন্য বৃত্তি বৃদ্ধির ফলে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তি প্রাপ্তির অনুপাত দাঁড়ায় ৫:৮-এ। মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা দূর করার জন্য সরকার প্রায় সকল স্কুল ও কলেজে মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ করে। ১৯১১-১৯১২ সালে মুসলিম ছাত্রাবাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২-তে। স্কুল ও কলেজগুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। লেঃ গভর্নর ফুলার এক আদেশের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষকদের সংখ্যা কমপক্ষে শতকরা ৩৩-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। শিক্ষা বিভাগে মুসলমান অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার নির্দেশ দেয় যে, প্রত্যেক জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা অনুপাতে উপ-পরিদর্শক নিয়োগ করা হবে। ১৯১২ সালে উপ-পরিদর্শকের সংখ্যা ৯৭ থেকে ১১৪ তে উন্নীত করা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ১৯১২ সাল নাগাদ মুসলমানদের সংখ্যা ৯,৬৫৪ জন থেকে ১৪,৬৫৬ তে বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গ বিভাগের পরে পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। লর্ড কার্জন নিজেই বলেছেন,

> "The new province advanced in education, in good government, in every mark of prosperity."

www.pathagar.com

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠিত হবার প্রথম বছরেই প্রদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২,৯৮,২৭,৩৯৭ টাকা থেকে ৩,১৭,৭৭,৮৪৬ টাকায় বৃদ্ধি পায়। আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই এ বৃদ্ধি ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দর প্রদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১৯০৫-১৯০৬ সালে এ বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩১৭,৭৬ লক্ষ টাকা যা ১৯০১-১৯০২ সালের চেয়ে চারগুণেরও বেশী।

ঊনবিংশ শতকের শেষে ভূমি সংস্কার আইনের যে ইতিবাচক প্রভাব ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলার কৃষকদের উপর পড়তে শুরু করেছিল, সে সময়ই আবার নতুন পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠিত হয়। এ দুটো বড় পরিবর্তনের সুফল পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে অনুভূত হতে থাকে। এ সময় পাটের চাহিদা ও মূল্য বেশ বৃদ্ধি পায়। ১৯০৪ সালের চেয়ে ১৯০৬-১৯০৭ সালে পাটের দাম প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এরূপ বৃদ্ধি কয়েক বছর ধরে স্থায়ী হয়। কোলকাতাকেন্দ্রিক পাটকলগুলোতেও পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৬-১৯৯৭ সালের প্রতি বেল পাটের যে মূল্য ছিল ৩০ টাকায় তা ১৯০৬-১৯০৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৯ টাকায়। কাকতালীয়ভাবে বঙ্গ বিভাগের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের ব্যবসায় তেজীভাব ধারণ করে। বাংলার পাটকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকায় বহু পাটকল গড়ে ওঠে। এ সময় বৃটেনে ৩০টি, জার্মানীতে ৩৬টি, অস্ট্রিয়া-হাংগেরীতে ১৭টি, ফ্রান্সে ৩২টি, বেলজিয়ামে ২৩টি, আমেরিকায় ১৬টি, রাশিয়ায় ৭টি এবং অন্যান্য দেশে ৯৬টিসহ বিশ্বব্যাপী ২০২টি পাটকল স্থাপিত হয়। এ সব কলের কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে পূর্ববাংলায় পাট চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পাটের ভাল দাম পেয়ে পূর্ববাংলার মুসলমান কৃষকরা আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখতে থাকে। 'সন্দেহাতীতভাবেই কৃষকদের কাছে তা বঙ্গ বিভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই ধরা পড়ে'।

নওয়াব সলীমুল্লাহ বাংলার ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতায় তাঁর হৃদয় ব্যাকুল ছিল। তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাদের উন্নতি-অগ্রগতির পথকে সুগম করার জন্য। এ প্রচেষ্টারই প্রতিফলন ঘটে তাঁর শিক্ষা আন্দোলন, মুসলিম লীগ গঠন ও পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের মধ্যে দিয়ে। এই তিনটি অবিস্মরণীয় কীর্তির জন্য তিনি এদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

নওয়াব সলীমুল্লাহ মুসলমান সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাকে সহজতর করার লক্ষ্যে একদিকে নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, অপরদিকে ইংরেজ সরকারের সাথে দেন-দরবার করে বিভিন্ন দাবী আদায় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নওয়াব সলীমুল্লাহ দেখেছিলেন এবং সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাই অন্যদের হাতে এক সময় বাস্তবে রূপ লাভ করে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের সন্তানদের মধ্য থেকে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে তারাই পরবর্তীতে সর্বক্ষেত্রে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরাই সম্মিলিতভাবে ১৯৪০ এর দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান/পূর্ববাংলা প্রদেশের সরকার পরিচালনায় ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া শিক্ষিত তরুণরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজও দেশের নেতৃত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জাতির গৌরবের প্রতীক। নওয়াব সলীমুল্লাহ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা যে কত বড় সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিল তা আজ রূঢ় সত্য হিসেবে সকলের সামনে উদ্ভাসিত।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলমানদের প্রতি ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের সন্দেহপরায়ণতা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে মুসলমানদের পক্ষে ভারতের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল কোন সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলমানরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন দল বা সংস্থার অধীনে সংগঠিত ছিল না। এ বাস্তবতা পূর্ব বাংলার জন্যও একইরূপ ছিল। মুসলমানদের এই দুর্দিনে দিক-নির্দেশনা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি মুসলমানদের রাজনীতিতে বিরত থেকে শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। বিশেষ করে তিনি ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণার প্রবক্তা হিসেবে মুসলমানদের উজ্জীবিত করার জন্য এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। স্যার সৈয়দ আহমদের মত বাংলার এই নেতৃত্বও মনে করতেন যে সরকারের সাথে বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতা ও আনুগত্যের নীতি অনুসরণই পশ্চাৎপদ মুসলমাদের এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ। নওয়াব সলীমুল্লাহও প্রথমদিকে এরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং সে অনুসারে 'প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতি'সহ বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায় করেন। তাঁর এ নীতির কিছু সুফল

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে সময়ের বিবর্তনে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদেরকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। তিনি অবশ্য ঐ সমাবেশেই বলেন যে, "১৮৮৭ সালে স্যার সৈয়দ লাখ্নৌ ভাষণে মুসলমানদের "অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এ যোগদান করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৯৩ সালে তিনি নিজেই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।" স্যার সৈয়দ আহমেদ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ কৌশলগত কারণে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহন করেন এবং ধাপে ধাপে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ ঐ নীতিরই পুনরাবৃত্তি হিসেবে সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণে ঢাকার মাটিতে বসে 'মুসলিম লীগ' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিসেবে কংগ্রেস যখন দ্রুতগতিতে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রধান্য বিস্তার করেছিল এবং মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ঠিক সে সময় নওয়াব সলীমুল্লাহ 'মুসলিম লীগ' গঠনের ব্যবস্থা করে ভারতবর্ষের তথা বাংলার মুসলমানদের জন্য এক নব দিগন্তের শুভ সূচনা করেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত মুসলিম লীগের পতাকাতলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলার প্রায় সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ সমবেত হন এবং তাদের নেতৃত্বেই পাকিস্তান (পূর্ব পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে আর্থ-সামাজিক ও রাজতৈক প্রেক্ষাপট বিরাজ করছিল তখন মুসলিম লীগ গঠন ছিল এক অপরিহার্য প্রয়োজন। সেদিনের মুসলিম লীগের গৃহীত নীতি ও কৌশলের ফলশ্রুতিতেই আজকের বাংলাদেশ ভৌগলিক সীমারেখার সূত্রপাত হয়েছিল এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সুতরাং নওয়াব সলীমুল্লাহ ছিলেন পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের মুসলমানদের নবজাগরনের পথিকৃৎ যার কাছে এদেশবাসীর অনেক ঋণ রয়ে গেছে।

ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনার যে উদ্যোগই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, তখনকার প্রেক্ষাপটে নতুন প্রদেশ গঠনের প্রতি নওয়াব সলীমুল্লাহর সমর্থন ছিল এক সময়োচিত পদক্ষেপ। তাঁর এ উদ্যোগ কতটা যথার্থ ছিল নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছিল। বঙ্গ

www.pathagar.com

বিভাগ পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এতটা গতি সঞ্চার করে যা মুসলমানরা পলাশী যুদ্ধের পরে আর লক্ষ্য করেনি। তাছাড়া বঙ্গ বিভাগের প্রেক্ষিতে নতুন প্রদেশের যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল সে একই পরিকল্পনায় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে সমগ্র বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবার কথা হয়েছিল। পরবর্তীতে আবার সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসুর উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বৃহত্তর সার্বভৌম বঙ্গরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলে। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ এ সত্যকে অনিবার্যভাবেই প্রতিষ্ঠা করেছে যে, ১৯০৫ সালে নওয়াব সলীমুল্লাহ, ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের চিন্তাধারা একই সূত্রে বিকশিত হয়েছিল। কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগকে 'আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে একটি প্রধান বিভাজক' হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেও 'কালের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে এটাই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রশাসনিক মতান্তরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে বঙ্গ বিভাগ রচিত হয়েছিল, তাই ছিল সঠিক পদক্ষেপ এবং জনগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক থেকেও তা ছিল স্বাভাবিক'। বস্তুতপক্ষে যে ভৌগলিক এলাকা নিয়ে সেদিন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয়েছিল অনেকটা সেই এলাকা নিয়েই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'পূর্ব বাংলা' প্রদেশ এবং ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুদ্দিন, নওয়াব সলীমুল্লাহ, ঢাকা ঃ ১০,নওরতন গার্ডেন, নিউ বেইলী রোড, ১৯৯২।

২ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব সলীমুল্লাহ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

৩ আবদুল করিম, সোস্যাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, চট্টগ্রাম ঃ বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫।

৪ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, মুসলিম সোসাইটি এন্ড পলিটিকস ইন বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৭৮।

৫ আহমেদ রফিউদ্দিন, মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল, ১৮৭১-১৯০৬, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১।

www.pathagar.com

৬ সুফিয়া আহমেদ, মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল ১৮৮৪-১৯১২, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬।

৭ কাজী আবুল হোসেন, ছোটদের সলীমুল্লাহ, ঢাকা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

৮ আবু যোহা নূর মোহাম্মদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, ঢাকা, ১৯৭৫।

৯ মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, নবাব খাজা সলীমুল্লাহ, রাজশাহী, ১৯৭০।

১০. বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ৯২ তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন স্মারক, বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭

১১. আতাউর রহমান ও লেনিন আজাদ, ভাষা আন্দোলন ঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০

www.pathagar.com

শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক

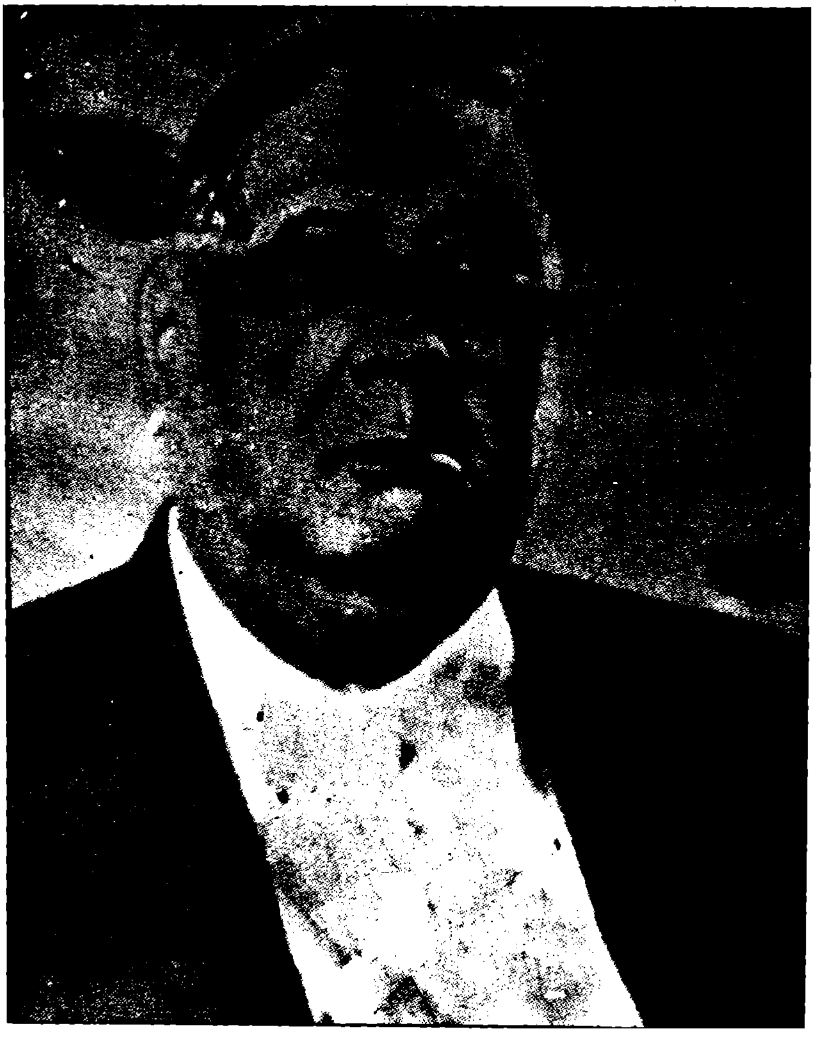

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক

"The real cause for the backwardness of Muslims in all fields and in all countries at the present time, and for our ineffectiveness and lack of prestige and power, is the unfortunate fact that our life activities have been separated in narrow roots and grooves. If we return to the broad and comprehensive Islamic Shariat or way of life, then there will be revolutionary change and we shall advance rapidly in all directions."

—Sher -E-Bangla A.K.Fazlul Huq

জন্ম ঃ ৯ কার্তিক ১২৮০ বাংলা/ ২৬ অক্টোবর ১৮৮৭ ইং ।

পিতা ঃ মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ ।

মাতা ঃ বেগম সৈয়দুন্নেসা খাতুন।

শিক্ষা ঃ বাড়ীতে বুনিয়াদী শিক্ষা এবং ফারসী ও আরবীতে দক্ষতা অর্জন।

- ❑ ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে স্বর্ণপদক পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ।
- ❑ কোলকাতা থেকে ঢাকা বিভাগে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এফ. এ.পাশ।
- ❑ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও অংকশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সের মর্যাদায় ডিগ্রী লাভ; মুসলিম বাংলায় এ মর্যাদার একমাত্র অধিকারী।
- ❑ ১৮৯৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ।
- ❑ ১৮৯৭ সালে ডিসটিংশন নিয়ে বি.এল পরীক্ষায় পাশ এবং কলকাতা হাইকোর্টে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান।

কর্মজীবন ঃ ১৯০১ সালে বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু। বরিশাল থেকে 'বালক' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা। সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙ্গালী মুসলিম সাংবাদিক ও সম্পাদক। একই সময় তিনি ও রায় বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র দাশের যুগ্ম সম্পাদনায় 'ভারত সুহৃদ' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ।

- ❑ ১৯০৩-১৯০৪ পর্যন্ত বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজের অংকশাস্ত্রের অধ্যাপক নিয়োগ।
- ❑ বরিশাল পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত।
- ❑ বাকেরগঞ্জ জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনীত।
- ❑ ১৯১৩ সালে ঢাকা বিভাগ থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত

www.pathagar.com

- ১৯১৩-১৯১৬ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত।
- ১৯২০ সালে মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃতকরণ।
- ১৯২৪ সালে ১ জানুয়ারী স্বল্পকালের জন্য বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত এবং কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ স্থাপন।
- ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় নেতৃবর্গের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান এবং ১৯৩১-১৯৩২ সালে বৈঠকে দ্বিতীয় বার মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্ব।
- ১৯৩৫ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন ও ঐতিহাসিক ডাল-ভাতের আন্দোলন গড়ে তোলা।
- ১৯৩৬ সালে কোলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও প্রথম মুসলিম মেয়র।
- ১৯৩৭ সালে বাংলার প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী।
- ১৯৩৭ সালে পুনরায় মুসলীম লীগে যোগদান।
- ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পেশকৃত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের রচয়িতা ও প্রস্তাবক।
- ১৯৪১ সালে পুনরায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ১৯৪৩ সালে বৃটিশের পোড়ামাটি নীতির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ।
- ১৯৪৮ সালে কোলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় এসে বসবাস।
- ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ।
- ১৯৫২ সালে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত।
- ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দান এবং নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত।
- ১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত।

খেতাব : শেরে বাংলা।

- ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের আজীবন সদস্যপদ প্রদান।
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'নিশান-ই-পাকিস্তান' খেতাব প্রদান।

বিশেষ অবদান : কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ), কোলকাতা কারমাইকেল হোস্টেল, টেলর হোস্টেল, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, আদিনা ফজলুল হক কলেজ, রাজশাহী, চাখার ফজলুল হক কলেজ, ইডেন বিল্ডিং, ইডেন কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমীতে রূপান্তর, ১ বৈশাখ ও ২১ ফেব্রুয়ারী ছুটির দিন ঘোষণা, তাঁর নির্দেশে আবু হোসেন সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ইত্যাদি।

মাজার : ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত তিন নেতার মাজারের অন্যতম।

www.pathagar.com

এ.কে. ফজলুল হক ১৯০৪ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা বোর্ডের একজন নির্বাচিত কমিশনার হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। অবশ্য এসময় তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রম কেবলমাত্র মফস্বল শহর বরিশালেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু একজন প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তির রাজনৈতিক পদচারণা স্বল্পকালের মধ্যেই জেলা শহর অতিক্রম করে প্রাদেশিক পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ফজলুল হকের আবির্ভাব ঘটে দু'টো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। একটি হল ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ ও অপরটি ১৯০৬ সালের 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক দল গঠন।

১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা দেন তখন এ.কে. ফজলুল হক একজন উদীয়মান আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করছিলেন। বঙ্গ বিভাগের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত বরিশালেও কংগ্রেস ও তার সমর্থকরা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। বরিশালের প্রভাবশালী জমিদার অশ্বিনী কুমার দত্ত, ব্যারিস্টার সৈয়দ মোতাহার হোসেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখের নেতৃত্বে বরিশালে 'বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। চারণ কবি মুকুন্দ দাস গান গেয়ে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করছিলেন। ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে বরিশালে গ্রেপ্তার করা হয়। এসব মিলিয়ে বরিশালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত।

ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ পূর্ববঙ্গ বিভাগ গঠনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করলে বরিশালের খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। যুবক ফজলুল হক গভীর মনোনিবেশ সহকারে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গ বিভাগের প্রতি জনসমর্থন সৃষ্টির জন্য হেমায়েত উদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে বরিশালে তৎপরতা শুরু করেন। তিনি নওয়াব সলীমুল্লাহরও সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে ঢাকায় আগমন করলে নওয়াব সলীমুল্লাহ যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। বরিশাল থেকে এ কে ফজলুল হক তাতে যোগদান করেন। মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলা বিভাগ গঠন যে তাদের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে তা এ.কে. ফজলুল হক যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে বঙ্গ বিভাগের প্রেক্ষিত ও ঘটনাবলী ফজলুল হকের মনোজগতে দারুণ প্রভাব ফেলে। এছাড়া কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন, কংগ্রেসের উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড, আলীগড় আন্দোলন, নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ফজলুল

www.pathagar.com

হকের জীবন ও চিন্তাধারাকে আলোড়িত করে। তিনি বাস্তব অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নওয়াব সলীমুল্লাহর সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।

বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যখন কংগ্রেস ও অন্যান্য উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব বাংলার মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগঠিত তৎপরতা শুরু করে, তখন নওয়াব সলীমুল্লাহ মুসলমানদেরকে একটি সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করার উদ্যোগ নেন। তিনি ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' আহ্বান করেন। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রস্তুতি কমিটিতে আবুল কাশেম ফজলুল হককে অন্যতম যুগ্ম-সচিব নিযুক্ত করা হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন ভারতের রাজনীতিতে অন্যতম সম্ভাবনাময় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন। তিনি তখন বোম্বাইয়ের খ্যাতিমান আইনজীবী। নওয়াব সলীমুল্লাহ তাকে সম্মেলনে হাজির করার অভিপ্রায়ে ফজলুল হক সাহেবকে বোম্বাইয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব তখন কংগ্রেসের নেতা বলে ঢাকার সম্মেলনে আসতে আগ্রহ দেখাননি। ঢাকার আহসান মঞ্জিলে আহূত ঐ সম্মেলনে ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবর্গ যোগদান করেন। বরিশালে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে আবুল কাশেম ফজলুল হক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলনের কার্যবিবরণী লেখার ভার ছিল ফজলুল হকের উপর। এ সম্মেলনেই 'মুসলিম লীগ' দল গঠিত হয়। দল সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ফজলুল হক অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে একবার বলেছিলেন "ফজলু, তুমি আমার গদিটা নেও এবং তোমার মাথাটা আমাকে দাও।" তিনি ফজলুল হককে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। ফজলুল হকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি ও মানস গঠনে নওয়াব সলীমুল্লাহর অনন্য অবদান ছিল।

এ.কে. ফজলুল হক নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠন আন্দোলনের সপক্ষে সেদিন যে সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন তা তৎকালীন নবগঠিত প্রদেশ পূর্ব বাংলা ও আসামের গভর্নর স্যার ব্যাম ফিল্ড ফুলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নওয়াব সলীমুল্লাহ ফজলুল হককে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন। গভর্নর সন্তুষ্ট চিত্তে ফজলুল হককে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তৎকালে এ চাকরী পাওয়া যেমন ছিল মর্যাদাপূর্ণ তেমনি কঠিন। চাকরীতে যোগদানের কিছুকাল পরেই তাঁকে জামালপুরে এসডিও হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ সময়ে বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে জামালপুরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলছিল। ফজলুল হক ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা বন্ধ করতে সক্ষম হন। ১৯০৮ সালে তাঁকে আবার এস ডি ও হিসেবে মাদারীপুরে বদলী করা হয়। কিন্তু তিনি এপদ গ্রহণ না করে প্রাদেশিক সমবায় দপ্তরের সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে

www.pathagar.com

যোগদান করেন। কিন্তু ১৯১১ সালে ফজলুল হককে পদোন্নতি না দিয়ে রায় বাহাদুর যামিনীকান্তকে রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করলে তিনি ব্যথিত হন এবং ইংরেজদের গোলামী না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও অচিরেই চাকরীতে ইস্তফা দেন। সরকার তাঁর ইস্তফা পত্র গ্রহন না করে ডায়মণ্ড হারবারে এসডিও হিসেবে বদলী করেন। কিন্তু ফজলুল হক তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি ঐ বছরেই কোলকাতা হাইকোর্টে যোগদানের উদ্দেশ্যে কোলকাতা গমন করেন। তাঁর চাকরী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে আশার সঞ্চার করে। সেদিন তাঁকে কোলকাতায় স্বাগত জানানোর জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির হয়েছিলেন নওয়াব সলীমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা আকরাম খাঁন, মাওলানা বেলায়েত হোসেন, হাশেম আলী খাঁন প্রমুখ। নওয়াব সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে কয়েক হাজার লোকের এক সমাবেশে ফজলুল হককে কোলকাতায় বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ মুসলমান সমাজের উন্নতি অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করার নিমিত্তে ফজলুল হক এগিয়ে আসায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই ফজলুল হক খ্যাতিমান আইনজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯১১ সালে বঙ্গবিভাগ বাতিল হলে তা মুসলমানদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করে। নওয়াব সলীমুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ এসিদ্ধান্তে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এরূপ বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে ফজলুল হক চাকরী ছেড়ে আইন পেশা ও সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। ১৯১২ সালে বঙ্গীয় প্রদেশিক কাউন্সিলের ঢাকা বিভাগীয় আসনের পদ শূন্য হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ ও বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্তের অনুরোধে ফজলুল হক ঢাকা বিভাগের আসনে নির্বাচনে প্রার্থী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রায় বাহাদুর মহেন্দ্র মিত্র। এসময় প্রাপ্ত বয়স্কদের সাধারণ ভোটাধিকার ছিল না। খাজনা ও সেচের ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হত। ভোটারদের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল হিন্দু। ফজলুল হক মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভোট লাভ করেন এবং নির্বাচিত হন। ফজলুল হক মুসলমানদের পাশাপাশি অবহেলিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯১৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিভাগ থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন । তিনি ১৯১৩ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত আইন সভায় ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আইন সভায় বাংলার নির্বাচিত ও শোষিত মানুষের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৩ সালের ৪এপ্রিল বঙ্গীয় আইন সভার প্রথম বাজেট অধিবেশন বসে। ঐ অধিবেশনে বোমকেশ চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষনায় বৃটিশ রাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব শামসুল হুদা, নওয়াব মোশাররফ হোসেন এবং অন্যান্য মুসলিম

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ বঙ্গ বিভাগের সমর্থক হয়েও সেদিন পরিষদে নীরব ছিলেন। একমাত্র এ.কে. ফজলুল হক সেদিন পরিষদে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন এবং তাতে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণার জন্য ইংরেজ সরকারের তীব্র সমালোচন করেন। তিনি বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সভা ও অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ করার সময় বাংলার মুসলমানদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের শিক্ষা, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সে সব প্রতিশ্রুতি শুধু সরকারী কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাস্তবে তা কার্যকরী করার কোন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছিল না। শেরে বাংলা সরকারের সমালোচনা করেন এবং উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, শাসকদের প্রতি অনুগত থাকার নীতি অব্যাহত থাকলে মুসলমানরা কেবল বঞ্চিত ও শোষিত হবে। তিনি প্রতিবাদের ভাষাকেই বেছে নেন এবং মুসলমানদের সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি কেবল পরিষদের চার দেয়ালের মধ্যেই নয়, বাইরে মুসলিম লীগ, মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন, প্রজা সম্মেলন ইত্যাদি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদ করেন। ফজলুল হকের বক্তব্যে বাংলার সাধারণ কৃষক তথা শোষিত বঞ্চিত প্রজাদের প্রাণের প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠে। তিনি একদিকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালান এবং অপরদিকে তাদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি অগ্রগতির জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

শিক্ষা বিস্তারে এ কে ফজলুল হক

ফজলুল হক স্বদেশী আন্দোলনকারীদের অনুসৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে জাতির সংকট উত্তরণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি প্রাদেশিক আইন সভায় একজন তেজস্বী বাগ্মী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ১৪৮ বার আইন সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। তিনি কমপক্ষে ৯০টি বক্তৃতায় শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ৩০ বার শিক্ষা সংস্কারের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল— স্কুল, কলেজ ও হোস্টেলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণ, বিশেষ বৃত্তি প্রদান, মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য আলাদা একজন সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক নিয়োগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কোলকাতা ও ঢাকায় দু'টি পৃথক মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা, ঢাকাসহ উপযুক্ত স্থানে উইভিং ও স্পিনিং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

গভর্নর ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারী ফজলুল হককে বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন। ফজলুল হক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের জন্য সহকারী জনশিক্ষা পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে খুলনার খান বাহাদুর আহসান উল্লাহকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। তিনি কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় উক্ত কলেজের জন্য জমি ক্রয় ও সরকারী অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়। ফজলুল হক সরকারী অর্থ মঞ্জুরি করে তা দিয়ে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠন করেন। তৎকালে স্কুলসমূহে হিন্দুদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। মুসলমান ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে সংস্কৃত পড়তে হত। ফজলুল হক এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরবী ও ফার্সী পড়ানোর লক্ষ্যে এই মর্মে আদেশ জারী করেন যে, কোন স্কুলে সরকারী সাহায্য পেতে হলে একজন মুসলমান শিক্ষক (মৌলভী) নিয়োগ করতে হবে। তিনি সকল স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেন। তৎকালে পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার নিয়ম ছিল। অনেক হিন্দু শিক্ষক সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে মুসলমান ছাত্রদের ভালো নম্বর দিতেন না। এ অবস্থা নিরসনের জন্য ফজলুল হক পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর লেখা প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ইলিয়ট হোস্টেল, টেইলর হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল ও মুসলিম ইনস্টিটিউট নির্মিত হয়। তিনি আলীগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

ফজলুল হক তাঁর জীবনের অন্যতম কর্মোদ্যোগ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত মুসলমান তথা দারিদ্র-পীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই শিক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করে তিনি মুসলমানদের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী পেশ করেন। ১৯১২ সালে তিনি কোলকাতায় "কেন্দ্রীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এসমিতির মাধ্যমেও তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন।

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল ফজলুল হক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলে তিনি শিক্ষা মন্ত্রনালয় নিজ হাতে রাখেন। তিনি জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৪০% ভাগ অর্থ বরাদ্দ করেন শিক্ষা খাতে। তিনি ১৯৩০ সালে পাশকৃত প্রাথমিক শিক্ষা বিল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি এক জরীপ

www.pathagar.com

পরিচালনা করেন। তাতে দেখা যায় যে, ৭৫ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ৫০ লক্ষ স্কুলগামী ছেলে মেয়ের জন্য ৪৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তিনি প্রতি এক মাইল অথবা দুই হাজার অধিবাসীর জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক জেলায় স্কুলবোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য ড. জেকিন্সকে সভাপতি করে একটি প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন যা 'মাওলা বখশী কমিটি' নামে পরিচিত হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার জন্য প্রাদেশিক সার্জন জেনারেলকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন।

ফজলুল হক প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অযৌক্তিক কর্তৃত্বের অবসানের প্রচেষ্টা চালান। উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সালে স্যাডলার কমিশন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ১৯২৪ সালে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে ফজলুল হক মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আইন সভায় পেশ করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে তা পাশ করানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। ১৯৩৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি খসড়া বিল তৈরি করেন এবং তা পরিষদে উত্থাপনের প্রস্তুতি নেন। ইতোমধ্যে বিলটি সম্পর্কে হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড পত্রিকা রিপোর্ট প্রকাশ করলে তা বর্ণহিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিলটিতে প্রস্তাবিত শিক্ষা বোর্ডের ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন মুসলমান সদস্য রাখার কথা বলা হয়। এরূপ উদ্যোগ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করবে- এ মর্মে বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য গভর্নরের নিকট দাবী জানাতে থাকে। হক সাহেব ঐ সব অভিযোগের জবাবে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১৮ বছর পুর্বে স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর মত লোকও ঐ কমিশনের সদস্য ছিলেন। ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন করেছিল। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অহেতুক কর্তৃত্বের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্ণহিন্দুরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬ ভাগ, তারা শুদ্রদের হোস্টেলে স্থান দেয়না, তারাই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব করছে। তিনি এদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, মোট জনসংখ্যার ৫২% মুসলমান এবং ৩০% তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকদের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে কোন হাত নেই। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধনীর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। ফজলুল হকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের বিরোধিতার কারণে শিক্ষা বিলটি পরিষদে উত্থাপন

www.pathagar.com

করা সম্ভব হয়নি। হিন্দু নেতৃবৃন্দ Bengal Secondary Education Bill Protest Conference নামক ফোরাম প্রতিষ্টা করে বিলের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা চালান। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতার হাজরা পার্কে স্যার পি.সি. রায়ের সভাপতিত্বে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময় অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। তিনি হিন্দু নেতৃবৃন্দের ঐ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং ফজলুল হকের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরোধিতা করে বাণী প্রেরণ করেন। স্যার পি.সি. রায় সভাপতির ভাষণে ঐ সময়কে বাংলার ইতিহাসের সংকটকাল ও অন্ধকারময় বলে উল্লেখ করেন। ঐ বছরই ২১ ডিসেম্বর কোলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে শিক্ষা ও সংস্কৃত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ঐ বিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। হিন্দুদের এরূপ বিরোধিতার কারণ ছিল প্রথমত ফজলুল হকের প্রাথমিক শিক্ষা বিলের কারণে ততদিনে মুসলিম ও তফসিলী হিন্দুদের সন্তানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি পাস হলে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত ঐ বিলটি অনুমোদিত হয়ে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে। তৃতীয়ত ঐ বিল কার্যকরী হলে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে চাকুরীতেও তাদের সুযোগ বেড়ে যাবে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অগ্রগতিকে তাদের কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আলামত বলে বিবেচনা করছিল।

কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য ফজলুল হক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা যে কত করুণ ছিল ১৯৫৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে ভাষন দানকালে ফজলুল হক তা তুলে ধরে বলেছিলেন যে, ১৯১২ সালে ঢাকার কলেজগুলোতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ জন। গ্রামের মুসলমান ছাত্ররা মেট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেতো না। কারণ কলেজগুলো ছিল অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্রাবাসগুলোতেও মুসলিম ছাত্রদের স্থান হতো না।

শেরে বাংলা মুসলিম শিক্ষার্থীদের দুর্দশা দূর করার জন্য নতুন কলেজ ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। তিনি মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও এককালীন অর্থ সাহায্য চালু করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় চাখার কলেজ (বরিশাল), আদিনা ফজলুল হক কলেজ (কুষ্টিয়া), ঢাকার কৃষি কলেজ এবং কয়েকটি পশু চিকিৎসা ও কারিগরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হোস্টেল নির্মাণ করেন। টাংগাইল জেলার করটিয়া পন্নী পরিবারের উদ্যোগে ও অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা-বিহার ও আসামের মধ্যে মুসলমানদের

www.pathagar.com

জন্য প্রথম কলেজ 'করটিয়া সা'দত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক ঐ কলেজের উন্নয়নে অর্থ মঞ্জুরী দেন এবং ১৯৩৯ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজের হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন।

তৎকালীন বাংলায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রধান পাদপীঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অধিকতর ঝুঁকে পড়ে এবং কোলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁদের আগ্রহ কমে যায়। ফজলুল হক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের গঠন কাঠামোতে এবং শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উল্লেখ্য যে, সিনেট ও সিন্ডিকেটে মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং এজন্য মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ফজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাকালে বলেন যে, ১০০ জন সিনেটরের মধ্যে মুসলমান মাত্র ২১ জন এবং ১৭ জন সিন্ডিকেট সদস্যের মধ্যে মুসলমান সদস্য মাত্র ১ জন। এ ছাড়া ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলরদের মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যেও বৈষম্য ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৮৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মুসলমান মাত্র ২ জন এবং অন্যান্য ১৮০ টি পদের মধ্যে মুসলমান মাত্র ২ জন। এ ছাড়া ১৯৩৭ সালে ২ হাজার পরীক্ষকের মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ১০০ জন। ফজলুল হক সিনেট ও সিন্ডিকেটে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের হার বৃদ্ধি করার উপর জোর দেন।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কোলকাতা বিশ্ববিধ্যালয়ের মনোগ্রাম নিয়েও তাদের আপত্তি উত্থাপন করেন। আপত্তির কারণ—ঐ মনোগ্রামে লেখা 'শ্রী' এবং 'পদ্মফুল' হিন্দু ধর্মের প্রতীক যা মুসলমানরা গ্রহন করতে পারে না। ফজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মনোগ্রাম পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী বছরগুলোতে সিনেট ও সিন্ডিকেটে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

ফজলুল হক মুসলিম নারীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুসলমান মেয়েরা সহশিক্ষার বিরোধী ছিল। এ জন্য তিনি কোলকাতায় 'লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ' নামে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত 'রোকেয়া শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল'টি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলে ফজলুল হক স্কুলটিকে সরকারীকরণ করেন। তিনি ঢাকার ইডেন স্কুলের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করেন। এ ছাড়া বরিশালে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের বাসভবনে তাঁর মায়ের নামে 'সাইদুন্নেসা গার্লস হোম স্কুল ও হোস্টেল' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি

www.pathagar.com

বৃত্তির প্রচলন করেন। ফজলুল হক মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল/কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সহশিক্ষার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করেন।

ফজলুল হক ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমান মাত্রই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চায়। তাই আধুনিক পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক 'হাফিজী' ও 'আলীয়া' উভয় পদ্ধতিই মাদ্রাসা সিলেবাসে রাখা হয়। এছাড়া তিনি মাদ্রাসায় ইংরেজী, বাংলা ও অংক বিষয় প্রবর্তন করেন। তিনি কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসাকে প্রদেশের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা বিবেচনা করে এর সংস্কারের পদক্ষপ নেন। তিনি নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থ বরাদ্দ করেন। বরিশালের শর্ষিনা আলীয়া মাদ্রাসায় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন।

এ.কে. ফজলুল হক মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীকে একটি আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সঞ্চারিত হয়। মুসলমানরা নব-উদ্দীপনা নিয়ে জাগ্রত এবং দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে আসন করে নেয়। এ সময় গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ গড়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষার দ্বার মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। কয়েক বছরের ব্যবধানে মুসলমান কৃষকদের সন্তানেরা চাকরীতে প্রবেশের সুযোগ পেতে থাকে। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের মধ্যে রাতারাতি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার প্রতি শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা মনোযোগী হয়ে ওঠে। এসব কৃষক পরিবারের ছেলেরা সহজেই কৃষি থেকে শিল্পের কাঁচামাল পেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পায়। এ শ্রেণীটি ক্রমান্বয়ে সমাজে তাদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। ফজলুল হকের শিক্ষা সংস্কারের ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী তথা বুদ্ধিজীবি ও পেশাজীবিদের একটি প্রভাবশালী শ্রেণীর উত্থান ঘটে। এ শ্রেনীটি মূলতঃ পাশ্চাত্য স্টাইলের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে এবং পরবর্তীতে দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে ফজলুল হক

১৯০৯ সালে বৃটিশ সরকার লর্ড মিন্টোর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ করে। এ আইন অনুসারে বৃটিশ সরকার ১৯০৯ সালের ১৫

www.pathagar.com

ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইন সভার নতুন কাঠামো ঘোষণা করে। উক্ত কাঠামোতে ১৭ জন সরকারী কর্মকর্তা ও ৩১ জন বেসরকারী সদস্যের বিধান রাখা হয়। কংগ্রেসের চরমপন্থীরা এ বলে আইনটি প্রত্যাখ্যান করে যে, এতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। মধ্যপন্থীরা বঙ্গ বিভাগ রহিত না করা পর্যন্ত নবগঠিত আইন সভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ করা হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তবে রাজধানী সরে গেলেও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশের গুরুত্ব হ্রাস পায়নি।

১৯১৩ সালের ১৮ জানুয়ারী নবগঠিত বঙ্গীয় আইন সভার প্রথম অধিবেশন বসে। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং বৃটেন তাতে জড়িয়ে পড়ে। বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে বাংলাসহ বিভিন্ন স্থানে যে চরমপন্থী সন্ত্রাসী গুপ্ত সংস্থা গড়ে উঠেছিল তারা তখনও সক্রিয় ছিল। ইংরেজ সরকার একদিকে এসব চরমপন্থী গ্রুপগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাপক দমন নীতি চালাতে থাকে। অপরদিকে বঙ্গ বিভাগ রহিত হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে আরো ব্যবধান ঘটে। মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, হিন্দুরা তাদের কল্যাণ চায় না। মুসলমানরা আলাদা রাজনৈতিক প্রবাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মুসলিম লীগের কার্যক্রমকে জোরদার করতে থাকে। এ পর্যায়ে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে উপেক্ষা করার পরিবর্তে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। বিশ্বযুদ্ধে জড়িত বৃটিশ সরকারের উদ্বিগ্নতার প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯১৬ সালে লখ্নৌতে এক যৌথ সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়। ঐ চুক্তিতে দাবী করা হয় যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন সভায় চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত এবং এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত সদস্য থাকতে হবে; প্রদেশগুলোর আইন সভাতে কমপক্ষে ১২৫ টি আসন এবং মোট প্রদেশগুলোর ৫০-৭৫টি আসন থাকতে হবে। আইন-সভার সদস্যবৃন্দ জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত সংখ্যক আসন থাকবে; বাংলার আইন সভায় শতকরা ৪০টি মুসলিম আসন সংরক্ষিত থাকবে যদিও মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল ৫৪%ভাগ। ঐ চুক্তিতে বাংলার কোন মুসলিমনেতা, স্বাক্ষরকারী ছিলেন না। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ ঐ চুক্তিতে উপেক্ষিত হওয়ায় বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের উপর অসন্তুষ্ট হয়। লখ্নৌ প্যাক্ট যদিও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, কিন্তু তাতে মুসলমানদের বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানদের তেমন উপকারে আসে নি। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে বাংলায় মুসলিম লীগের সরকার গঠনে বেগ পেতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ তৎপরতায়

www.pathagar.com

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক

www.pathagar.com

লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনকালে এ.কে ফজলুল হক এবং মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ
১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ

এ.কে ফজলুল হক ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর (১৯৪০ সাল)

www.pathagar.com

ইংরেজ সরকার রাজনৈতিকভাবে ক্রমান্বয়ে চাপের সম্মুখীন হতে থাকে। ১৯১৭ সালে ভারতের ভাইসরয় ও সেক্রেটারী অব স্টেট মন্টেগুর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রণীত এক রিপোর্টে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে এক আইন জারীর মাধ্যমে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে 'দ্বৈত শাসন' চালু করে। এ অবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশের বিষয়গুলোকে 'রক্ষিত' ও 'স্থানান্তরিত'-এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এতে বঙ্গীয় আইনসভায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ নির্ধারণ করা হয়। এতে আইন সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও তা সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। এসময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হলে ১৯১৯ সালের আইন কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে নামমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাগত করম চাঁদ গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মতবাদ নিয়ে আবির্ভূত হন। অহিংসা, অসহযোগ, আইন অমান্য এবং বিলেতি পণ্য বর্জন এগুলো ছিল তাঁর নীতি। চরকা হল স্বাধীনতার প্রতীক। গান্ধীর জীবন ছিল প্রাচীনকালের সন্ন্যাসীদের মত। তিনি দেখতেন রাম রাজত্বের স্বপ্ন। সাধারণ হিন্দুরা তাঁর এ মতবাদে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে গ্রহণ করে অবতার হিসেবে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা একে দেখলো সন্দেহের দৃষ্টিতে। তিনি যদিও খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে মুসলমানদের প্রীতিভাজন হওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হলো না। এসময় জওহরলাল নেহেরু মার্কস-লেনিনের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত চিন্তাধারা নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব সংঘটিত হলে তার ঢেউ কংগ্রেস তথা ভারতের রাজনীতিকেও আন্দোলিত করে। অবশ্য গান্ধী বা নেহেরু কেউই বিপ্লবী ছিলেন না, তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের এরূপ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ.কে.ফজলুল হক মুসলমানদের অগ্রবর্তী নেতা হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

এ.কে. ফজলুল হক প্রধানতঃ বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূর করা এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের প্রত্যয় নিয়ে রাজনীতিতে পদচারণা শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাংলার কৃষকদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে রক্তচোষা মহাজন ও জমিদার শ্রেণী, আর এরা হচ্ছে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট কায়েমী স্বার্থবাদী অশুভ শক্তি। তিনি কৌশল নির্ধারণ করেন যে, 'ঐ সামন্তবাদী শোষণের হাত থেকে এদেশের শতকরা ৮০ জন কৃষক-প্রজাকে মুক্ত করতে পারলেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে এক শোষনমুক্ত সুখী সোনার বাংলা'।

www.pathagar.com

আপাতদৃষ্টিতে বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে পূর্ব বাংলা বিভাগ গঠিত হলেও তার ফলশ্রুতিতে মাত্র পাঁচ বছর সময়কালে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করে। কিন্তু হঠাৎ করে বঙ্গ বিভাগ রহিত হয়ে যাওয়ায় পূর্ব বাংলার মুসলমাদের অগ্রগতির পথ বিঘ্নিত করলেও তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। মধ্যবিত্ত মুসলমান শিক্ষিত তরুণরা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জেগে ওঠে। এদের নেতৃত্ব দেন এ.কে. ফজলুল হক। এ সময় মুসলিম লীগ ও বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কর্মনীতি পরিবর্তন করে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার করতে থাকে। বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটতে থাকে। এরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠছিল বলে প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল। এরা হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকেও ধারণ করার মানসিকতা পোষণ করতে থাকে। অনেকে তাঁদের ছেলেদের মাদ্রাসা বাদ দিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করান। হিন্দু জমিদারদের অধীনে যারা জোতদার, তালুকদার ও মুসলিম জমিদারদের মধ্য থেকেই উত্থিত হয় উচ্চ মধ্যবিত্ত-শ্রেণী। এ শ্রেণীটি হিন্দু জমিদার তথা বর্ণহিন্দুদের সমান অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার প্রত্যাশী ছিল। বঙ্গ বিভাগ রহিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মুসলমানরা অনেকটা ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে এগুতে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলার বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের সংগে জড়িত হয়ে পড়েন। এদের অধিকাংশই মুসলিম লীগের সাথে জড়িত ছিলেন; তবে কেউ কেউ একযোগে প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, খিলাফত কমিটির সাথে যুক্ত ছিলেন।

শোষণের বিরুদ্ধে ফজলুল হক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় এমন একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে তুলেছিল যা ইংরেজ শাসনকে পাকাপোক্ত করার ক্ষেত্রে একটি সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতিতে জমিদারীর প্রধান অংশ যারা হস্তগত করেছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল শহরবাসী হিন্দু ধনী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা। লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন যে ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল তারা বৃটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে সব কিছু করেছে। ১৮৮৬ সালে প্রবর্তিত প্রজাস্বত্ব আইনের ফলশ্রুতিতে সমগ্র বাংলায় কৃষকদের একাংশের জমির উপর স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও ভূমি মালিকানায় অনুষঙ্গ হিসেবে বর্গা প্রথার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। যে সকল কৃষক উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে জমি বন্দোবস্ত নিত তাকে

www.pathagar.com

বর্গা চাষী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অবশ্য যে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের একাংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা হিসেবে দিত, তাদের প্রজার অধিকার দেয়া হয়। ১৯৮০সালে এক বিল পাসের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থায় কিছু সুনির্দিষ্ট সংস্কার সাধিত হয়। এতে উৎপাদিত ফসলের অংশ প্রদানের ভিত্তিতে বর্গা প্রথাকে আইনগত ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অপরদিকে বর্গা চাষীদের একটি বড় অংশকে জমির উপর সত্ত্বাধিকার দেয়া হয়। অর্থাৎ তাদেরকে প্রজা বা রায়ত হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এ বিলের ফলে বিপুল সংখ্যক বর্গাচাষী কার্যত জমির মালিকে পরিণত হয় এবং তা জমিদার শ্রেণীর জন্য বয়ে আনে এক বড় আঘাত। এ বিল পাশ হবার পর থেকে গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষক ও মহাজনের কাছে বিপুল পরিমাণ জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে কোন কোন জেলার শতকরা ৩৬ ভাগেরও বেশী পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত হয় এর ফলে প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় মাঝারী ও দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক প্রজা ভূমিহীন ও বর্গা চাষীতে পরিণত হয়। এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে প্রধানত পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলোতে যেখানে কৃষকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। বৃটিশ-পূর্ব বাংলায় প্রধানত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সীমিত মাত্রায় মহাজনী প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বত্ব না থাকায় তখন কৃষকদের মধ্যে মহাজনী প্রথাটি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। ১৮৮৫ সাল ও ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরী হওয়ার পর জমির উপর চাষীদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা বন্ধক দেয়ার মত একটি জিনিস হাতে পেয়ে যায়। ফলে মহাজনী ব্যবস্থা তথা ঋণদান ব্যবস্থা চালু হওয়ার পথ সুগম হয়ে যায়। উল্লেখ করা দরকার যে, বৃটিশ-পূর্ব ভারতে বা বৃটিশ আমলে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত চাষীদের ঋণদানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। সারা বাংলায় ঋণের প্রধান উৎস ছিল অবাঙ্গালী হিন্দু মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। এছাড়া জমিদার, তালুকদার, জোতদার, উকিল, মোক্তার ও ব্যবসায়ীরাও মহাজনী কারবার করতো। এসকল মহাজন চড়া সুদে কর্জ দিত। সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১৯ টাকা থেকে ৩৭ টাকা পর্যন্ত এবং তা চক্রবৃদ্ধি হারে বর্ধিত হতো। মহাজনরা আগস্ট মাসে অর্থাৎ ফসল বোনার সময় কর্জ দিত এবং জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ফসল তোলার সময় সুদ-আসলসহ আদায় করতো। মাত্র এ কয়েক মাসের জন্য তারা এক বছরের সমান সুদ আদায় করতো। মহাজনরা নগদ টাকার পরিবর্তে ফসলও আদায় করতো। কৃষকরা সবচেয়ে বিপাকে পড়তো তখন যখন কৃষিপণ্যের মূল্য কম থাকত। কৃষকরা কর্জের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে স্বল্প মূল্যের কারণে তাদের প্রায় সমুদয় ফসল দিয়ে দিত। এতে করে সুদের হার দাঁড়াতো প্রায় ১৫০%। ফলে পুনরায় কর্জ করা ছাড়া তাদের

www.pathagar.com

জন্য কোন বিকল্প ছিল না। পরের বছর তারা একই পরিস্থিতির শিকার হত। এমতাবস্থায়, এরূপ প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ কৃষককে সুদ-আসল ও চক্রবৃদ্ধি সুদ পরিশোধ করতে যেয়ে শেষ পর্যন্ত জমির উপর তাদের স্বত্বাধিকার বন্ধক রাখতে বা বিক্রি করতে হত। ১৯৩০-এর দশকে এ প্রক্রিয়া তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯৩০ সালে জমি বিক্রির দলিলের সংখ্যা ছিল ১,২৯,১৮৪ এবং জমি বন্ধকের সংখ্যা ছিল ৫,১০,৯৭৪। ১৯৪২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭,৪৯,৪৯৫ ও ১,০৬,০৮৮। মহাজনী ব্যবস্থার প্রতিফল হিসেবে কৃষক সমাজের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে এবং ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক হিসেবে ১৯৩০ এর দশকে বর্ধমান জেলায় শতকরা ৭২ ভাগ কৃষক ছিল ঋণগ্রস্ত। ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় মহাজনরা নতুন করে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেয়। তখন কৃষকরা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়।এ কারণেই ত্রিশের দশকে ঋণ-বন্ধকের চেয়ে জমি হস্তান্তর তথা জমি বিক্রির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শোষক মহাজনদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু মাড়োয়ারী, জমিদার, তালুকদার। সচ্ছল কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে যারা মহাজনী কারবার করতো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান ছিল বটে, তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সুদের প্রশ্নে মুসলমানদের জন্য প্রচণ্ড বাধা নিষেধ আছে। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সুদ খাওয়া হারাম। হিন্দুদেরধর্মে এ ধরনের কোন বাধা-নিষেধ তো নেই-ই; বরং কিছুসংখ্যক বর্ণহিন্দু ধর্মীয় চেতনাই তাদেরকে সুদের কারবারে উৎসাহিত করে। Bengal Provincial Banking Enquiry Committee -র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলোতে কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে যারা মহাজনী কারবার করে তারা প্রধানত হিন্দু।। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকদের কাছে হিন্দু মহাজনরা এক সর্বগ্রাসী শোষক শ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয়। পূর্ববাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি মুসলমানদের রাজনৈতিক মেরুকরণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

জমিদার মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে ফজলুল হক

পূর্ববাংলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলার কৃষককে জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম ময়মনসিংহ জেলার খোশ মোহাম্মদ সরকার জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার চরে কৃষক প্রজাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁর আমন্ত্রনে

www.pathagar.com

এ কে ফজলুল হক, আবুল কাশেম, খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান চৌধুরী, রাজীবুদ্দীন তরফদার, মাওলানা আকরাম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশাল এ সমাবেশে ফজলুল হক কৃষকদের মুক্তির লক্ষ্যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠনের ঘোষণা দেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুষ্টিয়া,যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে কৃষক প্রজা তথা মেহনতি জনগণ সংগঠিত হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। একই উদ্দেশ্যে হক সাহেব ১৯১৭ সালে কিছু আইনজীবী ও সাংবাদিকের সমন্বয়ে (যারা মূলত গ্রামীণ সমাজ থেকে উত্থিত) কোলকাতা কৃষি সমিতি গঠন করেন। ফজলুল হক তাঁর প্রজা সমিতির মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের খাজনা ও ঋণ পরিস্থিতির উপর এক জরিপ চালান। তাতে দেখা যায় যে, তৎকালীন বাংলার জমিদারগণ ইংরেজদের খাজনা দিত প্রায় ৬ কোটি টাকা এবং প্রজাদের কাছ থেকে সরকারীভাবে আদায় দেখাত ১৮ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা প্রজাদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে আদায় করতো প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। সরকারের ৬ কোটি টাকা পরিশোধ করে জমিদাররা অবশিষ্ট ৫৭ কোটি টাকা প্রজাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করে আদায় করতো। জরিপের আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ঐ সময় মহাজনদের কাছে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু ঋণের বোঝা ছিল ১০০ কোটি টাকা। এ প্রেক্ষাপটে ১৯২১ সালে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার আগৈলঝরাতে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট প্রজা সম্মেলন। এতে সভাপতির ভাষণে হক সাহেব মহাজন ও জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের ঘোষণা দেন। তিনি কৃষক প্রজা সমিতির মাধ্যমে 'ডাল-ভাতের আন্দোলন' শুরু করেন। তিনি শ্লোগান দেন 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'ঘাম যার দাম তার'।

জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বাংলায় যে প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে যাত্রা শুরু করায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু লোকও এতে যোগ দেয়। মুসলমান গ্রামীণ উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকরাই হয়ে ওঠে এ আন্দোলনের প্রধান শক্তি। ১৯২১ সালে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে সভাপতি এবং সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্তকে সম্পাদক করে 'বেঙ্গল প্রজা সমিতি' গঠন করা হয়। এ সময় ভারতীয় কমিউনিস্টদের চিন্তাধারার কিছু প্রভাব প্রজা সমিতির কোন কোন নেতার উপর রেখাপাত করে।

কৃষক-প্রজা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। অনেক জায়গায় জমিদারদের অফিস ও মহাজনদের গদি বিক্ষুব্ধ কৃষক-প্রজাদের আক্রমণের শিকার হয় এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফজলুল হক বাংলার প্রজাদের সমস্যাকে উপলব্ধি

www.pathagar.com

করে তাদের মুক্তির বিষয়টিকে তাঁর রাজনীতির প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং কৃষক প্রজাদের সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ সময় বিভিন্ন জেলার জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি বলেন,

> "আপনারা যাতে জমিদার ও মহাজনদের হুকুম ছাড়া নিজস্ব ঘর-বাড়ি ও দালান করতে পারেন, ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিতে পারেন, যাবতীয় মানবীয় অধিকার ভোগ করতে পারেন, জমি হস্তান্তর করতে পারেন, জমি হস্তান্তরে জমিদারকে কোন সেলামী দিতে না হয় ও যাবতীয় অতিরিক্ত আদায় 'আবোয়াব' না দিতে পারেন, ইনশাল্লাহ, আমি সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করবোই। আমি সর্বনাশা সুদের ব্যবসা অচল করে দেবো। আপনাদের বন্ধকি জমি, ঘর-বাড়ী ও ভিটামাটি সবই উদ্ধার করবো। --------আমি যদি ক্ষমতায় যেতে পারি, তবে আমি আল্লাহর রহমতে মহাজনী শোষণ, জমিদারী জুলুম বন্ধ করবো। প্রজাস্বত্ব আইন করে আপনাদের হারানো জমিতে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবোই। ঋণ সালিশী আমি সংশোধন করে ঋণ সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে কোটি কোটি টাকার ঋণ চিরতরে বন্ধ করে দেবো। জমিদারী জন্মের মতো উৎখাত করবো। কৃষক প্রজাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিক্ষা দেব। আমি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নব যুগের সৃষ্টি করবো।"

ফজলুল হক ঠিকই নবযুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি নির্বাচন উপলক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের দাবীতে জনমত গঠন করেন এবং জমিদার মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক প্রজাকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হন। বাংলার আর কোন রাজনীতিকই ফজলুল হকের মত এতটা বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের দাবীকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেনি। নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হন। তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নেন। বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ফজলুল হককে প্রস্তাব দেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না। এ সময় মুসলিম লীগ নেতারাও তাঁর কাছে আসেন। হক সাহেবের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে মন্ত্রিসভা গঠন ও মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেন। হক সাহেবের প্রস্তাবমত মুসলিম লীগ জমিদারী উচ্ছেদ ও মহাজনী শোষণ রহিত করতে রাজী হলে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মাওলানা আকরাম খাঁ সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলে ফজলুল হককে মুসলিম লীগের সভাপতি করা হয়। তিনি একই সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টিরও নেতৃত্বে বহাল থাকেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তে অনেকের কাছে

www.pathagar.com

প্রশ্নের উদ্রেক করলে হক সাহেব বলেন, "বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাংলার মুসলমানকে আগে বাঁচাতে হবে। বাংলার মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা সমিতি দুটোই বাঁচাতে হবে। আমাকেই দুটোর সভাপতি থাকতে হবে"।

কৃষক প্রজা আন্দোলন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রধানত জমিদারদের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন দানা বাঁধছিল বলে জমিদাররা একে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতে পায়। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনের পূর্বে ফজলুল হক জমিদারী উচ্ছেদের বিষয়টিকে নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করলে আন্দোলনের কর্মী ও সাধারণ কৃষক-প্রজাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত এ আন্দোলনে প্রধানত মুসলমান কৃষক প্রজারা এবং তাদের সাথে নিম্ন বর্ণের হিন্দু কৃষক প্রজারা জড়িত হলে আন্দোলনটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত না থেকে বৃহত্তর বাংগালী সমাজের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

শুধু নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে নয়, ফজলুল হক যেখানে যেভাবে সুযোগ পেয়েছেন কৃষক-প্রজাদের দুরবস্থা লাঘবে, কথা বলতে ছিলেন নিশংকচিত্ত। ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডে যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক তাতে বাংলার কৃষদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল যে প্রদেশকে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলেই কেবলমাত্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। অতীতে বাংলাদেশের কৃষকদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরনের ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন যে, এরূপ আচরণ অব্যাহত রাখা হলে পরিণতি ভালো হবে না। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"....Bengal should be treated much more generously in matter of finace than she has been in the past. Those who are responsible for the adjustment of finaces seem to forget that with the largest population of any province in India, Bengal has been left with the most slender resources to carry on the work of even ordinary administration. It is on use conferring responsibility on the people of Bangla, or granting us provincial autonomy, if you do not give us funds with which to carry on works for political advancement. You take away four crores every year as a tax on jute but you leave to the Goverment of Bangla to take all possible measures for the improvement of jute for looking after the health of the cultivators, to take such other steps as may be necessary to get as much out of jute as may be possible. I submit that arrangment is neither just nor fair...".

www.pathagar.com

ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের ১এপ্রিল মুসলিম লীগের সাথে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। মন্ত্রিসভা গঠনের পর তিনি জমিদার-মহাজনদের নিপীড়ন থেকে বাংলার কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণে ১৫ দফা কর্মসূচীর ঘোষণা দেন ঃ

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত জমিদারী উচ্ছেদের জন্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ;

২. জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকরণের লক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন সংশোধন;

৩. সার্টিফিকেট আইনের নিষ্ঠুরতা হ্রাসকরণের জন্য জনদাবী আদায় আইন (Public Demand Recovery Act) সংশোধন;

৪. নিষ্ঠুর ধরনের ভার থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন;

৫. জনগণের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সমবায় আইন সংশোধন;

৬. দরিদ্র জনগণের উপর করারোপ না করে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন;

৭. প্রশাসনের ব্যয়ভার হ্রাস;

৮. উৎপাদন সীমিত ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করে পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান;

৯. স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে মজা নদী ও খাল পুনঃখনন;

১০. জনস্বাস্থ্য ও পল্লীর পয়ঃ প্রণালীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. দমনমূলক আইন সংশোধন ও রাজবন্দীদের মুক্তি দান;

১২. তামাক ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর থেকে কর হ্রাস করা;

১৩. বেকার সমস্যার সমাধান;

১৪. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন ও একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকরণ; ও

১৫. কোলকাতা পৌরসভা আইন সংশোধন।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর ফজলুল হক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ব্যপারে তার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কোন তড়িঘড়ির আশ্রয় নেন নি। তিনি সুচিন্তিতভাবে সব দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং এ উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের ২ এপ্রিল স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি

www.pathagar.com

কমিশন গঠন করেন যা 'ফ্লাউড কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। কমিশনের প্রধান কার্যপরিধি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোকে বাংলার বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করা। ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথা অবসানের সুপারিশ করে। অবশ্য জমিদারদের প্রতিনিধি কয়েকজন এ সুপারিশের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন।

কমিশনের রিপোর্টে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, জমিদারী উচ্ছেদ ও দখল, খাতক আইন, মহাজনী আইন তথা বাংলার কৃষি অর্থনীতির বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ করে কৃষদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়। রিপোর্টে জমিদারী ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার যে অবনতি ঘটেছে তার তুলনামুলক আলোচনা করা হয়। কমিশন সুপারিশ করে যে ১৮৭৩ সালে যে সকল কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে আজ এতই ত্রুটি দেখা দিয়েছে যে এ প্রথা আর টিকে থাকতে পারে না। কোন আধাআধি পদক্ষেপ দ্বারা ত্রুটিগুলো দূর করা যাবে না। মধ্যস্বত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার সরকারকে দখল করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং কৃষকদের সরকারের অধীনে সরাসরি ভূমির মালিক করতে হবে। কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে যে, এ প্রস্তাব বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবে এবং প্রদেশের সামাজিক কাঠামোতেও তার প্রভাব পড়বে। রিপোর্টে বলা হয় ঃ

"....No half-measure will remedy its defects. Provided that a practiacble scheme can be devised to acquire the interests of all classes of rent receivers on reasonable terms, the policy should be to aim at bringing the actual cultivators into the position of tenants holding directly under Government. We recognise that this proposal involves a fundamental change in the rural economy of Bengal, affecting vitally the whole social and economic structure of the province, that it can only be carried out gradually over a term of years, and that would be a most formidable undertaking which will tax to the full all the recources of government ..."

কমিশন পর্যায়ক্রমে এবং জমিদারীদের ৫% থেকে ১০% ভাগ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সুপারিশ বাস্তবায়নের পরামর্শ দেয়।

ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রিপরিষদ ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদার গোষ্ঠী ফজলুল হকের উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিতে সক্রিয় হয়ে উঠে। তিনি যাতে বঙ্গীয় আইন পরিষদে জমিদারী উচ্ছেদের লক্ষ্যে কোন আইন প্রণয়ন করতে না পারেন সেজন্য জমিদার শ্রেণী (যাতে মুসলিম লীগের

www.pathagar.com

জমিদাররাও অন্তর্ভুক্ত ছিল) ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য সংঘবদ্ধ হয়। ফজলুল হক ১৯৩৯ সালে পরিষদে জমিদারী উচ্ছেদের জন্য একটি বিল উত্থাপণ করেন। কিন্তু বিলটি বিরোধী দল তো বটেই তাঁর মন্ত্রিসভারও সর্ব্বসম্মত সমর্থন পায়নি। কারণ মন্ত্রিসভায় জমিদাররা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। জমিদারগণ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছিল। তাঁরা হক সাহেবকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিলটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থনের অভাবে আইনে পরিণত হতে পারেনি। এমতাবস্থায় হক সাহেবের নিজ দল কৃষক-প্রজা সমিতির এক দল বিদ্রোহী সদস্য কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপণের চেষ্টা করে। এ সময় হক সাহেবের শিক্ষক স্যার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে তারা কংগ্রেসে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা থেকে বিরত থাকে। হক সাহেব 'অনুগত' কৃষক-প্রজা সমিতির ১৭ জন আইনসভা সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। মুসলিম লীগ সদস্যরা জমিদারী উচ্ছেদের ব্যাপারে হক সাহেবের উদ্যোগকে সমর্থন করেন। কিন্তু আইন পাসের জন্য গভর্নর ও গর্ভনর জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। অবশেষে বিলটি আর আইনে পাস করার মত অনুকূল পরিবেশ ফজলুল হক পাননি।

জমিদারী উচ্ছেদের মত বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হক সাহেবের প্রধানমন্ত্রীত্বে সম্ভব না হলেও বাংলার ভূমি সংস্কারে তিনি কিছু আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা কৃষকদের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছিল।

ভূমি সংস্কার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

কৃষক-প্রজাদের উপর জমিদারদের পরিচালিত অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য ফজলুল হক ১৯৩৮ সালের ১৮ আগষ্ট প্রাদেশিক আইন সভার উভয় পরিষদে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন পাশ করাতে সক্ষম হন। এর ফলে ১৯৩৭ সালের ২৭ আগস্ট থেকে খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কিত উক্ত আইনের সকল ধারা ১০ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়। নদী ভাংগনের পর ২০ বছরের মধ্যে চর সৃষ্টি হলে মালিকরা তাদের জমি ফেরৎ পাবেন এবং মাত্র ৪ বছরের জন্য খাজনা দিতে হবে। জমিদারদের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা বাতিল করা হয়। বন্ধকী জমির মেয়াদ ১৫ বছরের বেশী হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধক বাতিল বলে গণ্য হবে। সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% করা হয়। কোন জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে 'আবওয়াব' আদায় করলে আইনত দণ্ডনীয় হবে, কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী আরো কিছু আইন সংশোধন বা বাতিল করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালে চাষী খাতক আইন পাস হয়। উক্ত আইনে বেশ কিছু ত্রুটি থাকায় কৃষকরা এ আইন দ্বারা উপকৃত হয়নি। তখন সারা দেশে মাত্র কয়েক শ' ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করা হয়। ফজলুল হক কৃষকদের সমস্যা দূর করার জন্য ১৯৩৯ সালে খাতক আইনে প্রথম সংশোধনী আনেন। এর ফলে ঋণ সালিশী বোর্ড শক্তিশালী হয় এবং সারা দেশে ১১ হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করা হয়। এর ফলে কৃষকরা ঋণ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায়।

ফজলুল হক ফ্লাউড় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৪০ সালে মহাজনী আইন পাস করান। এ আইনের অধীনে সুদের হার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে আরো ব্যবস্থা রাখা হয় যে, সাধারণ সুদের হার ও বন্ধকী ঋণ করলে সুদের হার শতকরা ৮ টাকা এবং বিনা বন্ধকে ঋণ করলে সুদের হার শতকরা ১০ টাকার বেশী হতে পারবে না। এ আইনে মহাজনদের জন্য ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। ফজলুল হকের এসব বলিষ্ঠ উদ্যোগের ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার মহাজনী শোষণ হতে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সক্ষম হয়। বস্তুতপক্ষে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজাদের কল্যাণে এ সময় যে সব আইনগত সংস্কার সাধন করা হয় তা কৃষকদের বৃহদাংশকে ভয়াবহ ঋণের বোঝা এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মহাজনদের বিভিন্ন প্রকার "অবৈধ আদায়" এর জুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়।

ফজলুল হক কৃষকদের জন্য ক্ষতিকর খাতক ও মহাজনী আইন সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে কৃষকদের জন্য উন্নয়ন ও ঋণ-কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ করে কৃষি শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর সরকার আধুনিক কৃষি বিস্তারের লক্ষ্যে ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনায় তিনটি কৃষি ইনস্টিটিউট এবং ঢাকায় একটি ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ সালে তেজগাঁও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকার কৃষি কলেজ ও ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নবাবরা জমি দান করেন।

হক সাহেব কৃষকদের যাতে মহাজনদের নিকট ঋণের জন্য মুখাপেক্ষী না হতে হয় সেজন্য সরকারী ঋণ দানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে ৫৬,৪৮,৬১৯ টাকা কৃষি ঋণ বন্টন করা হয়। এছাড়া ত্রাণ ও টেস্টরিলিফের ব্যবস্থা করেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা নেন। পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৩৮ সালে পাট অধ্যাদেশ জারী করেন। পশু সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নতজাতের গবাদি পশু আমদানী, পশুপালন বিদ্যালয় ও কলেজ উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। গবাদি পশু চিকিৎসার জন্য পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। হাজা-মজা খাল পুনঃখননের ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যেক জেলা

www.pathagar.com

ও প্রত্যেক ইউনিয়নে আদর্শ কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কৃষি শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ধ্যান-ধারণার প্রচার ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ও পত্রিকা প্রকাশের পদক্ষেপ নেন।

ফজলুল হক কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমবায় ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৪০ সালে সমবায় আইন পাস হয়। ঐ আইনের অধীনে ১৯৪২ সালে সমবায় বিধি প্রণয়ন করা হয়। তাঁর উদ্যোগে প্রণীত আইন ও বিধি আজও আমাদের দেশে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সময় বাংলাদেশে হাজার হাজার সমবায় সমিতি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ঋণ লাভ করে সমিতিগুলো কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা জেলেদের জলমহালে মাছ ধরার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়া হয়। উপজাতীয়দের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পল্লী অঞ্চলে পল্লী মঙ্গল সমিতি, খাদ্য ভান্ডার ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইন সংস্কার

হক সাহেবের নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রিসভা আইন পরিষদে বিভিন্ন বিল উত্থাপন করে এবং তা আইনে পরিণত হয়। জনকল্যাণে প্রণীত ঐ সকল আইনের কার্যকারিতা এখনও বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে। শিল্প-কারখানা আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ১৯৪০ সালে দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ফলে দোকান শ্রমিকরা সপ্তাহে একদিন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা লাভ করে। ১৯৩৯ সালে নারী কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণে মেটারনিটি বেনিফিট এক্ট প্রণয়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে মহিলা চাকরীজীবীরা সন্তান প্রসবের পূর্বে এক মাস ও পরে একমাস বেতন-ভাতাদিসহ ছুটিভোগের অধিকার পায়। শিশু শ্রম বন্ধের জন্য ১৯৩৮ সালে শিশু নিয়োগ আইন পাস করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে ১২ বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আইন প্রণীত হয়। এতে করে আশ্রয়হীনা নারী ও শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। ফজলুল হকের উদ্যোগে অনেক এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অফিস-আদালতে টাউট দমনের জন্য ১৯৩৭ সালে টাউট আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৩৮ সালে দুর্ভিক্ষ বীমা আইন পাস করা হয়। কংগ্রেস সদস্যদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালে কোলকাতা পৌরসভা সংশোধনী আইন পাস করা হয়। এর দ্বারা কোলকাতা করপোরেশনে মুসলমান ও তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য আসন ও চাকরী সংরক্ষিত করা হয়। এ ছাড়া

www.pathagar.com

চাকরী বৈষম্য দূর করার জন্য ফজলুল হক বিধি জারী করেন এবং উক্ত বিধি অনুসারে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ এবং তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ পদ সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য ফজলুল হককে বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ ও তাদের পত্র-পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা শুনতে হয়। তিনি প্রশাসনিক ব্যয় সংশোধনের লক্ষ্যে এবং মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় মন্ত্রীদের বেতন আইন প্রণয়ন করেন।

ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা ১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারে থাকাকালে বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের আইন পাশ হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা

১৯৪১সালে ১২ ডিসেম্বর ফজলুল হক দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভার মেয়াদ ছিল সংক্ষিপ্ত। ফলে এ সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়। ১৯৪২ সালে হক মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য খান বাহাদুর হাশেম আলী খান বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল আইন সভায় পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে পাসকৃত চাষী খাতক আইনের মেয়াদ ৫ বছর পূর্তিতে ১৯৪১ সালের ৮ এপ্রিল শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে উক্ত আইনের আওতায় গঠিত ঋণ সালিশী বোর্ডের মামলাগুলো অনিষ্পত্তিকৃত রয়ে যায়। আইন পরিষদ পুনরায় দু'বছরের জন্য চাষী খাতক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে চাষীদের ঋণ মুক্তির পথ সুগম করে। এ সময় ঋণ সালিশী বোর্ডের কাছে ৩২ লক্ষ মামলা বিচারাধীন ছিল এবং তাতে মহাজনদের মোট দাবীর পরিমান ছিল ৩২ কোটি টাকা। হক মন্ত্রিসভা তা কমিয়ে ১৯ কোটি টাকায় নির্ধারণ করে। চাষী খাতক আইন সংশোধনের ফলে ঋণ সালিশী বোর্ডের কার্যক্রম কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ঋণভারে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ চাষী মহাজনদের নিষ্পেশন থেকে মুক্তি পায়।

১৯৪০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করার সুপারিশ করে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, আড়াই বছর পরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করতে সরকার কিছু সময় প্রার্থনা করে। ফজলুল হক তাই ১৯৮৩ সালের ৭ জানুয়ারী জনগণের বিবেচনার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ সম্পর্কে বিকল্প পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর পরিকল্পনার মূলকথা ছিল : (১) কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিলোপ সাধন; (২) সমস্ত জমি, জল, বন, খনি ইত্যাদি সরকারের অধিকারে চলে আসবে এবং এজন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে; (৩) চাষযোগ্য জমির ব্যাপারে

www.pathagar.com

প্রকৃত চাষী তার উৎপাদিত সমস্ত পণ্যমূল্যের ছয়-এর একাংশ সরকারকে দেবে। সমস্ত ট্যাক্স, শিক্ষাকর, পয়ঃকর ইত্যাদি রহিত করতে হবে; (৪) প্রকৃত চাষী ৫০ বিঘার উর্ধ্বে জমি রাখতে পারবে না; উদ্বৃত্ত জমি ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে; (৫) বাংলার আদায়কৃত শুল্ক রাজস্ব এ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং (৬) পাটের রপ্তানী শুল্ক বাংলা সরকারের প্রাপ্য হবে'।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রবল বিরোধিতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে ফজলুল হককে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা চালাতে হয়েছিল বলে এসময় তাঁর পক্ষে আর্থ-সামাজিক কল্যাণমূলক বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। ওদিকে জাপানী আক্রমণের আশংকায় বৃটিশ সরকার ভারতে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাতে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা চলাচল প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়। পরিবহনের অভাবে খাদ্য চলাচল ব্যাহত হয় এবং ফলশ্রুতিতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় ও মূল্য বৃদ্ধি পায়। সিভিল সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব ছিল বৃটিশ অফিসারদের উপর। তাঁদের অদক্ষতার জন্য খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। হক মন্ত্রিসভাকে অনবহিত রেখে বৃটিশ গভর্নর ও কর্মকর্তারা কিছু ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এতে করে ব্যবসায়ী ও মজুদদাররা লুণ্ঠনের সুযোগ পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ফজলুল হক বিরোধী রাজনীতিক ও জনসাধারণের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন। ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিসভাসহ পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে খাদ্য ঘাটতির এমন অবনতি ঘটে যার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।

শেরে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯০৭ সালে ফজলুল হক সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের ফলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সিভিল সার্ভিসেও মুসলমানরা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু চাকরীতে ফজলুল হক অবিচারের শিকার হন। দক্ষতা ও প্রতিভা সত্ত্বেও ফজলুল হককে বাদ দিয়ে রাজ বাহাদুর যামিনী কুমার মৈত্রকে পদোন্নতি দেয়া হলে তিনি চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় মুসলমান প্রতিযোগীরা উচ্চ শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু প্রতিযোগীদের কাছে কিভাবে পরাস্ত হচ্ছে। কোলকাতার মেয়র থাকা কালে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, হিন্দু স্বার্থান্বেষী চক্রের কোপানলে পড়ে

www.pathagar.com

কিভাবে মুসলমান কর্মচারীদের স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হয়। বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ফজলুল হক নিজেই প্রশাসন চালাতে গিয়ে দেখেছেন যে, আমলারা কিভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে বৃটিশ রাজশক্তিকে সহায়তা করছে। আমলাতন্ত্রের ঔপনিবেশিক মানসিকতা সম্পর্কে শেরে বাংলা যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন।

ফজলুল হক সিভিল সার্ভিসে নব নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তাঁর সাথে চিত্তরঞ্জন দাস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখও সিভিল সার্ভিস সংস্কারের দাবী উত্থাপন করেন। হক সাহেব সার্ভিসে বৈষম্য দূর করে সকল সম্প্রদায়ের সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবীর মুখে বৃটিশরাজ সিভিল সার্ভিসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কোটা নির্ধারন করে দেয়। কিন্তু ফজলুল হক বৈষম্যমূলক কোটার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উস্থাপন করে দাবী করেন যে, বেংগল সিভিল সার্ভিসে মুসলমানদের জন্য ৫৫%, ইউরোপীয় ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য ১৫% এবং অবশিষ্ট ৩০% উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। ফজলুল হক তাঁর দাবীর পক্ষে দু'টো যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, বাংলার কৃষদের বৃহত্তর অংশই সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর। সিভিল সার্ভিসে ঐ শ্রেণীর মধ্য থেকে লোক নিয়োগ করা না হলে তারা সরকারের বিভিন্ন আইন কানুন যে তাদের কল্যাণে প্রণীত হচ্ছে তা উপলদ্ধি করবে না। যেমন-চাষী খাতক আইন ও এরূপ অন্যান্য আইনের প্রতি সংশ্লিষ্ট অফিসাররা যদি সহানুভূতিশীল না হয় তাহলে কৃষক প্রজারা তা থেকে উপকৃত হবে না। কেবল অন্য শ্রেণীর মধ্য থেকেই সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হলে 'স্বেচ্ছাতন্ত্র' (Oligarchy)-র উদ্ভব হতে পারে। দ্বিতীয়ত পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের যদি বর্ধিত হারে চাকরীতে নিয়োগ দেয়া না হয় তাহলে ভাল শিক্ষাও দিতে পারবে না। হক সাহেব 'কোটা পদ্ধতি' চালুর উদ্যোগ নিলে শিক্ষায় অগ্রসর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা বাংলার ইংরেজ গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করে সিভিল সার্ভিসে 'দক্ষতা' বজায় রাখার স্বার্থে 'কোটা পদ্ধতি' বাতিলের দাবী জানায়। ফজলুল হক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যে, দক্ষতার নামে অতীতে বিভিন্ন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাঁর ভাষায় দক্ষ সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞা হল ঃ

"The most efficient man was he who could give his employer (the government) the largest and most satisfactory out-put on the money spent in securing his services."

ফজলুল হক যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দু অফিসারদের তুলনায় মুসলমান ও নিম্নবর্ণের অফিসাররা অধিকতর দক্ষ হতে পারে।

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের সংস্কার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৪৭ পূর্বকালে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে শীর্ষদেশে ছিলেন হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মহাজনরা। স্বল্প সংখ্যক মুসলিম জমিদারও ছিল। মধ্যস্তরে ছিল ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোকেরা এবং জমিদারের কর্মচারীরা। এদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। নিম্নস্তরে কৃষক-প্রজা শ্রেণী যার বৃহদাংশ ছিল মুসলমান এবং অবশিষ্টরা নিম্নবর্ণের হিন্দু। ফজলুল হক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক নিম্নস্তরের কৃষক-প্রজাদের শোষিত হওয়ার বহু দৃশ্য দেখেছেন এবং প্রতিটি ঘটনাই তাঁর জীবন ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলছে। সাধারণ কৃষক প্রজারা শোষণ ও দারিদ্রের কষাঘাতে ছিল জর্জরিত এবং তাদের জন্ম-মৃত্যুর সাথে দারিদ্র ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইনজীবী থাকাকালে ফজলুল হক দেখেছিলেন যে অভিযুক্তদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক-প্রজা শ্রেনী থেকে আগত। তারা মামলা মোকাদ্দমায় আইনগত সহায়তা নিতে পারতো না। পক্ষান্তরে, হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা বাদী হিসেবে Legal Aid Society বিখ্যাত হিন্দু আইনজীবী ও হিন্দু ধণাঢ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে আইনগত সাহায্য পেতো। শেরে বাংলা সমগ্র বাংলার মুসলিম আইনজীবীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রায় সকল জেলায় সফর করে সামাজিক বঞ্চনার শিকার দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের আইনগত সহয়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নিজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকা সফর করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের আইনগত সহায়তা দেন। তিনি বলেন ঃ

"I have witnessed with my own eyes the regeneration of the Musalman of Bengal. In my humable way I have tried for their emancipation."

ফজলুল হক আইন ব্যবসাকে নিছক অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে দেখেননি, বরং তিনি আইনের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে বঞ্চিত মানুষের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যম হিসাবে আইন পেশাকে কাজে লাগান এবং এর মধ্য দিয়েই লাখো মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় নিজের স্থান করে নেন।

শেরে বাংলা ভারতের বিচার ব্যবস্থায় জুরি পদ্ধতি (trial by jury)-র কঠোর সমালোচনা করেন এবং এর সংশোধনী না আনা পর্যন্ত বাংলার সকল জেলায় তা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে আইন সভায় দীর্ঘ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

কে.এম.দাস লেনের বাস ভবনে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের সাথে আলাপরত
পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান

www.pathagar.com

"It is (trial by jury) defective in form; it is deficient in the constitution and it is essentialy wanted in all the safeguard, which are necessary not merely in securing verdicts with consonance with law and justice but also in ensuring these verdicts from been revised by any finally authority......

ফজলুল হক জুরি পদ্ধতির বিরোধিতা করে আইন সভায় যে বক্তব্য রাখেন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই তা সমর্থণ করেন। ফলে সরকার জুরি পদ্ধতি প্রবর্তন বিলম্বিত করে এবং একটি সংশোধনী কমিটি গঠন করে।

শ্রমিক সমস্যা প্রসঙ্গে

ফজলুল হক ছিলেন কৃষক প্রজাদের নেতা। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন শ্রমিকনেতা। হক সাহেব সোহরাওয়ার্দীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। তিনি শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যে সকল কলকারখানার মালিকগণ শ্রমিকদের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে তাদেরকে সরকার উদারভাবে ভর্তুকি প্রদান করবে। হক সাহেবের সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন—শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের লেখাপড়ার ব্যবস্থার জন্য "Better Living Socities" গঠন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং নতুন শ্রম আইন প্রণয়ন। এসব আইনের মধ্যে রয়েছে The Payment of Wages Act; The Employment of Children Act; The Bengal Maternity Benefit Act এবং The Bengal Factories (Amendment) Act। ফজলুল হক সরকার গঠন করেই সমগ্র প্রদেশে শিল্প জরিপের ব্যবস্থা করেন। তিনি পাট, চা ও চামড়া শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেন। বাংলার শিল্প পণ্যের প্রদর্শনীর জন্য কোলকাতায় একটি শিল্প জাদুঘর স্থাপন করেন। তাঁর আমলে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হক সাহেবের ক্ষমতায় থাকাকালে কৃষি ও শিল্পের মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়নের ফলে বাংলার সার্বিক অর্থনীতিতে অগ্রগতি সাধিত হয়।

কৃষি ও শিল্পপণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ফজলুল হকের সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমবারের মত তিনি Superintendent of Markets পদ সৃষ্টি করে সেখানে লোক নিয়োগ করেন। তাঁর অধীনে বহু Field Marketing

www.pathagar.com

Officer নিয়োগ করা হয়। ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য সরকার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল ক্রয় করেন। কৃষকদের সুবিধার্থে কৃষিপণ্য বাজারজাত করণে সমবায় সমিতিগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচী

পল্লী বাংলার পুনর্গঠনের জন্য শেরে বাংলার সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে ফজলুল হক বলেন ঃ

"We have evolved a compreshensive plan of Rural Reconstruction. Our aim is to change face of the countryside, to make our villages healthier and more beautiful, to help themselves, to create in them an urge of better-living and, genrally, to bring about a great psychological uplift among our rural population ."

পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কৌশল হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রম ও গ্রাম সমবায় সমিতিগুলোকে নিয়োজিত করা হয়। কতগুলো নীতিমালার ভিত্তিতে এ কর্মসূচী পরিচালিত হতো। গ্রাম সমিতি গঠন করে তাকে কাজের মৌলিক ইউনিট হিসেবে ধরা হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থার সাথে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম সমিতি কাজ করতো। এছাড়া জমিদার ও অবসারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদেরকেও পুনর্গঠণ কাজে লাগানো হয়। ফজলুল হকের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে 'পল্লী মঙ্গল সমিতি' গঠন করা হয়। একই উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রত্যেককে এক একটি গ্রামে 'পল্লী উন্নয়ন সমিতি' গঠন করে তা পরিচালনায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ফজলুল হক সাহেবের এ কর্মসূচী ব্যাপক সফলতা দেখাতে পারেনি। তবে 'বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী' অনেক সফল হয়েছিল।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব

একে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানদের কল্যাণে মুসলিম লীগে থাকা দরকার, অপরদিকে বাংলার কৃষক-প্রজাদের স্বার্থে কৃষকপ্রজা পার্টিকেও কাজে লাগাতে হবে। তিনি অবশ্য সাংগঠনিক শক্তির চাইতে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি

www.pathagar.com

সফলও হয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানে তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টির অস্তিত্ব কোন কোন সময় হুমকির সম্মুখীন হলেও তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা আমৃত্যু বহাল ছিল।

১৯৪০ সালের কথা। ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা তখন তুংগে। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যত রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ। মুসলিম লীগের এ অধিবেশনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ভারতবর্ষে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করেন যা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবই পরবর্তীতে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিতি লাভ করে। ফজলুল হক উত্থাপিত প্রস্তাবের মূল ভাষ্যের অংশ বিশেষ ছিল নিম্নরূপঃ

"...Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz. that geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majortiy as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute independent states in which constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in these regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them. Ö".

ফজলুল হকের প্রস্তাব লাহোরে অধিবেশনে গৃহীত হওয়ায় বাংলার রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাঁর মন্ত্রিসভার পক্ষে সরকার পরিচালনা গতিশীলতা লাভ করে। বঙ্গীয় আইন সভায় এ সময় বহু আইন পাশ হয়। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শেরে বাংলার জন্য গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ফজলুল হক কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় বাংলার মুসলমানরা প্রস্তাবটির সাথে নিজেদের আত্মিক সংযোগ অনুভব করে এবং তা ভারতের মুসলমানদের কাছে Magna Carta হিসেবে বিবেচিত হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে বিরোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কতগুলো রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে শেরে বাংলার সাথে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মতপার্থক্য দেখা দেয়। বৃটিশ সরকার ১৯৪১ সালে Naional Defence Council গঠন করে এবং তাতে সকল প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফজলুল হকের নামও অন্তর্ভুক্ত করে। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সকল মুসলিম প্রধানমন্ত্রীকে NDC থেকে পদত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেয়। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের জন্য বৃটিশ সরকারের সাথে যখন দেন-দরবার চলছে, সে সময় বৃটিশ সরকারের সহায়তা করার জন্য NDC-তে যোগদান করা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য হক সাহেবকে বলা হয়। ফজলুল হক তাঁর NDC-তে যোগদানের পক্ষে দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গীয় আইন সভায় সরকারের সমর্থনে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং তিনি মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে নন, বরং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদাধিকার বলে NDC-তে যোগদান করেছেন। এ সময় জিন্নাহ মুসলিম নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার মত ব্যক্তিত্ব তখন কমই ছিল। ফজলুল হক জিন্নাহর আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে দুই নেতার মধ্যে মতবিরোধ তীব্রতর হতে থাকে। নীতিগত মতপার্থক্য থেকে সূত্রপাত হয়ে তা অবশেষে দুই নেতার ব্যক্তিত্বের সংঘাতে পরিণত হয়। হক-জিন্নাহ বিরোধ তীব্রতর হলে হক মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা পদত্যাগ করে এবং হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। শেরে বাংলা তাঁর অবস্থানকে সংহত করার জন্য ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর Progressive Coalition Party গঠন করেন এবং তাতে বঙ্গীয় আইন সভার প্রতিনিধিত্বকারী কৃষক-প্রজা পার্টি, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, জাতীয়তাবাদী,ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, শ্রমিক নেতা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত করে এর বৃহত্তর রূপান্তর করেন। ফজলুল হকের এ উদ্যোগ হিতে বিপরীত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও লাহোর প্রস্তাব ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের আন্দোলন তখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাথে-সাথে জিন্নাহর নেতৃত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলন এক বিন্দুতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় জিন্নাহর নেতৃত্ব ও মুসলিম লীগ স্রোতধারার বিপরীতে মুসলিম জনসাধারণের মনে অন্য কোন নীতি ছিল আত্মঘাতী। ফজলুল হক স্রোতের অনুকূলে না থাকায় অচিরেই তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে হক সাহেব বাংগালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানস থেকে সাময়িকভাবে হলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

১৯৪৩ সালে তাঁর পদত্যাগের পর নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। শেরে বাংলা বিরোধী দলের নেতার আসনে বসেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে নাজিমুদ্দিন সরকারের ব্যর্থতার জন্য তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। পাকিস্তান আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠলে ফজলুল হক রাজনীতিতে সরব পদচারণার পরিবর্তে কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকেন। ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁর নিজ দল কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তায় বিরাট ধস্ নামে। বাংলার মুসলমানরা এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীদের পদচারণায় ফজলুল হক কোণঠাসা হয়ে পড়েন। নির্বাচনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জয়লাভ করলেও তাঁর দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাঁর দল থেকে মাত্র ৮ জন নির্বাচিত হন। পরে তারা সকলেই মুসলিম লীগে যোগদান করেন। নির্বাচনে ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৫টি, কংগ্রেস ৮৪টি, ইউরোপীয়রা ২০টি এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্যরা ২০টি আসন পায়। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৪৬ সালের ৭এপ্রিল জিন্নাহর সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও ১১টি প্রাদেশিক আইন সভার পাঁচ শতাধিক সদস্যের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জিন্নাহ প্রস্তাব করেন যে, লাহোর প্রস্তাবে States এর s অক্ষর মুদ্রণজনিত কারণে ভুল হয়েছে। সুতরাং states শব্দটির পরিবর্তে state পড়তে হবে। প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ এপ্রিল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং ৯ এপ্রিল তা পাস হয়। এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। বাংলার মুসলিম সমাজ, দলীয় নেতা ও কর্মীদের চাপে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জিন্নাহ পাঁচ বছর পূর্বে ফজলুল হকের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ফজলুল হক তাঁর দলের এম.এল.এ এবং কর্মীদের নিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে

১৯৪৬ সালের ১৬ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং তা অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলা দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকা সফর করে দাঙ্গা প্রশমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এদিকে ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির বিষয়টি অনিবার্য হয়ে উঠলে বাংলাকে বিভক্ত করা না করার বিষয় এসে যায়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলা বিভক্তির দাবী

www.pathagar.com

করে। কিন্তু মজার বিষয় হলো এরা ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের বিরোধী ছিল। মুসলিম লীগের দাবী ছিল সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফজলুল হক বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে বলেন, বাংলা এক ও অবিভাজ্য, তাকে বিভক্ত করা যায়না। বাংলা বিভক্তি যখন অনিবার্য হয়ে পড়ে ফজলুল হক তখন পূর্ব বাংলার সীমানা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যশোর, বরিশাল ও খুলনাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। হক সাহেব বাউন্ডারী কমিশনের সামনে জোরালো যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করে এসব এলাকাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হয়। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল ও লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পূর্ব পাকিস্তানে খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী এবং স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় শেরে বাংলা রাজনীতিতে ছিলেন কোণঠাসা। তিনি কোলকাতাতেই থাকতেন। ঢাকার প্রাদেশিক হাইকোর্টে আইন ব্যবসা উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন। পরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মুসলিম লীগ নেতারা ফজলুল হককে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং তিনি যাতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হতে না পারেন সেজন্য তারা সচেষ্ট ছিলেন। একইভাবে সোহরাওয়ার্দীও মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন গ্রুপের হাতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার মুসলমানরা মনে করেছিল যে, তারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার বিরাট সুযোগ পাবে। কিন্তু জিন্নাহ-লিয়াকত আলীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীকে বাদ দিয়ে নাজিমউদ্দিন-নূরুল আমীনদের গুরুত্ব দিতে শুরু করলে একাংশের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হতে থাকে। এ ক্ষোভ থেকেই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের নেতারা পূর্ব বাংলার ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শেরে বাংলা নিজেও ঐ প্রতিবাদে শরীক হন। ভাষা আন্দোলন তার উপর এত প্রভাব ফেলে যে তিনি নিয়মভঙ্গ করে আইনসভায় কয়েকদিন বাংলায় বক্তৃতা করেন।

১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বিশেষ ক্ষমতা আইনে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'ইত্তেহাদ' ও অপর কয়েকটি পত্রিকা পূর্ব বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। শেরে বাংলা এরূপ স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। তিনি তখন পাকিস্তানী শাসকদের একের পর এক গণবিরোধী ও পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালে লিখেন ঃ

www.pathagar.com

"দেশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। করাচির দেবতারা মনে করেছেন পূর্ব বাংলার লোকগুলো সবই ছাগ, মেষ এবং তাদের যদৃচ্ছা জবাই করে খাওয়া যায়। তারা আরও মনে করেন যে, পূর্ববাংলা শুধু দুগ্ধবতী গাভীর দেশ এবং বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আর বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিন সুদূর নয় যখন শার্দুল আবার গর্জন করে কাঁপিয়ে তুলবে।"

শেরে বাংলা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে অনেকটা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এসময় তিনি তাঁর আইন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৮সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা হাইকোর্ট বারের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে নির্বাচন দিতে সরকার গড়িমসি করছিলো। ১৯৫২ সালে শেরে বাংলা প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনকে এক চিঠিতে ১৯৫৩ সালের মার্চে নির্বাচন দিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেনঃ

"সরকার যদি নির্বাচনের প্রশ্ন একদিকে ফেলে রাখতে চান তবে নির্বাচনের দাবিতে দেশব্যাপী আমাদেরকে গণআন্দোলন শুরু করতে হবে। কিন্তু এরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্বে আমরা সরকারকে দেশবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ দিতে চাই।"

১৯৫৩ সালে ২২ মার্চ ফজলুল হক তাঁর বাসভবনে সর্বদলীয় আন্দোলন আহ্বান করেন এবং সেখানে ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

প্রাদেশিক নির্বাচন আসন্ন দেখে শেরে বাংলা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি তাঁর কৃষক প্রজা পার্টিকেও সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা চালান। ১৯৫৩ সালে ২৭ জুলাই তিনি তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'কৃষক প্রজা পার্টি' নাম পরিবর্তন করে 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' নামকরণ করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নির্বাচনী জনসভায় যোগদান করেন। এতে প্রচুর জনসমাগম হয়। ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হয়। হামিদুল হক চৌধুরী ও মোহন মিয়া তাঁকে সভাপতি করার চেষ্টা চালান। কিন্তু সভায়

www.pathagar.com

নূরুল আমীনের নাম প্রস্তাব হওয়ায় ফজলুল হক চিরদিনের মত মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগের বিরূদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। একুশ দফা এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে তা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অধিকার আদায়ের এক প্রতীকে পরিণত হয়। একুশ দফা ছিল নিম্নরূপঃ

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে;

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, ভূমিহীনদের মধ্যে উচ্ছেদকৃত জমি বিতরণ করা হবে, উচ্চ হারে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে;

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণকরত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং মুসলিম লীগ আমলে পাট কেলেংকারি তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ব পাকিস্তানকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আমলে লবণ কেলেংকারি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৬. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

৭. পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পে ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা হবে। শ্রমিকদের সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৮. শিল্পী ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করা হবে।

৯. দেশে একযোগে প্রাথমিক অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে শিক্ষাকে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান প্রভেদ দূর করে একই পর্যায়ভুক্ত করে সকল স্কুলকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চ শিক্ষাকে সহজলভ্য করা হবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয় ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে। উচ্চ বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে এবং নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা এক হাজার টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করতে পারবে না।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের রেওয়াজ বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদ্দোশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ব্যবসায়ীদের ১৯৪৭ সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসেব নেয়া হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল, বিনা বিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করা হবে।

১৬. প্রধানমন্ত্রীর বর্ধমান হাউজকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যারা মুসলিম লীগ সরকারের গুলিতে শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮. ২১ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা ও দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে।

১৯. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের হাতে আনা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের মেয়াদ বাড়াবে না। আইন পরিষদের মেয়াদের ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা আমলে পরিষদের সদস্যপদ খালি হ'লে তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হ'লে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

একুশ দফা পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ হিসেবে জনগণের কাছে বিবেচিত হয়।

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে বিজয়ী হয়। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করেন । যুক্তফ্রন্টের এ বিজয় ছিল মুসলিম লীগের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ। এ নির্বাচন দেশ-বিদেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিদেশী পত্রিকায় এ বিজয়কে 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যুক্তফ্রন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে এবং ফজলুল হক প্রাদেশিক সরকারের নেতৃত্ব দেবেন। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর শেরে বাংলা বিজয়ের বেশে পুনরায় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন ঃ

১. মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

২. ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

৩. বাংগালী জাতির ঐতিহ্য হিসেবে পহেলা বৈশাখ সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়।

৪. বর্ধমান হাউজকে বাংলা ভাষার গবেষণা কেন্দ্র বা বাংলা একাডেমী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৫. ১৯৩৮ সালে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হলেও কার্যত কোন জমিদারী উচ্ছেদ হয়নি। ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে নিজ জেলা বরিশালে প্রথম জমিদারী উচ্ছেদ শুরু করেন। তিনি প্রথমে তাঁর নিজের জমিদারীর অবসান ঘটান। এতে তাঁর আজীবনের একটি স্বপ্ন সার্থক হয়।

৬. সকল বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়।

৭. সকল শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকে স্থানীয় লোক নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৮. দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে চাল ও লবণের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। নূরুল আমীনের সময় যে লবণ ১৬ টাকা সের দরে বিক্রি হত, তা চার আনায় নেমে আসে।'

শেরেবাংলা মুখ্যমন্ত্রী হবার পর পায়ের চিকিৎসার জন্য কোলকাতা গমন করেন। সেখানে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। তাঁর কোলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে আরেক দফা অপপ্রচার চালায়। ফজলুল হক কোলকাতায় এক সংবর্ধনা সভায় বলেন,

"কোলকাতা শহরের প্রতি, আপনাদের প্রতি আমার যে ঋণ, তা আমি কোনদিনও পরিশোধ করতে পারব না। আপনাদের সেবা, আপনাদের খেদমতই আমার লক্ষ্য। বাংলা মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙালি জাতির উন্নতিই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, একমাত্র আকাঙক্ষা।"

১৯৫৪ সালে ২৫ মে হক মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়। শপথ গ্রহণের সময় আদমজী জুট মিলে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাংগা বাঁধে। ধারণা করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্ররোচনায় এ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে আদমজী গমন করে দাঙ্গা বন্ধ করেন। ফজলুল হক পাকিস্তানী শাসকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"বাঙ্গালীদের দমন করার এই অশুভ প্রচেষ্টা চললে তোমাদের আসসালামুআলাইকুম দিতে বাধ্য হবো।"

আদমজীর পরে চন্দ্রঘোনায়ও দাঙ্গা বাঁধে। দাঙ্গা দমনের অজুহাতে পূর্ব বাংলার একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী ইবিআর-কে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রন থেকে সরিয়ে প্রাদেশিক সামরিক প্রধান জিওসি-র অধীনে নেয়া হয়।

ঐ বছর কালাহান নামক এক মার্কিন সাংবাদিক নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ফজলুল হকের কোলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতার অপব্যাখ্যা করে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তিনি লেখেন যে, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাই হবে আমার মন্ত্রিসভার প্রধান কাজ'। ফজলুল হক এ রিপোর্টের বক্তব্যকে অস্বীকার করেন। কিন্তু পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ তাঁকে করাচীতে ডেকে পাঠান। সেখানে হক সাহেবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হয়। কালাহানকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে আনা হয়। শেরে বাংলা এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা ২৯ মে ১৯৫৪ তারিখে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন

www.pathagar.com

যে, তারা পাকিস্তানের অনুগত, তারা কেবল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন চান, স্বাধীনতা চান না। বিবৃতিতে ফজলুল হক বলেন,

"..পাকিস্তানের প্রতি আমার কোন অসদিচ্ছা নেই। পাকিস্তানের কোন ক্ষতি আমি চাই না। পাকিস্তানের প্রতি আমার আনুগত্যে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এমন সব উক্তি করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বার্ধক্যতাহেতু আমি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিচ্ছি।"

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ৩১ মে ১৯৫৪ ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষনা করেন এবং বাংলায় গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষনে ফজলুল হককে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'পূর্ব বঙ্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিযুক্ত করেন। পূর্ববঙ্গে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। দরকার হলে আমি পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে সেনাবাহিনী নিয়োগ করবো। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে যদি ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করতে হয়, তা হলেও আমি পিছপা হবো না।' তিনি শেরে বাংলাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করেন এবং যুক্তফ্রন্টের বহু মন্ত্রীকে গ্রেফতার করেন।

২৩ অক্টোবর ১৯৫৪ গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদ ভেংগে দিয়ে মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে গণপরিষদ গঠন করেন। ২০ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালের ৪ জানুয়ারী কেএসপির আবু হোসেন সরকারও কেন্দ্রের মন্ত্রী হন। এ সময় যুক্তফ্রন্টে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের একাংশ শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার চেষ্টা করে। এদিকে গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদের পরিবর্তে একটি শাসনতন্ত্র কনভেশন গঠনের অর্ডিন্যান্স জারী করেন। এটি একটি অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হলেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তা মেনে নেন। ফজলুল হক ও তাঁর দল কনভেনশন ও প্যারিটির বিরোধিতা করেন। পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট কনভেনশনকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং পূর্ব বাংলার সরকার বাতিলের আদেশও রহিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরুজ্জীবিত হয়। এবারে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আওয়ামী লীগ এবারে ১০৪ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী দল গঠন করে। ফজলুল হক ও তাঁর দল সংখ্যাসাম্য নীতির ঘোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা মেনে নেয়। ফলে ফজলুল হকের দাবী দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কোর্টে গণপরিষদের ৮০

www.pathagar.com

জন সদ্যস্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে ৪০ জন নির্বাচিত হন। কেএসপি ও নেজামে ইসলাম থেকে ১৬ জন, আওয়ামী লীগ থেকে ১২জন, মুসলিম লীগের ১জন, স্বতন্ত্র ২জন ও বাকী ৯জন ছিলেন সংখ্যালঘু।

৭ জুন ১৯৫৫ মারীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এতে ৫ দফার একটি চুক্তি চূড়ান্ত হয়ঃ (১) পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট; (২) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন; (৩) দুই অঞ্চলে সংখ্যাসাম্য; (৪) যুক্ত নির্বাচন; (৫) বাংলা-উর্দুরাষ্ট্রভাষা। শেরে বাংলা মারী চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং এর ভিত্তিতে গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনায় অগ্রসর হয়।

১১ আগস্ট ১৯৫৫ ফজলুল হক পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কোয়ালিশন সরকার মন্ত্রিসভায় যোগদানের পর ফজলুল হক সংবিধান প্রনয়নে বিশেষ ভূমিকা নেন। তিনি পার্লামেন্টে সংবিধানের প্রতিটি বিষয়ে বিতর্কে অংশ নেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ২৩ মার্চ ১৯৫৬ থেকে তা কার্যকর হয়। এ সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং এতে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, সংসদীয় সার্বভৌমত্ব, এক ইউনিট, যুক্ত নির্বাচন, বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্র ভাষা, সংখ্যাসাম্য নীতি স্থান পায়। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাংগালী গভর্নর।

নতুন সংবিধানের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করে। পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। আওয়ামী লীগ আবু হোসেন সরকারের পতনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগের তৎপরতায় ফজলুল হক আবু হোসেন সরকারকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

এসময় কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ও কেএসপির মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচনের আশ্বাসে রিপাবলিকান পার্টিকে সমর্থন দেয়। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ইস্কান্দার মির্জা একের পর এক ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকেন। ফলে পূর্ববঙ্গে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় গভর্নর ফজলুল হক আতাউর রহমান খানকে পদত্যাগ করতে বলেন। আতাউর রহমান পদত্যাগে অস্বীকার করলে গভর্নর ৩১ মার্চ ১৯৫৮ তাঁর

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকার আবার মুখ্যমন্ত্রী হন। আওয়ামী লীগ ঐ ঘটনায় গভর্নর ফজলুল হকের উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে দিয়ে কেএসপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফিরোজ খান নুন ৩১ মার্চ রাতেই গভর্নর পদ থেকে ফজলুল হককে অপসারণ করেন এবং ১ এপ্রিল আবু হোসেনের মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার মন্ত্রিসভা গঠন করে। গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর শেরে বাংলা ফজলুল হক আর রাজনীতিতে ফিরে আসেননি। এর পর থেকে তিনি অবসর জীবন যাপন করেন।

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক দু'দফায় অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দেশের কৃষক-শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সরকারের সীমাবদ্ধতার কারনে তিনি সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে পারেননি। প্রথমত বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে শেরে বাংলা মাত্র একটি প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাজেট ছিল সীমিত, ইংরেজ গভর্নর/ভাইসরয়ের অনুমোদন ছাড়া কোন বিল চূড়ান্ত আইনের মর্যাদা পেতো না। মন্ত্রিসভাকে বাদ দিয়ে ইংরেজ আমলারাই বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন; কিন্তু মন্ত্রিসভার কিছু করার ছিলনা। দ্বিতীয়ত কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মত হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো শেরে বাংলাকে কোনদিনই সহযোগিতা করেনি, বরং বিরোধিতার কোন সুযোগই তারা হাতছাড়া করেনি। তৃতীয়ত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে তাঁদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করতো। তাঁরা বাংলায় মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার জন্য ফজলুল হকের মত জনপ্রিয় নেতাকে দলে এনে কাজে লাগাতে চেয়েছেন; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ধারণ করার ক্ষমতা মুসলিম লীগের ছিল না। শেরে বাংলা ছিলেন বাঙ্গালী মুসলিম জনসাধারণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং মনে প্রাণে একজন খাঁটি মুসলিম। এজন্য তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করে তাঁর নেতৃত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ বা মুসলমানদের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কাজ কোনদিন করেননি। কিন্তু মুসলিম লীগ তাঁকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তাঁর নীতি ও পদক্ষেপের আন্তরিকতা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন এবং এমন কি তাঁকে মুসলিম স্বার্থের ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করা হয়েছে। বার বার তার মন্ত্রিসভাকে অস্থিতিশীল করার জন্য মুসলিম লীগ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে সংঘাতের পাশাপাশি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতৃত্ব বিশেষত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে তাঁর ভুল বুঝাবুঝি ও দূরত্ব দেখা দেয়। এসব বিষয়গুলোকে সামাল দিতে ফজলুল হককে ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে তিনি বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতির

www.pathagar.com

কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাতে বাধার সম্মুখীন হন। ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মুসলিম লীগের সহযোগিতা পেতেন তাহলে শেরে বাংলা স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলার জনগণের জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতেন। চতুর্থত ফজলুল হক নিজস্ব ধ্যান ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়ে যে কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করেছিলেন, তাকে সাংগঠনিকভাবে তিনি শক্তিশালী করে তুলতে পারেননি। প্রকৃত পক্ষে ফজলুল হক ক্যারিশমাসম্পন্ন নেতা ছিলেন, কিন্তু ভাল সংগঠক ছিলেন না। ফলে এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে পারেননি। নিজের দল শক্তিশালী ও সুসংহত না হওয়ার কারণে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনে বার বার অন্যান্য দলের সাহায্য সহযোগিতা নিতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মতের লোকদের নিয়ে নিজ লক্ষ্য স্থলে পৌঁছা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চমত ফজলুল হক মন্ত্রিসভা, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্বে একসময় তৎকালীন বাংলার রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার শ্রেণীর। তারা যেমন জমিদারী উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, তেমনি তারা সমাজ ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. এ.কে.জয়নুল আবেদীন, মেমোরেবল স্পীসেস অব শেরে বাংলা, বরিশাল ঃ আল হেলাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৮।

২. আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

৩. কমরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৪. আকবর উদ্দিন, কায়েদ-ই-আযম, ঢাকা ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।

৫. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, নিউ ইয়র্কঃ লংম্যানস গ্রিন এন্ড কোং, ১৯৬০।

৬. কীথ ক্যালার্ড, পাকিস্তান-এ পলিটিক্যাল স্টাডি, লন্ডনঃ জর্জ এলেন এন্ড উনউইন,১৯৫৭।

৭. জি. ডব্লিউ. চৌধুরী, ডেমোক্রাসি ইন পাকিস্তান, ঢাকা ঃ লংম্যান, ১৯৬৩।

৮. ------,কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান, লন্ডন ঃ লংম্যান,১৯৫৯।

www.pathagar.com

৯. -----, ডকুমেন্টস এন্ড স্পীসেস অন পাকিস্তান কনস্টিটিউশন, ঢাকা, ১৯৬৩।

১০. রামগোপাল, ইন্ডিয়ান মুসলিমস-এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি, দিল্লীঃ এশিয়া পাবলিশিং হাউস,১৯৫৯।

১১. বিডি হাবিবুল্লাহ, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক, ঢাকা ঃ বরিশাল,১৯৬২।

১২. এ.কে.ফজলুল হক, মুসলিম সাফারিংস আন্ডার কংগ্রেস রুল, কোলকাতা, ১৯৩৯।

১৩. খন্দকার আবদুল খালেক, এক শতাব্দী, বরিশাল ঃ বুক সাপ্লাই, ১৯৬৯।

১৪. মুহাম্মদ আবদুল খালেক, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, ঢাকাঃ জ্যোতি বরকত প্রকাশনী, ১৯৭৬।

১৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামিক ল' এন্ড কনস্টিটিউশন, করাচী ঃ জামায়াতে ইসলামী, ১৯৫৫।

১৬. জওহর লাল নেহেরু, দি ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৬।

১৭. সাইয়েদ শরফুদ্দীন পীরজাদা, দি পাকিস্তান রেজুলেশন এন্ড দি হিস্টরিক লাহোর সেশন, ১৯৬৮।

১৮. বদরুদ্দীন উমর, পলিটিকস এন্ড সোসাইটি ইন ইস্ট পাকিস্তান, ঢাকা ঃ মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪।

১৯. মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, এ.কে.ফজলুল হক, চট্টগ্রাম ঃ হোমল্যান্ড প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।

২০. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৮।

২১. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ,১৯৯৪।

২২. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা, ঢাকা ঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র,১৯৮৭।

২৩. সিরাজ উদদীন আহমেদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা ঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬।

২৪. সিরাজ উদদীন আহমেদ, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, ঢাকা ঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

"One contingency which we were probably approaching was the mass upheaval in East Pakistan against West Pakistan .... This would have led to bloody riots and murders and would have been based on sheer hatred."

—S.H. Sohrawardi

জন্ম ঃ ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ ইং, কোলকাতা।

পিতা ঃ ব্যারিস্টার জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ।

মাতা ঃ মাতা খুজিস্তা আখতার বানু ওরফে সোহ্‌রাওয়ার্দী বেগম।

শিক্ষা ঃ ১৯০৭ সালে কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন।

- ১৯০৯ সালে কোলকাতা সেন্ট জেভের্য়াস কলেজ থেকে এফ. এ, পাশ।
- ১৯১১ সালে একই কলেজ থেকে বিএসসি অনার্স পাশ।
- ১৯১৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ.পাশ।
- ১৯১৩ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে সমুদ্র পথে লন্ডন গমন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি অনার্স পাশ। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুরিসপ্রুডেন্সে বিসিএল ডিগ্রী লাভ।
- ১৯১৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরেজী ভাষায় এম,এ, ডিগ্রী লাভ।
- ১৯২০ সালে গ্রেস ইন বার থেকে ব্যারিস্টারী পাশ।

বিবাহ ঃ ১৯২০ সালে স্যার আবদুর রহিমের কন্যা বেগম নিয়াজ ফাতিমাকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভের সন্তানঃ (১) শাহাব সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৯২১) ও (২) আখতার জাহান (১৯২২)। ১ম স্ত্রীর মৃত্যু ১৯২২ সালে। ১৯৪০ সালে রুশ অভিনেত্রী ভেরা টিসসেনকো-কে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে একমাত্র সন্তান রাশেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

রাজনৈতিক জীবন ঃ ১৯২০ সালে কোলকাতা শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ।

- ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্য দলে যোগদান।
- ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কোলকাতা উত্তর কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত।
- ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্টের অন্যতম স্বাক্ষরকারী।
- ১৯২৪ সালে কোলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত।
- ১৯২৬ সালে কোলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা দমনে অন্যতম ভূমিকা পালন।

www.pathagar.com

- ১৯২৬ সালে পুনরায় বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।
- ১৯২৭ সালে শিমলা সম্মেলনে জিন্নাহর সাথে যোগদান।
- ১৯২৭ সালে প্রজা ও ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো নিয়ে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন গঠন।
- ১৯২৯ সালে চতুর্থ বারের মত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। প্রজা পার্টিতে যোগদান।
- ১৯৩৩ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লন্ডনে গমন।
- ১৯৩৪ সালে পঞ্চমবারের মত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত।
- ১৯৩৫ সালে স্বতন্ত্র মুসলিম দল গঠন এবং খাজা নাজিম উদ্দিন সভাপতি এবং সোহরাওয়ার্দী সম্পাদক হন।
- ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদান।
- ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী নির্বাচিত।
- ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় বেসামরিক সরবরাহ ও খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের জয়লাভ।
- ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন।
- ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল।
- ১৯৪৯ সালে করাচীতে আগমন।
- ১৯৫০ সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত।
- ১৯৫১ সালে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন ও আহবায়ক নির্বাচিত।
- ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ।
- ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ১৯৫৭ সালে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন।
- ১৯৬২ সালে সামরিক সরকারের হাতে গ্রেফতার।
- ১৯৬২ সালে ৬ মাস পর জেল থেকে মুক্তিলাভ।
- ১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এনডিএফ গঠন।

বিশেষ অবদান : ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে গণভোটে বিশেষ ভূমিকা পালন, বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য প্রচেষ্টা, পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে জয়লাভে বিশেষ অবদান, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, সংখ্যাসাম্য নীতি, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন, ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ডিআইটি), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ইপিআইডব্লিউটিএ, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

মৃত্যু : ১৯৬৩ সালে ৫ ডিসেম্বর।

মাজার : ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজার।

www.pathagar.com

বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁ ও ইসলাম প্রচারে বিখ্যাত সোহরাওয়ার্দী পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে। তৎকালে রাজনৈতিক অঙ্গনে এ পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইংল্যান্ড থেকে আইনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এসে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২০ সালে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি কোলকাতার খিদিরপুর শিল্প ও বন্দর এলাকায় শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ইউরোপের বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এবং ঐতিহ্যবাহী সোহরাওয়ার্দী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শ্রমিকদের মত সাধারণ স্তরের মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে মিশে যান।

তিনি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখন ভারতের বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। জাতীয়তাবাদী হিন্দু-সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের চাপে বৃটিশ সরকার বঙ্গ বিভাগ রদ করে। এসময় একদিকে গোপন স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দানা বাঁধে, অপরদিকে মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ মানসে দিন কাটাচ্ছিল। এসময় শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে দ্রুত সংগঠিত হচ্ছিল।

১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন পাশের মাধ্যমে প্রদেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা হয়। এতে ভারতবাসী ছিল ক্ষুব্ধ। জনগণের বিক্ষোভ দমাতে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্মম গণহত্যা চালানো হয়। ১৯১৯ সালে বৃটিশ ও ফ্রান্স তুরস্ককে বিভক্ত করার উদ্যোগ নিলে ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২০ সালে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী এবং সম্পাদক ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যোগ দেন এবং তাঁদেরকে রাজনৈতিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী কোলকাতা খেলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোলকাতার খিদিরপুর শিল্প এলাকা থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন আইনসভায় ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্যের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৮ বছর। তিনি আইনসভায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এ সময় বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের দমন করার জন্য আইনসভায় বেত্রাঘাত বিল উত্থাপন করে। সোহরাওয়ার্দী এ বিলের কঠোর সমালোচনা করে বলেন "ভারতীয়রা পশু নয়। তাদের সাদা প্রভুদের ন্যায় তারাও মানুষ। বৃটিশদের ন্যায় তাদেরও একই রকম আত্মসম্মান আছে। ক্ষমতায় উম্মাদ হয়ে বৃটিশ সরকার মনোনীত

www.pathagar.com

সদস্যদের দ্বারা বিলটি পাশ করাতে পারে, কিন্তু তা হবে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। আমরা দাস ছিলাম না। আমরা বৃটিদের পশু শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, সভ্যতার যে কোন মাপকাঠিতে আমরা শ্রেষ্ঠ ছিলাম"। সোহরাওয়ার্দীর এরূপ সাহসী উচ্চারণ ভারতীয় তরুণদের প্রবলভাবে উজ্জীবিত করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁর মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে কংগ্রেসে টেনে নেন। এসময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সংস্পর্শে আসেন। দেশবন্ধু ছিলেন কংগ্রেস নেতা। কিন্তু ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের নীতির সাথে ভিন্নমত পোষন করে স্বরাজ্য দল গঠন করেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আকরাম খান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশবন্ধুকে সমর্থন দেন। সোহরাওয়ার্দী স্বরাজ্য দলে যোগ দেন এবং দলের ডেপুটি লীডার নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভার দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বরাজ্য দল থেকে সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হন।

দেশবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি হিন্দু-মুসলিমের ঐক্য প্রয়াসী ছিলেন। এজন্য তাঁকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত বলা হয়। সোহরাওয়ার্দী তাঁরই নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। এ.কে.ফজলুল হক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে বেঙ্গল প্যাক্ট নামে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোহরাওয়ার্দী এ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, পৃথক নির্বাচন এবং মুসলমানদের জন্য অধিক হারে শিক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া হয়। এ চুক্তিতে প্রতি তিন বছর অন্তর কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে মুসলমানদের নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। উগ্র হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস ১৯২৪ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন করে। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধু মেয়র পদে এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচিত হন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ডেপুটি মেয়র। তাঁর এ পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে কোলকাতা কর্পোরেশনের হিন্দু আধিপত্যের কিছুটা হলেও অবসান ঘটে।

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাস মারা যান। তাঁর অবর্তমানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯২৬ সালে উগ্রহিন্দুদের উস্কানির ফলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গা দমনে আত্মনিয়োগ করেন। কোলকাতা শহরে তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২%। পুলিশের মধ্যে হিন্দুদের ছিল প্রাধান্য। দাঙ্গায় শ্রমিক ও বস্তিবাসী মুসলমানরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোহরাওয়ার্দী এদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। দাঙ্গার অপরাধে ৫০ জন মুসলমান ও ১ জন হিন্দুকে অভিযুক্ত করা হয়। মুসলমানদের আইন

www.pathagar.com

সহায়তা দানের জন্য তেমন কেউ ছিল না। সোহ্‌রাওয়ার্দী ব্যারিস্টার ল্যাংফোর্ড জেমসকে নিয়ে আদালতে তাদের পক্ষে লড়াই করেন এবং ফলে ১জন বাদে বাকী সবাই মুক্তি লাভ করে। শাস্তিপ্রাপ্ত একজনের জন্য তিনি হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। সেখানেও ফাঁসির আদেশ বহাল রয়ে যায়। ল্যাংফোর্ড জেমস ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিশেষ অনুরোধে গভর্নর আসামীকে ক্ষমা করে দেন। মুসলমানদের স্বার্থে সোহ্‌রাওয়ার্দী কাজ করায় এক শ্রেণীর হিন্দু তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। সোহ্‌রাওয়ার্দী মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ জানিয়ে ডেপুটি মেয়রের পদ ত্যাগ করেন।

১৯২৭ সালে বাংলার আরও কয়েকটি স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দী ঐসব দাঙ্গা নিরসনে প্রচেষ্টা চালান। ১৯২৬ সালে শিমলায় হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা বন্ধের লক্ষ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ সম্মেলন ব্যর্থ হয়। শিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নীতির কারণে সোহ্‌রাওয়ার্দী উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণা রূপকথা (Myth) ছাড়া আর কিছুই নয়। এক শ্রেণীর হিন্দু চাচ্ছিল ঐক্যের নামে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। সোহ্‌রাওয়ার্দী হিন্দুদের এ মনোবৃত্তির প্রেক্ষিতে নিজ সম্প্রদায় মুসলমানদের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হয়ে পড়ে। উগ্রপন্থী হিন্দুদের কারণে ঐতিহাসিক চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। সোহ্‌রাওয়ার্দী স্বরাজ্য দল ও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯২৩-২৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন যুব সংগঠনের সাথে জড়িত থাকেন। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কোলকাতা-উত্তর মুসলিম আসন থেকে নির্বাচিত হন। এসময় কতগুলো বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেগুলো দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ইংল্যান্ডের মত শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন, যা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তিনি বিভিন্ন কলকারখানা ও জাহাজে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ১৯২৭ সালে তিনি ৩৬ টি ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে জাতীয় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

"----এক সময় আমার প্রতিষ্ঠিত ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন চেম্বার অব লেবারের সদস্য ছিল। আমি এটা কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম; লাল পতাকার বিপরীতে আমি সবুজ পতাকা উড়িয়েছিলাম।"

১৯২৮ সালে জওহরলাল নেহেরুর পিতা মতিলাল নেহেরু এক রিপোর্টে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে যুক্ত নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। মাওলানা আবুল

www.pathagar.com

কালাম আজাদ ও মাওলানা আকরাম খাঁর মত অনেক মুসলমান নেতা মতিলাল নেহেরুর প্রস্তাবকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে কংগ্রেসে যোগদান করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী, শওকত আলী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঐ প্রস্তাবকে অযৌক্তিক বিবেচনা করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, পরিস্থিতি যুক্ত নির্বাচনের অনুকূলে নয়। হিন্দু-মুসলিমের সহমর্মিতা, পারস্পরিক দাবী ও অধিকার স্বীকৃত না হলে যুক্ত নির্বাচন হতে পারে না।

১৯২৯ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী চতুর্থ বারের মত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন এবং লিমলিথগো কমিশনে সাক্ষাত করে স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে পঞ্চম বারের মত সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে খেলাফত কনফারেন্স, তাবলীগ, সিরাত কনফারেন্স, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রভৃতি গঠন করেন। এ বছরই তিনি স্বতন্ত্র মুসলিম লীগ দল গঠন করেন এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি হন খাজা নাজিমুদ্দিন।

শেরে বাংলার যুক্ত মন্ত্রিসভায়

১৯৩৬ সালে ১৭ আগস্ট মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কোলকাতায় আসেন। তিনি বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরামর্শে বাংলায় মুসলিম লীগের ভীত মজবুত করার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর দলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সোহরাওয়ার্দী তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম দল বিলুপ্ত করে দলবলসহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সমগ্র বাংলায় মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করেন। নির্বাচনে তিনি নিজে কোলকাতার দু'টি আসন থেকে জয়লাভ করেন। নির্বাচনের পর ১ এপ্রিল,১৯৩৭ ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী বাণিজ্য, শ্রম ও পল্লী পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। যুক্ত মন্ত্রিসভা বাংলার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ, প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, কৃষকদের ঋণমুক্ত করা, মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্তি, খাজনা হ্রাস ও আওয়াব আদায় নিষিদ্ধকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের ব্যয়হ্রাস, পাটের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ, কোলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইন সংশোধন, রাজবন্দীদের মুক্তি, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি। এসব কর্মসূচী প্রণয়নে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের সুবাদে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যাপক সফরের সুযোগ লাভ করেন এবং জনগণের সাথে মেলামেশার সুযোগ পান যা পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গে তাঁর ক্যারিয়ার গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। তিনি মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে কৃষক-শ্রমিকের কল্যাণে বিভিন্ন আইন প্রণয়ণ ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন গঠন, ১৯৩৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৯ সালে চাষী-খাতক আইনের প্রথম সংশোধনী, কোলকাতা পৌরসভা সংশোধনী আইন এবং ১৯৪০ সালে মহাজনী আইন পাশের ক্ষেত্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেরে বাংলা ফজলুল হককে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। বিশেষ করে শ্রমিকদের কল্যাণে আইন প্রণয়নে তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় দোকান কর্মচারী আইন পাস হওয়ার ফলে দোকান কর্মচারীরা সপ্তাহে একদিন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এছাড়া শিল্প-কারখানা আইন ও মেটারনিটি আইন পাশ করে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এ আইন পরবর্তীতে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী গৃহীত হয়। প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল ১৯৩৮ পাশের জন্য তিনি তৎকালীন বৃটিশ গভর্নরকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেন,

'যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিল আইনে পাশ করা না হয়, তবে নিঃসন্দেহে বিপ্লব, অসন্তোষ ও খাজনা না দেয়ার আন্দোলন শুরু হবে। সাথে সাথে বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা সংঘটিত হবে এবং কোনভাবেই বন্ধ করা যাবে না।'

শহীদ সোহরাওয়ার্দী পল্লী পুনর্গঠন সংক্রান্ত মন্ত্রী থাকাকালে পল্লীবাংলার জনগণের জন্য বিশেষ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৯ সালের ১৬ মার্চ আইন পরিষদে পল্লী পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মসূচী পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবে প্রতি গ্রামে পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠন এবং ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সমিতির কমিটি গঠনের কথা বলা হয়। সিদ্ধান্তে গৃহীত হয় যে, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ পল্লীমঙ্গল সমিতির সাথে তাদের কাজের সমন্বয় করবেন। তিনি পল্লী পুনর্গঠন কর্মসুচী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা ও প্রচার অভিযান জোরদার করার জন্য ২৭টি জেলায় জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ৬০০ থানা কর্মকর্তা নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন এবং সে অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পল্লী পুনর্গঠন কর্মসুচীর মধ্যে ছিল পল্লীর কৃষি, শিল্প, সেচ, রাস্তা প্রভৃতির উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পল্লীর জনস্বাস্থ্য উন্নয়নেও তিনি অবদান রেখেছেন। গ্রামের সুপেয় পানির অভাব দূরীকরণেও তিনি

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেন। এছাড়া ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, শিশুর অন্ধত্ব প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে অন্তর্ভূক্ত করা হলে মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। এ নিয়ে দুই নেতার মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ফলে মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে মুসলিম লীগ সদস্যরা বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হকের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১৯৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৭ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হলে ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা ও তফশিলীদের সাথে প্রগতিশীল দল গঠন করে ১৯৪১ সালের ১২ ডিসেম্বর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র সংগঠন কর্মীরা সমগ্র বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালান। তিনি ছাত্রদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে সক্ষম হন। ফলে ফজলুল হক বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ কর্মীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন।

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। খাদ্য চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা এসব সমস্যা মোকাবিলায় হিমসিম খেতে থাকে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের তরুণ কর্মীরা সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে দেখার প্রত্যাশায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ ফজলুল হক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং গভর্নর শাসনভার হাতে নেন। ২৪ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেয়া হয় বেসামরিক সরবরাহ ও খাদ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব। নাজিমুদ্দিন-সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা যুদ্ধের মধ্যে খাদ্য সংকট দূরীকরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাংলা ১৩৫০ সালে এটি ঘটেছিল বলে তা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলে অধিক পরিচিত।

www.pathagar.com

পঞ্চাশের মন্বন্তর

দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী তথা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করে সোহরাওয়ার্দী রেডিও মারফত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন 'আমরা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে চাল নেই, চাল কেনার জন্য মুসলিম লীগ সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু চাল যদি সংগ্রহ করা যায় তবুও যুদ্ধাবস্থায় সব মহকুমায় চাল পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমরা চেষ্টা করবো গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খুলতে। চাল সবাইকে দেয়া যাবে না। আপনাদের আটা, বজরা, ভুট্টাও খেতে হবে জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য। লোক যাতে বেশী না মরে সেজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। আপনাদের সহযোগিতা চাই। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক পর্যায়ে জাপানীরা বার্মা দখল করে নেয় এবং তারা চট্টগ্রামের কাছে এসে গেলে বাংলার পতনের আশংকা করা হয়। কৌশল হিসেবে শত্রুপক্ষকে বিপাকে ফেলার জন্য বৃটিশ সরকার বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে খাদ্য মওজুদ অন্যত্র সরিয়ে নেয় এবং নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সকল দেশীয় নৌকা ধ্বংস করে দেয়া হয়। বহু স্টীমার ও রেলগাড়ি বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরিণামে খাদ্য সামগ্রীর চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অধিকন্তু মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং মওজুদদারীর ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ ছিল অবধারিত।

এ.কে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই বাংলায় পর পর দু'বছর ফসলের উৎপাদন খারাপ হয়েছিল। তখন সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলে থেকে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সমালোচনা করে বলেছিলেন দেশে দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন। কিন্তু কিছুকাল পরেই খাদ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পেয়ে তিনি ঘোষণা করেন 'দেশে কোন খাদ্যের অভাব নেই এবং বাংলায় চালের দাম কমে আসছে।' প্রকৃতপক্ষে এসময় চালের দাম মণ প্রতি ৪০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের জন্য মানুষ দলে দলে কোলকাতার দিকে ছুটতে থাকে। রেডিওতে সোহরাওয়ার্দী প্রদত্ত ভাষণ থেকেই পরিস্থিতির অবনতি অনুধাবন করা যাচ্ছিল। এ.কে. ফজলুল হক বিরোধী দলের আসনে বসে দুর্ভিক্ষের জন্য বৃটিশ রাজ, খাদ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর দপ্তরের কর্মচারীদের দায়ী করে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত বিপাকে পড়েছিলেন। জাপানীদের দখলে গেলে বার্মা থেকে বাংলাদেশে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ থেকে বাংলাকে চাল বা খাদ্যশস্য পাঠিয়ে সাহায্য করা হয়নি। আজিজুল হকের পর শ্রীনিবাস কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে আন্তঃপ্রদেশ খাদ্য চলাচল বন্ধ করে দেন।

www.pathagar.com

মাড়োয়ারী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য মওজুদ করে তা কালো বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা লুটতে থাকে। সেনাবাহিনী গ্রাম-গঞ্জে চাল ডালের সাথে ডিম, মুরগী, কলা, নারকেল, তরিতরকারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করে মওজুদ করে। ফলে সংকট আরও ঘনীভুত হয়। সোহরাওয়ার্দী দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় আপ্রান চেষ্টা চালান। তিনি গোপন খাদ্য কর্মসুচী প্রণয়ন করেন। তিনি পুলিশের সাহায্যে কোলকাতা ও হাওড়ার ব্যবসায়ী ও মজুদদারদের খাদ্য ও কাপড় দখল করে তা খোলাবাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রথমে কোলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় শহরে রেশনে চাল বিক্রির নির্দেশ দেন। তিনি বাংলায় চাল প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃপ্রদেশের মধ্যে চাল চলাচলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেন এবং পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও আসাম থেকে বাংলায় কিছু চাল পাঠানো হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। আসাম সরকার ঐ প্রদেশ থেকে ক্রয়কৃত চালের পুরোটা পাঠাতে দেয়নি। দুঃখজনক ভূমিকা ছিল বিহার প্রদেশিক সরকারের। বিহার থেকে ক্রয়কৃত চাল প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে গাড়ী থেকে নামিয়ে রাখা হয়। তারা বাংলায় চাল আসতে দিতে বাধা দিচ্ছিল। বস্তুতঃ বিহারে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার বাংলায় দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকারকে সাহায্য সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল না।

সোহরাওয়ার্দীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। বাংলায় না খেয়ে ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়। দুর্ভিক্ষের কারণে সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন কঠোরভাবে সমালোচিত হন। আবুল মনসুর আহমদ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে ব্যর্থতা তুলে ধরে 'ফুড কনফারেন্স' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি নাজিমুদ্দিনকে 'মহিষে বাংলা' এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে 'কুত্তায়ে বাংলা' আখ্যা দিয়ে ব্যঙ্গ করেন। চিত্র শিল্পী জয়নুল আবেদীন দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম লীগ সমর্থিত পত্রিকা 'আজাদ' সহ সকল পত্র-পত্রিকা সোহরাওয়ার্দীকে সমালোচনা করে লিখতে থাকে। তিনি সমগ্র বাংলায় এত সমালোচিত হন যে তাঁর সমগ্র পরিশ্রমই মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং ব্যর্থতার দায়ভার তাঁর উপর বর্তায়। ফজলুল হক দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য রয়েল কমিশন গঠনের দাবী জানান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, যারা মন্ত্রী আছে তারা দলের কোন পদে থাকতে পারবে না। সোহরাওয়ার্দী দলের সাধারণ সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন এবং আবুল হাশিম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে বাংলার সকল জেলা সফর করে থানা পর্যায় পর্যন্ত দলের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করেন এবং ফলশ্রুতিতে বাংলার মুসলিম লীগ কৃষক-প্রজা পার্টির চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালে বাংলায় মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষাধিক। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী তুলসী গোস্বামী পদত্যাগ করলে সোহরাওয়ার্দী অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আইনসভায় বাজেট পেশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কারণে অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি ২০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন। ফজলুল হক এ বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে দুর্ভিক্ষের জন্য খাজা নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করেন। তিনি জনরোষের মাত্রা বোঝাতে যেয়ে বলেন, 'দেশে বিপ্লব ঘটে যেতে পারতো, যদি না এদেশের মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মৃত্যুবরণ করতো।'

জনকল্যাণমূলক কাজ

সোহরাওয়ার্দী খাদ্যমন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী হিসাবে খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় থাকলেও তিনি মুলতঃ প্রধানমন্ত্রীকে পরিচালনা করতেন বলে বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয়। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীত্বের সময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট নির্মিত হয়। তিনি বাংলার তাঁতীদের জন্য সুতা সরবরাহের নিমিত্ত আর.পি সাহাকে এজেন্ট নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যেন ব্যবসার মুনাফা জনকল্যাণে ব্যয় করেন। রনদা প্রসাদ সাহা তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল নির্মাণ করেন। বাংলার গভর্নর জন হাবার্ট ও সোহরাওয়ার্দী টাংগাইলে গিয়ে ঐ হাসপাতাল উদ্বোধন করেন।

খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ হাজার পদ সৃষ্টি করেন। বিচার বিভাগে ৮০০ ল'ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন বিচার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য। তিনি চাকুরীতে মুসলমানদের অধিক হারে নিয়োগের জন্য শেরে বাংলার নীতি অব্যাহত রাখেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের সুযোগ করে দেয়ার জন্য বাংগালী মুসলমানদের অনেককে লাইসেন্স-পারমিট দেন। কিন্তু এরূপ লাইসেন্স-পারমিট পেয়ে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং রাতারাতি বিত্তশালী হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট লেখক কমরুদ্দিন ঐ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ' বাংগালী একবার ক্ষমতায় গেলে টাকা করা ছাড়া তার কোন আদর্শ থাকে না'।

www.pathagar.com

১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের পরে বস্ত্রেরও অভাব দেখা দেয়। মন্ত্রিসভা কাপড়ের অভাব দূর করার জন্য ২০ জন কাপড় ব্যবসায়ী নিয়োগ করেন। ১৯৪৫ সালের ৮ মার্চ আইন সভায় কৃষিখাতে অর্থ মঞ্জুরীর প্রশ্নে ভোটাভুটি হলে মুসলিম লীগের নবাব হাবিবুল্লাহ ২০ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী দলের পক্ষে ভোট দেন। ফলে নাজিমুদ্দিন-সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

নাজিমুদ্দিন-সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্যর্থতার পাশাপাশি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে। নাজিমুদ্দিনের সহোদর খাজা শাহাবুদ্দিনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগতভাবে খাজা নাজিমুদ্দিনকে দুর্নীতিমুক্ত মনে করা হলেও মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্ণীতি-স্বজনপ্রীতির কথা মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে। যখন বাংলায় দুর্ভিক্ষে মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছিল তখন মন্ত্রীরা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বন্টন করছিলেন। তাঁদেরই যোগসাজশে অনেকে অঢেল অবৈধ টাকার মালিক হয়। খাজা শাহাবুদ্দিন গড়ে তোলেন তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শালিমার এন্ড কোং। ইস্পাহানী লাভ করেন খাদ্য শস্য সংগ্রহের একচেটিয়া এজেন্সী। এমনকি মন্ত্রীদের স্ত্রীরা পর্যন্ত সরকারী ঠিকাদার নিযুক্ত হন।

পাকিস্তান সৃষ্টি

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৪৬ সালের মার্চে বাংলাসহ ভারতের সকল প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এটি ছিল সর্বশেষ ও সিদ্ধান্তকারী (decisive) নির্বাচন। নির্বাচনে বাংলার ২৫০ সদস্যের আইন পরিষদে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১২১ টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ১১৪ টি। মুসলিম লীগের বিরাট বিজয়ের পেছনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের বিশেষ ভূমিকা ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং ২৪ এপ্রিল ১৯৪৬ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় ৭ জন মুসলমান ও ১ জন তফসিলী প্রতিনিধি ছিলেন। পরবর্তীতে ৩ জন হিন্দু প্রতিনিধিও মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার শাসনামল ছিল সংক্ষিপ্ত। মাত্র ১৫ মাসের। এ সময় আইন সভায় উল্লেখযোগ্য কোন বিধি-বিধান প্রণীত হয়নি। বাংলায় তখন কৃষক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। বর্গাচাষীরা ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ পাবার এবং জমিতে তাদের দখলী স্বত্বের দাবীতে বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। 'তেভাগা আন্দোলন' নামে বাংলার কৃষকদের মধ্যে

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভা, ১৯৫৬-৫৭। ডান থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পিছনে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা, সাথে মন্ত্রীসভার সদস্য গণ

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর পেছনে দাঁড়ানো সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান

www.pathagar.com

এর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা 'বেঙ্গল বর্গাদার (প্রভিশনাল) কন্ট্রোল বিল' নামে একটি বিল আইনসভায় উত্থাপন করে। কিন্তু আইনসভায় জোতদার-সদস্যদের বিরোধিতার কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির লক্ষ্যে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিষয়টি আইনসভায় উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তাও পরিষদের অনুমোদন লাভ করেনি।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কার, শিল্প প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন প্রভৃতি জনহিতকর কর্মসূচী গ্রহণ করে।

সোহরাওয়ার্দী যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছিল। সেই সাথে ভারতবর্ষ থেকেও তারা বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু বৃটিশদের সাথে রাজনৈতিক দর কষাকষিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুই মেরুতে অবস্থান করছিল। মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্বের দাবী তখন বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে অবস্থান করছিল। এর পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলায় আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ধারণাও কিছুটা সংগঠিত হচ্ছিল। এ সব ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাইতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিই অধিকতর মনোনিবেশ করেন।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের ভোটে বাংলার ৩৩ টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৩২ টি এবং ১ টি পান এ. কে. ফজলুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। সোহরাওয়ার্দীও সদস্য নির্বাচিত হন।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা আন্দামান থেকে প্রত্যাগত বন্দীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নেয়। বন্দীদের মুক্তির জন্য সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের মে মাসে ঢাকা সফর করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় সেটাই ছিল তাঁর প্রথম সফর। তিনি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেন। এমন কি সূর্যসেনের সাথে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদেরও মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের স্থলে জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১০ জুলাই তিনি ঘোষনা দেন যে, কেন্দ্রীয় গণপরিষদে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে এবং তারা কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব পরিবর্তন করতে পারবে। তাঁর ঘোষণায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ৮ আগস্ট নেহেরু মুসলিম লীগকে

www.pathagar.com

বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে সোহরাওয়ার্দী ১০ আগস্ট দিল্লীর এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "কংগ্রেস যদি নিজেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে, তাহলে তিনি বাংলাকে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ দেবেন। এ ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বাংলা থেকে কোন রাজস্ব আদায় করতে দেব না এবং বাংলা সরকারকে কেন্দ্রের সংগে সম্পর্কহীন একটা আলাদা সরকার বলে মনে করবো।" নেহেরুর ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ২৮ জুলাই বোম্বেতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা দেন। ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করা হয়। মুসলিম লীগের শ্লোগান ছিল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হলে হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ আগস্ট রমজান মাসে কোলকাতায় বিশাল সমাবেশে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন। ইতোমধ্যে কোলকাতার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানতঃ উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও ইংরেজদের যোগসাজশে এ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সোহরাওয়ার্দী বৃটিশ গভর্নরকে সেনাবাহিনী মোতায়েনের জন্য চাপ দেন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকাকে উপেক্ষা করে নিজ গাড়ীতে করে দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় টহল দিয়ে বেড়ান। ১৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গায় প্রায় চার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। কোলকাতার দাঙ্গার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতেও হানাহানি দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। সোহরাওয়ার্দী ক্ষতিগ্রস্তদের নানাভাবে সাহায্য করেন। কমপক্ষে ৯০ হাজার লোকের জন্য আশ্রয়, খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি কোলকাতা শহরের ২২ টি থানায় মুসলমান দারোগা নিয়োগ করেন। এছাড়া গুর্খা ও হিন্দু পুলিশ সরিয়ে ১২০০ পাঞ্জাবী পুলিশ কোলকাতার বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করেন। একাজ করতে গিয়ে তিনি হিন্দুদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। আইনসভার ভেতরে তাঁকে দাঙ্গা দমনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হয়। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতারা সোহরাওয়ার্দীকে নির্মমভাবে সমালোচনা করে নাজেহাল করেন। বিরোধী দলের উত্থাপিত অভিযোগের জবাবে সোহরাওয়ার্দী ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ আইনসভায় এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাবের পক্ষে ৮৭ ভোট এবং বিপক্ষে ১৩১ ভোট পড়ে। বিমল কুমার ঘোষের অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ৮৫ এবং বিপক্ষে ১৩০ ভোট পড়ে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক বিরোধী দলে থাকলেও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দেন।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী ও তাঁর মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় আইনসভার বাইরেও সমালোচিত হন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র দাঙ্গার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দায়ী করেছেন তাঁর বিখ্যাত ' বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর সাথে হাত মিলানোর জন্য সমালোচনা করা হয়। পরবর্তীকালে স্যার ফ্রান্সিস টুৎকার তাঁর Memory Serves গ্রন্থে সত্য উদঘাটন করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ 'দাঙ্গার মূলে ছিল হিন্দু মহাসভা; কিন্তু হিন্দু পুলিশ কর্মচারীদের প্রাধান্য ছিল গোয়েন্দা বিভাগের উপর এবং তারাই সরকারের কাছে সবকিছু গোপন রেখেছিল।'

বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা

১৯৪৭ সালের ২১ মার্চ ভারতের ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব নেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি মুসলিম ও কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব মেনে নেন। এ লক্ষ্যে ইংরেজ সরকার পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করার জন্য বিবৃতি দেন। ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনী বাংলা বিভক্তির প্রস্তাব ও দাবী সমর্থন করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মিলিতভাবে বঙ্গ ভংগের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গভংগের প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। তিনি কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবের আলোকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দাবী করেন। বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন " আমি বরাবরই যুক্তবাংলা ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে।....... বঙ্গবিভাগ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম-তফসিলী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য আত্মহত্যারই শামিল হবে।"

মুসলিম লীগ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তব্য সমর্থন করে বাংলা বিভক্তির বিরোধিতা করে। গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ছিলেন। প্রাদেশিক গভর্নর বারোজও সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছিলেন যে, বাংলা বিভক্ত হলে বাংলা এত নিশ্চল ও দরিদ্র হবে যে শেষে এটা পরিণত হবে একটি পল্লীবস্তিতে। কারণ সকল কয়লার খনি, খনিজ দ্রব্য, কলকারখানা, এমনকি দু'টো বাদে সকল পাটকল পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। পূর্ব বাংলার খাদ্য ঘাটতি দাঁড়াবে ২২ লক্ষ টনের বেশী। যদি পূর্ব বাংলাকে সঠিকভাবে খাওয়াতে হয় তাহলে কমপক্ষে ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হবে। পূর্ব

www.pathagar.com

বাংলার একমাত্র ফসল পাট। তারা এখন পাটের পরিবর্তে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে যাবে। কিন্তু তার ফলে কোলকাতার পাটকলগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভাষণদানকালে সোহরাওয়ার্দী সুসংহত, অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। খাজা নাজিমুদ্দিন ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পক্ষে দাবী জানান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা বিভক্তির দাবীর নিন্দা জানান। সোহরাওয়ার্দী দিল্লী থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় ও সত্যরঞ্জন বকশীর সাথে স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। নেতাজী সুভাষ বোসের ভ্রাতা শরৎ চন্দ্র বসু ভারত ও বাংলা বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায় বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। এদিকে অবিভক্ত বাংলা প্রশ্নে মুসলিম লীগের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সোহরাওয়ার্দী চাইলেন স্বাধীন সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা; কিন্তু খাজা নাযিমুদ্দিন ও মাওলানা আকরাম খাঁ অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ বললেন, পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নই ওঠে না।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্যের প্রেক্ষাপটে লর্ড মাউন্টব্যাটেন দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, মুসলিম লীগ যদি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে তাহলে গণপরিষদ ও তার অন্তবর্তীকালীন সরকারের উপর দেশের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহ সাহেবকে ডেকে বললেন, মুসলিম লীগ পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তিকরণ মেনে নেবে, এ শর্তে কংগ্রেস সাময়িকভাবে ভারত বিভাগকে মেনে নিতে রাজী হয়েছে। জিন্নাহ সাহেব ৯ জুন দিল্লীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল আহ্বান করেন এবং সেখানে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পিত পাকিস্তানের রূপরেখা মেনে নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্নাহ বাংলা বিভাগ মেনে নেয়ার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে অনুরোধ করেন। দিল্লী যাত্রার আগে যদিও সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর সমর্থকগণ বাংলা বিভক্তি মেনে নেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তারা নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। ৩ জুন সোহরাওয়ার্দী মিসৌরিতে জিন্নাহর সাথে দেখা করেন। জিন্নাহ তাঁকে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের সাথে অবিভক্ত বাংলা সম্পর্কে আলোচনা চালানোর অনুমতি দেন। এদিকে মাউন্টব্যাটেন দ্রুত ভারত বিভক্তির কাজ শেষ করার কাজে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ফলে সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে যথেষ্ট সময় আর হাতে পাননি।

এদিকে স্বাধীন পাকিস্তান গঠিত হলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা কে হবেন এ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। সোহরাওয়ার্দী এ সময় পূর্ব ও

www.pathagar.com

পশ্চিম বাংলার মধ্যে সম্পদ বন্টন ও সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে কাগজপত্র তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন। লিয়াকত আলী খান ১৯৪৭ সালের ৫ আগষ্ট পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ দলীয় নেতা নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন লিয়াকত আলী খানের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যদের অধিকাংশই নাজিমুদ্দিনের সাথে হাত মিলায়। অবশেষে ভোটাভুটিতে সোহরাওয়ার্দী হেরে যান। তিনি পান মাত্র ৩৯ ভোট। অপরদিকে খাজা নাজিমুদ্দিন পান ৭৫ ভোট। নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্বাচিত হন। সোহরাওয়ার্দীকে পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচন করা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ১৩ আগষ্ট পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৩ আগষ্ট তিনি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দীর উপর কয়েকটি গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে আইন-শৃংখলা রক্ষা, বাংলা বিভক্তির ফলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করা। সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এসব কাজ আঞ্জাম দেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ ভাইসরয়ের স্বাধীনতার ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে তিনি ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করেন এং ঢাকা শহরের চারদিকে ২০ মাইল এলাকার জমি অধিগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা ত্যাগ না করলেও ১৪ আগষ্টের স্বাধীনতার সাথে সাথে যাতে পূর্ববাংলার শাসন ব্যবস্থায় কোন সমস্যা দেখা না দেয় সে জন্য পূর্ব বাংলায় আসতে আগ্রহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন এবং নথিপত্র প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ব বাংলার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ভারত স্বাধীন হলে কোলকাতা থেকে বৃটিশ সৈন্য বিদায় নেয়। কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সোহরাওয়ার্দী যে পাঞ্জাবী মুসলমান পুলিশ নিয়োগ করেছিলেন তারা পাকিস্তানে চলে যায়। এ সময় কোলকাতায় পুনরায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে। এ সময় মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা প্রতিরোধ ও শান্তি স্থাপনের জন্য কোলকাতায় আগমন করেন। মুসলমান নেতাদের প্রায় সকলে, মুসলিম সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি দলে দলে কোলকাতা ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়। মুসলমান নেতাদের মধ্যে একমাত্র শহীদ

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী গান্ধীর সাথে সম্মিলিতভাবে অসহায় মুসলমানদের রক্ষার জন্য কোলকাতায় থেকে যান। কোলকাতায় দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নোয়াখালীতেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

সোহরাওয়ার্দী ১১ আগস্ট করাচী থেকে কোলকাতায় এসেই সংবাদ পান যে, কোলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে উগ্র হিন্দুরা পরিকল্পিতভাবে হত্যাকান্ড চালাচ্ছে। মুসলমানরা আতঙ্কিত হয়ে সোহরাওয়ার্দীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে কোলকাতায় থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি ১৪ আগষ্ট কোলকাতার সোদপুরে যেয়ে গান্ধীর সাথে সাক্ষাতে করেন এবং দাঙ্গা দমনে তাঁর প্রভাব খাটাতে অনুরোধ জানান। গান্ধী ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে সোহরাওয়ার্দীর কথা শোনেন। সোহরাওয়ার্দী গান্ধীকে বলেন, তিনি যদি ন্যায় বিচার ও মানবতায় বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁর কর্তব্য হবে কোলকাতায় থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করা। এ সময় গান্ধী নোয়াখালীর উদ্দেশে ট্রেন যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গান্ধীর শর্তানুযায়ী সোহরাওয়ার্দী তাঁকে নিশ্চয়তা দেন যে নোয়াখলীতে কোন দাঙ্গা হবে না। সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে গান্ধী রাজী হন এবং নোয়াখালী সফর বাতিল করেন। আরো শর্ত দিলেন যে, সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর সাথে কোলকাতার সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বেলঘাটায় থেকে কাজ করতে হবে এবং তিনি এক বছরের মধ্যে পাকিস্তান বা ভারত সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। গান্ধীর শর্ত মত তিনি তাঁর পিতা ও কন্যার সম্মতি নিয়ে তাঁর সাথে বেলঘাটায় হাজির হন। গান্ধী এ সময় বেলঘাটায় মুসলমানদের নোংরা বস্তির মধ্যে এক পরিত্যক্ত মুসলিম ভবন 'হায়দারী ম্যানসন' ভাড়া করে থাকতেন। উগ্র হিন্দুরা কয়েকবার সোহরাওয়ার্দীর উপর আক্রমন করতে উদ্যত হয়। সোহরাওয়র্দী নিজে তা মোকাবেলা করেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে দুর্বৃত্তদের বলেন, "তোমরা যদি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে এখনই হত্যা কর। তবে আমাকে হত্যা করার আগে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে আমার পরে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।" গুন্ডারা তাঁর এরূপ সাহস দেখে পালিয়ে যায়। গান্ধীর উপস্থিতিতেও তাঁর উপর হামলার উদ্যোগ নিলে গান্ধীর চেষ্টায় তা নিরসন হয়। তিনি বলেন, 'তোমরা সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করার পূর্বে আমাকে হত্যা কর।' তিনি দাঙ্গা দমনের জন্য অনশন পর্যন্ত করেন। অবশেষে গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর যৌথ চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে দাঙ্গা বন্ধ হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। সোহরাওয়ার্দী বাংলা ছাড়াও দিল্লী, বেওয়ারী, গুরগাও, জ্বলন্ধর, কাদিয়ান, পানিপথ, কারনাল প্রভৃতি এলাকায় সফর করে সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রতিরোধে অবদান রাখেন।

গান্ধীর সাথে অবস্থানের সময় সোহরাওয়ার্দী সংখ্যালঘু চুক্তি বা মাইনোরিটি চার্টার রচনা করেন। এতে মুহাজের সমস্যা ও তার সমাধান, বাস্তু ত্যাগ বন্ধ ও হিন্দু-

www.pathagar.com

মুসলিমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর রচিত চার্টার ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। তিনি জিন্নাহকে ঐ চার্টার দেখালে তিনি ভারতীয় নেতাদের সম্মতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। গান্ধী ও নেহেরু তা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে জিন্নাহ আর কোন আগ্রহ দেখাননি। ফলে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তবে পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে ঐ চার্টারই নেহেরু- লিয়াকত চুক্তির বুনিয়াদ হয়েছিল।

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দী

পাকিস্তান সৃষ্টির পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী পদসহ ভ্রাম্যমান দূত, জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি, ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু জিন্নাহর অনুরোধের উত্তরে সোহরাওয়ার্দী লিখেন যে, 'আপনার সুদক্ষ পরিচালনায় পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য লোকের অভাব নেই। কারণ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পাকিস্তানে চলে গেছেন। কিন্তু পেছনে ফেলে যাওয়া অসহায় ভারতের মুসলমানদের রক্ষা করার কেউ নেই। আমাকে এদের সেবা করতে দিন।'

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সোহরাওয়ার্দীও এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আবুল মনসুর আহমেদ বলেনঃ "পাকিস্তান সৃষ্টিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদান নিশ্চয়ই অসাধারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় অবদান তার পাকিস্তানী জাতীয়তা।" তিনি বলেনঃ "পাকিস্তান গোটা পাকিস্তান জাতির রাষ্ট্র, কোন সম্প্রদায় বিশেষের রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানে দুই জাতি নেই, একই পাকিস্তানী জাতি বিদ্যমান। ধর্ম, গোষ্ঠী ও ভাষা নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানী মিলিয়েই এক জাতি। এই পাকিস্তানী জাতির সকলের এবং প্রত্যেকের পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর সমান অধিকার। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত হল নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্মেলন। সোহরাওয়ার্দী এতে যোগদান করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, মুসলিম লীগ বিলুপ্ত করে পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী পার্টি গঠন করা হোক। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়নি।

১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। তিনি পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানে মুসলিম লীগের কোন স্থান নেই এবং আপনাদের পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী লীগ প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যার দরজা পাকিস্তানের সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।" তাঁর এ ভাষণ পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। কয়েক দিনের মধ্যেই মুসলিম লীগ দলীয় সভায় সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ করা হয়। সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদে ঐ প্রস্তাব পেশ করে। গণপরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বিগত ৬ মাসের মধ্যে কেউ যদি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা না হয়ে থাকেন তাহলে তার সদস্য পদ থাকবেনা। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ আসন শূণ্য ঘোষণা করা হয়। সোহরাওয়ার্দী এর পর ঢাকায় বাড়ী ক্রয়ের চেষ্টা করেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসা যাওয়া করার উদ্যোগ নিলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে ৬ মাসের জন্য পূর্ব বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় তার অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ভক্তদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন। কোলকাতা থেকে এসে বিভিন্ন জেলায় জনসভাও করেন। মুসলিম ছাত্র লীগ নেতারা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী নইমুদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন করেন। ছাত্র লীগে তখন দুটো গ্রুপের অস্তিত্ব ছিলঃ একটি নাজিমুদ্দিন সমর্থক শাহ আজিজুর রহমান গ্রুপ এবং অপরটি সোহরাওয়ার্দীর আশীর্বাদপুষ্ট শেখ মুজিবর রহমান গ্রুপ। গণপরিষদে তাঁর আসন বাতিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে বিরোধী দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওদিকে তিনি ভারত সরকারের আয়কর বিভাগ তাঁর উপর ৬৭ লক্ষ টাকার কর ধার্য করে এবং তাঁর বাড়ীর আসবাবপত্র ক্রোক করে ও বাড়ী ছিনিয়ে নেয়। উভয় দেশের সরকারের কাছ থেকে নির্দয় আচরণ পেয়ে তিনি বিস্মিত হন। ওদিকে তাঁর পিতা তখন মৃত্যু শয্যায়। ঢাকায় তাঁর সমর্থকরা উপর্যুপরি আবেদন জানাচ্ছিলেন তাঁকে পাকিস্তানে চলে আসার জন্য। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৫৫ বছরের স্মৃতি বিজড়িত কোলকাতা ত্যাগ করে ১৯৪৯ সালের ৫ মার্চ এক রকম শূন্য হাতে করাচীতে হিজরত করেন। তিনি তাঁর বাড়ী-গাড়ী-আসবাব-পত্র সব ফেলে করাচীতে তাঁর বড় ভাই শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বাড়ীতে ওঠেন।

পাকিস্তানে যেয়ে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ ক্ষেত্রেও পাকিস্তান সরকার তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁর দক্ষতার দ্বারা অচিরেই সমগ্র পাকিস্তানে খ্যাতিমান আইনজীবী হিসেবে আবির্ভূত হন।

সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে গড়ে উঠা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষ। মুসলিম লীগের আমলাতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে তিনি বিকল্প রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানী আসামের

www.pathagar.com

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় আসেন। ভাসানী ছিলেন আসামের পূর্বতন মুসলিম লীগের সভাপতি। এপ্রিল মাসে সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় আসেন। তাঁর সাথে মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আলোচনা হয়। একই সঙ্গে পাঞ্জাব মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি মিয়া ইফতেখার উদ্দিন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি মানকী শরীফের পীর সাহেবও ঢাকায় এসে সোহরাওয়ার্দীর সাথে সম্ভাব্য নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হন। তাঁরা ঠিক করলেন, নতুন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সংগঠক চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে মুসলিম লীগকে একটি উদার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু যদি এ প্রস্তাব তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে তারা নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করবেন। এদিকে সোহরাওয়ার্দীর অনেক কর্মী ও মাওলানা ভাসানী তাঁকে ঢাকা এসে বসবাস করতে অনুরোধ করেন, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান শক্ত ছিল না। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ভাবলেন পাকিস্তানের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু করাচী বিধায় ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করতে হলে তাঁর করাচীতে থাকাই শ্রেয়। এছাড়া অর্থের জন্য আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে করাচীই বেশি উপযুক্ত স্থান। সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্য স্টাইলের বিলাসী জীবন যাপণের জন্যও করাচী ছিল ঢাকার চাইতে বেশী আধুনিক। ঢাকা শহরে তখনো আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি।

১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও শামসুল হককে সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দিলে গণঅসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নব গঠিত বিরোধী দল সরকারের সমালোচনায় গণসংযোগ শুরু করলে সরকার দলটির নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জেল-জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুপ্রেরণায় লাহোরে ১৯৫০ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কর্মী সম্মেলন শুরু হয়। এতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে পাকিস্তানের সমস্যাবলী, মুসলিম লীগ সরকারের অদক্ষতা ও ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অবশেষে তাঁর নেতৃত্বে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। তিনি হন দলের সভাপতি এবং সম্পাদক হন সিন্ধুর মাহমুদুল হক ওসমানী। নতুন দল গঠন করে তিনি ১৯ ও ২০ মার্চ লাহোরের মুচিগেটে প্রথম জনসভা করেন। ওই সভায় ৩৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেগুলোই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে পরিণত হয়।

পূর্ব বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর অগণিত ভক্ত ছিল। তারা অচিরেই আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতা কর্মীও নতুন দলে আসে।

www.pathagar.com

দলটি দ্রুত পাকিস্তানের শক্তিশালী বিরোধি দলে পরিণত হতে থাকে। লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দীর তৎপরতায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে 'ভারতের দালাল' বলে আখ্যায়িত করে এক বেতার ভাষণে বলেন, Dogs let loose by India to destroy Pakistan".

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় এবং লবণের দাম আকাশচুম্বী হয়। লবণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে সের প্রতি ১৬ টাকায় ওঠে। কাপড়ের মুল্যও বৃদ্ধি পায়। খাদ্য, লবণ ও বস্ত্র সংকটের কারণে মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ওদিকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চলতে থাকে পুরোদমে। পূর্ব বাংলার দুই জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর কাছে যথাযোগ্য মর্যাদা পাচ্ছিলেন না। যে উৎসাহ-উদ্দীপণা ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দিয়েছিল ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দেয়া প্রতিশ্রুতিতে তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। ঠিক এরূপ সময় ১৯৫২ সালের ৩২ জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা ঘৃতাহুতির কাজ করে। তিনি বলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তাঁর এরূপ অপরিণামদর্শী ঘোষণা পূর্ববাংলায় গণঅসন্তোষ ও বিদ্রোহকে অত্যাসন্ন করে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণের ফলে শাহাদাত বরণ করে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের মত অনেকে। অঙ্কুরিত হয় পূর্ব বাংলা স্বাধিকার আন্দোলন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের প্রতি শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমর্থন দান করেন। ভাষা আন্দোলনের সার্বিক ঘটনায় খাজা নাজিমুদ্দিন ও মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। গভর্নর জেনারেল তাঁকে পদচ্যুত করেন। সোহরাওয়ার্দী এতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এতে ভাষণ দেন। এতে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারন সম্পাদক করে দলের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার বিরোধী নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার সকল জেলা সফর করে আওয়ামী মুসলিম লীগকে সংগঠিত করেন। বহু লোক এ দলে যোগ দিতে থাকে। এদের অনেকেই ছিল সোহরাওয়ার্দীর পুরানো রাজনৈতিক কর্মী। এদিকে শেরে বাংলা ১৯৫৩ সালের ২৭ এপ্রিল তাঁর পুরানো দল কৃষক-প্রজা পার্টি পুনর্গঠন করলে তাঁর পুরানো কর্মীরা আবার দলে ফিরে আসতে থাকে।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শেরে বাংলা-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ফ্রন্ট একুশ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হয়। ১৯৫৪ সালের ৭-১২ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের সভাপতি ছিলেন। প্রার্থী বাছাইয়ের মুল দায়িত্বও তাঁর উপর পড়ে। তিন নেতা সমভিব্যহারে সমগ্র পূর্ব বাংলা সফর করে অভূতপূর্ব গণজোয়ার সৃষ্টি করেন। সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক দক্ষতা, ফজলুল হকের ক্যারিশ্মা সমন্বিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত ২১ দফার প্রতি জনগণ রায় দেয়। ঐতিহাসিক ২১ দফা ছিল নিম্নরূপঃ

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা হবে এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে অন্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনয়ন করা হবে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপণ এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়াতে রূপান্তরিত করে অস্ত্রসজ্জিত করা হবে।

২. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৩. সকল নিবর্তনমূলক ও নিরাপত্তা আটক আইন বাতিল করা হবে এবং বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে এবং রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের উন্মুক্ত আদালতে বিচার করা হবে।

৪. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

৫. বিনা খেসারতে জমিদারী ও জমিতে সকল খাজনাভোগী স্বার্থ বিলোপ করা হবে। উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং খাজনা হ্রাস করে ন্যায্য স্তরে নামিয়ে আনা হবে ও খাজনা আদায়ে সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা হবে।

৬. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারী সাহায্যে কুটির শিল্পের পূর্ণবিকাশ সাধন করা হবে।

৭. পূর্ব বঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে এবং কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাচাঁনো হবে।

www.pathagar.com

৯. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে এবং পাট উৎপাদনের জন্য ন্যায্য মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

১০. পূর্ব বঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্প উভয় আকারে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মুসলিম লীগ আমলে লবণ অব্যবস্থার জন্য দায়ী অপরাধীদের শাস্তি বিধান করা হবে।

১১. অবিলম্বে মোহাজেরদের পুনর্বাসন করা হবে।

১২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে পার্থক্যের অবসান করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা প্রবর্তন করা হবে।

১৪. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কালা কানুন বিলোপ করা হবে। শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে আরো সহজলভ্য করে তোলা হবে এবং ছাত্রদের জন্য স্বল্প খরচে আবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি নির্মূল করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে সকল কর্মচারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অর্জিত সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে; যে সম্পত্তি অর্জনের উপায় সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হবে না সে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৬. প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যয় হ্রাস করতে হবে; উচ্চ ও নিম্ন বেতনভূক সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। মন্ত্রীরা তাদের মাসিক বেতন এক হাজার টাকার বেশী গ্রহণ করবেন না।

১৭. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউজকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য তাঁদের কবরের উপর একটি মিনার নির্মাণ করা হবে এবং শোক-সন্তপ্ত পরিজনকে ক্ষতিপূরণ দান করা হবে।

১৯. ২১ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ও সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হবে।

২০. পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা কোনক্রমে আইন পরিষদের আয়ু বৃদ্ধি করবে না এবং স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করবেন।

www.pathagar.com

২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে ৩ মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূণ্যতা পুরণ করা হবে। পর পর তিনটি উপনির্বাচনে মন্ত্রিসভার মনোনীত প্রার্থীরা পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

নির্বাচনে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি আসনে জয়লাভ করে। মাত্র ৯টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিজয়ীর বেশে করাচী পৌঁছলে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় একদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলে এবং অপরদিকে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগ রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চরম অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সদস্যদের সভায় এ.কে ফজলুল হক পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচিত হন। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে ফ্রন্টের পক্ষে কেন্দ্রে নেতৃত্ব করবেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

অল্প দিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন প্রশ্নে ফজলুল হককে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে মন্ত্রিসভার সদস্য করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। অপরদিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি প্রশ্নে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে সোহরাওয়ার্দীর মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক ছিলেন; পক্ষান্তরে মওলানা ভাসানী ও অন্যান্য বামঘেঁষা নেতারা মার্কিন বিরোধী ছিলেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অত্যধিক পরিশ্রম করে সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে গমন করেন। এদিকে পাকিস্তানে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নাটকীয়রূপ ধারণ করে।

১৯৫৪ সালের ১৫ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ঐ দিনই আদমজীতে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা দেখা দেয়। নিহত হয় বহু লোক। মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হক সাহেবের মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন। ওদিকে মুসলিম লীগ সরকার গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য ২০-২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১০ ধারা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব পাস করেন। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করার প্রতিশোধ হিসেবে ২৩ অক্টোবর গণপরিষদ ভেংগে দেন এবং দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলীকে নির্দেশ দেন মন্ত্রিপরিষদ পুনর্গঠনের। ফলে সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ূব খান, পূর্ব বাংলার গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও অপর ৫ জনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করা হয়। গোলাম মুহাম্মদ মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য সোহরাওয়ার্দীকে অনুরোধ জানান।

www.pathagar.com

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৪ সোহরাওয়ার্দী দেশে ফিরে আসেন। ২৯ ডিসেম্বর তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। দলের অনেকেই তাঁর এ সিদ্ধান্ত পছন্দ করেন নি। সোহরাওয়ার্দী এ প্রসংগে বলেন,

> "জুরিখ যাওয়ার পূর্বে গোলাম মুহাম্মদ এবং বগুড়ার মুহাম্মদ আলী আমাকে দেখতে আসেন। অধিকন্তু আমি যখন জুরিখে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন, তখন আমার কাছে বিশেষ দূত প্রেরণ করা হয় এবং অনুরোধ জানানো হয় যে, আমি সুস্থ হয়ে পাকিস্তানে ফিরে এলে যেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করি। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জন্য তাঁদের জনতার সমর্থন প্রয়োজন এবং আমি যদি মন্ত্রিসভায় যোগ দিই, তা হলে তারা পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় নব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য সম্মত আছেন। আমি ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানে ফিরে আসি। তখন পুরাতন গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়েছে। পুরানো মন্ত্রিসভাও ভেঙে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং গোলাম মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী আমাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়, যাকে তারা পরিষদ বলে, তাতে যোগ দেয়ার জন্য আঁকড়ে ধরে।"
>
> "গোলাম মুহাম্মদ আমাকে ভয় দেখালো যে, যদি আমি মন্ত্রিসভায় যোগদান না করি তবে তিনি ক্ষমতা প্রধান সেনাপতি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আইয়ুব খানের কাছে হস্তান্তর করবেন এবং দেশে সামরিক একনায়কত্ব আসবে। আমি এক পক্ষ কাল অপেক্ষা করলাম। কিছুটা পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র পরিহার করা, কিছুটা গোলাম মুহাম্মদের এ আশ্বাসে যে তিনি গণপরিষদ গঠন করবেন এবং যদি আমি মন্ত্রিসভায় যোগদান করে দায়িত্বভার নিজের হাতে গ্রহণ করি, তা হলে তিনি শাসনতন্ত্র প্রদান করবেন। এ সকল কারণে আমি বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর সাথে আইন মন্ত্রী হিসেবে কাজ করতে সম্মত হই। আমি যখন বাংলার মন্ত্রী ছিলাম, তখন তিনি আমার পার্লামেণ্টারী সচিব ছিলেন এবং যখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন। আমার দল মন্ত্রিসভায় আমার যোগদান পছন্দ করে নি। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে, বিপদের ঝুঁকি বেশি এবং আমি কেবল সামরিক একনায়কতন্ত্রের দোষগুলোই পরিহার করতে চাইনি, আমার শাসনতন্ত্রও উদ্ধার করতে চাই।"

www.pathagar.com

গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের মামলার প্রেক্ষিতে সিন্ধু হাইকোর্ট ৭ নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখে গভর্নর জেনারেলের গণপরিষদ বিলুপ্তি আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে । কিন্তু ফেডারেল কোর্ট ২১ মার্চ ১৯৫৫ সিন্ধু হাই কোর্টের রায়কে নাকচ করে গভর্নর জেনারেলের আদেশকে বৈধ ঘোষণা করে এবং তবে একই সঙ্গে অবিলম্বে একটি সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা গঠনের আদেশ দেয়। তদনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ১৯৫৫ সালে ১৫ এপ্রিল সংবিধান কনভেনশন আদেশ জারী করেন। কিন্তু ১০ মে ফেডারেল কোর্ট কনভেনশনের পরিবর্তে গণপরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়। ২৮ মে ৮০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ গঠনের জন্য গভর্নর জেনারেল আদেশ জারী করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন করে মোট ৮০ জন গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হবার বিধান করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৩১ মে সংখ্যা-সাম্যের ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের ভোটে গণপরিষদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের আগেই মতানৈক্যের কারণে আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। নির্বাচনে শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ১৬টি, আওয়ামী লীগ ১৩টি, মুসলিম লীগ ১টি ও ১জন স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হন। স্বতন্ত্র নির্বাচন বিধায় ৯জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হন। এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ৪টি, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি ২টি এবং তফসিলী ফেডারেশন ৩টি আসন পায়।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে পাঞ্জাবের মারীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ১৪ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ৫ দফা রূপরেখা প্রণীত হয়। দফাগুলো ছিলঃ

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা ;
২. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ;
৩. সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য ;
৪. যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা এবং
৫. বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্র ভাষা।

৫ দফার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ এবং মুসলিম লীগ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী স্বাক্ষর করেন।

সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে প্রণীত ৫ দফা চুক্তি পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। এতে সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা সন্তুষ্টচিত্তে ৫ দফা মেনে নেয়। বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা

www.pathagar.com

করায় রাজী হয়ে যায়। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ভেংগে এক ইউনিট অর্থাৎ একটি করা হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী পৃথক নির্বাচন বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন চালু করার প্রয়োজন ছিল। এ ছড়া সংখ্যা-সাম্য নীতি অর্থাৎ পার্লামেন্ট সদস্য সংখ্যা, চাকুরী, শিল্প, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ৫০:৫০ অনুপাতে দুই প্রদেশে বন্টনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৫৬% ভাগ। তা স্বত্ত্বেও ৫ দফা চুক্তিতে সংখ্যাসাম্য নীতি (Parity Theory) মেনে নেয়ার ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমালোচনার সম্মুখীন হন। এ প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী তাঁর যৌক্তিকতা তুলে ধরে এক বিবৃতি দেন:

"আপনাদের স্মরণ আছে যে, যদিও পূর্বপাকিস্তানের লোকসংখ্যা অধিক, তবু আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করেছিলাম এ আশায় এবং বিশ্বাসে যে, এরূপ নীতি পূর্ব পাকিস্তান যে সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য পেতে চায় তা অর্জনে সহায়ক হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান তাদের মধ্যে বিরাজমান অবিশ্বাস ও সন্দেহ থেকে চিরতরে মুক্ত হবে; ফলে তা সহানুভূতি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব, অভিন্ন লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে যাবে। এভাবে আশা করেছিলাম যে, কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা এবং পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে- দায়িত্বহীন কিছু উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের এ জাতীয় ভিত্তিহীন প্রচারণা বা ধারণা চিরতরে দূর হয়ে যাবে। সংখ্যাসাম্য নীতির তাৎক্ষনিক উদ্দেশ্য একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক সাম্যের নিশ্চয়তা প্রদান করাই নয়, বরং বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এর অর্থ হল অন্যান্য প্রশাসনের এবং ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সমতা অর্জন। মূল ভিত্তি ছিল একে অন্যের অধিকারের উপর কোনো আধিপত্য নয়, কোন অনধিকার হস্তক্ষেপ নয়-উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় ও সদ্ব্যবহার।"

নবগঠিত গণপরিষদের প্রধান দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংবিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুললে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ উথাপন করে। এর জবাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন,

"বিভক্ত হলে উভয় অঞ্চল দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃতি ও ভাষার বিভিন্নতার জন্য উভয় অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ধর্ম শক্তিশালী বন্ধন নয়। তিনি উভয় অঞ্চলকে সমভাবে উন্নত করতে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন

www.pathagar.com

প্রদানের পরামর্শ দেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের করুণ অর্থনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা এবং উন্নয়নের সমাধান করার জন্য অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করার পরামর্শ দেন। অন্যথায় অবহেলা ও নৈরাশ্য এমন ঝড় সৃষ্টি করবে, যা সমগ্র প্রদেশকে ঘিরে ফেলবে। পরিশেষে তিনি বলেন, বাঙালীরা যদি আরো অধিক সমঝোতা দেখাতে পারে এবং পাঞ্জাবীরা যদি যুক্তিবাদী হয়, তাহলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে।"

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি বিষয়, যেমন-ইসলামী প্রজাতন্ত্র, সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, শক্তিশালী কেন্দ্র, রাষ্ট্র প্রধান মুসলমান প্রভৃতি ইস্যুতে আওয়ামী লীগ ভিন্নমত পোষণ করে। সোহরাওয়ার্দী দেশের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামকরণ ও রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান হওয়ার বিধান রাখার বিরোধিতা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদে ভাষণ দানকালে বলেন-

"গতকাল আমি যে আশংকা করেছিলাম তাই ঘটেছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষিত পত্রিকাগুলো বড় বড় শিরোনাম দিয়ে প্রচার করেছে যে, আমি নাকি ইসলামী আইন-কানুন প্রণয়নের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছি। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা একটা কথা বলেনি যে, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। প্রসঙ্গ সম্পর্কে পরে আমি আলোচনা করব।

আমি আগেও বলেছি,পাকিস্তানকে ইসলামী নামে রূপদানই আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না, কিন্তু এখন এ মুহূর্তে একে ইসলামী রাষ্ট্র বলার মানে এই যে, আপনারা পূর্ব থেকেই এখানে যথারীতি ইসলামী সমাজব্যবস্থা তথা ইসলামী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আপনারা এর কিছুই করেন নি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ ধরনের ভাঁওতা বা প্রতারণার নীতি পরিহারের জন্য অনুরোধ করছি। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ইসলামে মোনাফেকির মতো গর্হিত পাপ আর কিছুই নেই। আমাদের পবিত্র মহাগ্রন্থে কঠোর ভাষায় মোনাফেকির নিন্দা করা হয়েছে।

এদেশে যে কোনো কাজে সুবিধা মতো ধর্মের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ কিংবা সুবিধামতো ধর্মের ব্যবহার যেন একটা প্রচলিত রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। আপনারা রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। দেশে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্যও ধর্মের বুলি আওড়াচ্ছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে যুক্ত নির্বাচনেরও আপনারা বিরোধিতা করেছেন। ....ইসলামের সাথে যুক্তনির্বাচনের কি সম্পর্ক রয়েছে? অথচ গুটি কয়েক লোক ইসলামের জিকির তুলে যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করছে। যত্রতত্র পবিত্র

www.pathagar.com

ইসলামকে যে কীভাবে টেনে আনা হচ্ছে, এভাবে যে ইসলামের নীতিগুলোর অপব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখানোর জন্যই আমি কথাটা বললাম। আলেম সমাজেরও অনেকে নিজেদের মতের পরিপোষণ এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ইসলামকে ব্যবহার করেছেন। এব্যাপারে আমি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি। আমি তাঁকে সাবধান করে বলছি ইসলামের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালনের ক্ষমতা যেন তিনি তাদের না দেন। তাঁর জানা উচিত, একদিন রাষ্ট্রের পক্ষে এ অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

ঘুণাক্ষরেও ইসলামের কোনো মহোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা না করে আপনারা সারা দুনিয়ার সামনে ইসলামের অবমাননা করছেন। বিশ্বাসীরা রাষ্ট্রের ইসলামী নাম দেখে ভাববে এখানকার সবকিছুই ইসলামী আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। আমি আপনাদের শুভ বুদ্ধির প্রতি আকুল আহবান জানিয়ে বলছি, আপনারা আপনাদের বিবেক, আপনাদের দেশ ও ধর্মের প্রতি সততার পরিচয় দিন।

নিজেদের প্রয়োজনেই আপনারা ইসলামকে ব্যবহার করছেন। কেননা জনসাধারণের সামনে গিয়ে আপনারা বলতে পারবেন, 'দেখুন, আমরা ইসলামের খাঁটি পায়বন্দ- ইসলামের সত্যিকারের পতাকাবাহী আমরাই।' এতদিন আপনাদের ইসলাম কোথায় ছিল? আজ দেখুন আমরা ইসলামকে কেমন মর্যাদা দিয়েছি। সরকারী দলের যে আজ কি অবস্থা, আমাদের জানা আছে। মুসলিম লীগেরও আজ শেষ অবস্থা। এ অবস্থায় ধর্মের বর্ম পরে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হতে পারলেই আপনারা ভাববেন না, আপনাদের ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ হবে।

খসড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান হবেন কথাটা সংযোজন করেও আপনারা কিছুটা সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন। এতেও আপনাদের সেই একই উদ্দেশ্য কাজ করছে। আমি এ অনুচ্ছেদটিকে একটি অনাবশ্যক অনুচ্ছেদ বলে গতকাল উল্লেখ করেছিলাম। কেননা, শাসনতন্ত্রে এ অনুচ্ছেদটি সংবদ্ধ করার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা অতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের রাষ্ট্র প্রধান হওয়ায় আশংকা রয়েছে। অথচ এটা সন্দেহাতীত যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান সব সময় মুসলমান থাকবেন। এ ব্যাপারে জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা আপনাদের উচিৎ ছিল। কিন্তু এ অনুচ্ছেদটি সংযোগ করে আপনারা একদিকে মুসলমান নাগরিক সাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং অন্যদিকে অমুসলিম নাগরিকদের হতোদ্যম করে দিচ্ছেন একথা বলে যে, 'রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিকার তোমাদের নেই।' একথা বলে আরেক

www.pathagar.com

দিকে আপনারা তাদের প্রতি অপরিসীম গুরুত্বও আরোপ করেছেন। কেননা তারা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন এই চিন্তায় আপনারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।"

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদ খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পেশ করে। আওয়ামী লীগ উত্থাপিত সকল সংশোধনী প্রস্তাব কণ্ঠভোটে বাতিল হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ সদস্যগণ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গণপরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে। তারা সংবিধানের উপর পূর্ব বাংলায় গণভোট অনুষ্ঠানের দাবী জানান। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গণপরিষদের বাইরেও খসড়া সংবিধানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা চালান। তাঁরা পূর্ব বাংলায় সভা সমাবেশ করে ২১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী জানায়। আওয়ামী লীগ খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও তাঁর যুক্তফ্রন্টকে অভিযুক্ত করে। অবশেষে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সদস্যরা সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। শেরে বাংলার প্রস্তাব অনুসারে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের দিনের সাথে মিল রেখে ২৩ মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবস গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ঐদিন থেকেই সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান অনুসারে গণপরিষদ অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

১৯৫৬ সালের ৯ মার্চ নতুন সংবিধানের অধীনে এ কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট কেএসপি-র আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় আবু হোসেন সরকার পরিষদের অধিবেশন আহবানে বিরত ছিলেন। এপ্রিল মাসে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ খাদ্য সংকট নিরসনের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ২০ মে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহবান করা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরোধিতার মুখে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য গভর্নর ফজলুল হক আহবান জানান। আতাউর রহমান খান ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে

১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা বিরোধী দলের নেতা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল মাত্র ১৪ জন। ৭ জন

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

হিন্দু সদস্য তাকে সমর্থন দেন। রিপাবলিকান পার্টির ২০ জন ও কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য সমর্থন দেয়ায় সোহরাওয়ার্দী প্রায় ৫০ জনের সমর্থন পেয়ে যান। মুসলিম লীগ ও শেরে বাংলার কেএসপি বিরোধী দলে আসন নেয়। বিরোধী দলের নেতা হন মুসলিম লীগের আই. আই. চুন্দ্রীগড়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৫জন সদস্য নিয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৩ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে সরকারের ৯টি মুলনীতি ঘোষণা করেন। নীতি গুলো ছিলঃ

১. দেশে সার্বজনীন ভোট ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
২. পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।
৩. অবহেলিত অঞ্চলের প্রতি সুবিচার।
৪. দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা ও নিষ্কলুষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠা।
৫. খাদ্যসংকট মোকাবেলা।
৬. মোহাজের পুনর্বাসন।
৭. পল্লী উন্নয়ন এবং কৃষির পাশাপাশি দেশকে শিল্পায়িত করা।
৮. সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান।
৯. আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান।

প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ সোহরাওয়ার্দীর জন্য ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর দলের ভিত্তি ছিল দুর্বল; জাতীয় পরিষদে দলের সমর্থন ছিল কম। যে রিপাবলিকান পার্টির সাথে তিনি কোয়ালিশন গঠন করেন, সে দলটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সুবিধা ভোগী ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক দল। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চিন্তাধারার সাথে পূর্ণ একাত্ম ছিলেন না বা তা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল এধারণায় সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করল যে কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারলে তারা অধিকতর মনোবল নিয়ে যোগ্যতার সাথে কাজ করে যেতে পারবেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে পাকিস্তানে সংবিধানের আলোকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রধান কাজ হিসাবে সাধারণ

www.pathagar.com

নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। সোহরাওয়ার্দী যত শীঘ্র সম্ভব প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর ১৩ মাস শাসনামলে নির্বাচন হতে পারেনি। তিনি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি সমতার (equality) ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন আমাদের প্রধান কর্মসূচী হবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

সোহরাওয়ার্দী যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সংকট প্রায় দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে পৌছেছিল। তিনি সংকট দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের সাথে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রশাসন ও খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে বৈঠক করে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি ১কোটি ৩৭ লক্ষ মণ চাল আমদানীর নির্দেশ দেন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য কমিটি গঠন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মাফিক লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দেন।

সোহরাওয়ার্দী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য তিনি ভারী শিল্পেরপরিবর্তে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলেন। পাকিস্তানের ৯ বছরের শাসনামলে কোনদিন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়নি। সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এ অধিবেশনে তিনি আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি যুক্ত নির্বাচন প্রথা পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হন। মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী যুক্ত নির্বাচন প্রথার বিরোধিতা করে। রিপাবলিকান পার্টি কেবলমাত্র কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলায় যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করে। শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করার সময় প্রাদেশিক আইন সভার নিকট তাদের আঞ্চলিক নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পরে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় প্রায় ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ভোট পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদ অধিক সংখ্যায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে ভোট দেয়।

সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টিতে সক্ষম হন। এর আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ভারত ও কমিউনিষ্ট প্রতিরোধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা আমেরিকার নীতিরই অনুসৃতি ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঘোষণা করেন তাঁর পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা

www.pathagar.com

হবে ঃ "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরীভাব নয়"। তিনি ১৯৫৬ সালের ২২ অক্টোবর চীন সফরে যান। সমালোচনার ভয়ে এর আগে পাকিস্তানের কোন সরকার প্রধান কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীন সফরে যান নি। সোহরাওয়ার্দীর ঐ সফর চীনকে পাকিস্তানের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। ফলশ্রুতিতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ঐ বছরেরই ২৯ ডিসেম্বর করাচী ও ঢাকা সফর করেন। সোহরাওয়ার্দী জাপান ও বার্মার সাথেও পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নতি ঘটান। তিনি জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের সাথে হোয়াইট হাউসে আলোচনা করেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে কাশ্মীর সমস্যা তুলে ধরেন। সোহরাওয়ার্দী একই সঙ্গে কমুনিষ্ট ব্লক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বললেও তাঁর বিখ্যাত 'জিরো থিউরী'র কারণে তিনি অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল আরব দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই প্রেসিডেন্ট নাসের মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ইসরাইলের সহায়তায় মিশর আক্রমণ করে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের পরোক্ষ সমর্থন দেয়। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাথে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। ফলে সোহরাওয়ার্দী মিশরের উপর আক্রমণের জন্য বলিষ্ট ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হন। তাঁর এ নীতি দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মিশর তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়। কায়রো সফরে যেতে চাইলে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের তাতে সম্মত হননি। জাতিসংঘ সুয়েজ এলাকায় আন্তর্জাতিক বাহিনী প্রেরণ করলে পাকিস্তান সৈন্য পাঠাতে চাইলে মিশর তাতে রাজি হয়নি। সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত নীতি বস্তুতঃ আরব জগতে পাকিস্তানকে বিরাগভাজন রাষ্ট্রে পরিণত করে। তাঁর পররাষ্ট্র নীতির প্রতি তাঁর দল আওয়ামী লীগ এবং বিশেষ করে মাওলানা ভাসানী বিরোধিতা করেন এবং দেশ পরিত্যাগ করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরা তাঁকে সমর্থন করে। পাকিস্তান সিয়াটো (SEATO) ও বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করলে সোহরাওয়ার্দী তাঁর পক্ষে জোরালো ভূমিকা নেন। তিনি আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেনঃ 'সামরিক চুক্তির ফলে একমাত্র অস্ত্রই আসেনি, খাদ্য এসেছে এবং অর্থনৈতিক সাহায্য এসেছে যা পাকিস্তানের জন্য একান্ত প্রয়োজন।' তিনি আরো বলেনঃ 'আমেরিকার অস্ত্র সাহায্য যে কোন আক্রমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। সোহরাওয়ার্দী অতিমাত্রায় মার্কিন ঘেঁষা ছিলেন বলে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তিনি কাশ্মীর প্রশ্নে কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করেন। সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে জাতিসংঘে কাশ্মীর প্রশ্নে বিতর্ক হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে প্রস্তাব পাশ করে। একমাত্র রাশিয়া ভোট দানে বিরত থাকে। এ ছাড়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ৮১টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৭০টি রাষ্ট্র পাকিস্তানের

www.pathagar.com

প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় এবং ভারতকে সমর্থন করে মাত্র ৯টি রাষ্ট্র। কাশ্মীর প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতায় আরোহণ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নেন। তিনি আমদানী নীতি পর্যালোচনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের নতুন আমদানীকারকদের জন্য সুযোগ করে দেন। তিনি করাচীতে অবস্থিত চীফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট অফিস বিলুপ্ত করে দেন এবং রাজধানীর জন্য করাচী, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য লাহোর ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য চট্টগ্রামে তিনটি স্বতন্ত্র কন্ট্রোলার অফিস স্থাপণ করেন। তিনি আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সমানভাবে বন্টন করেন এবং একটি অংশ (১৫%) রাজধানী করাচীর জন্য সংরক্ষিত করেন। তিনি চট্টগ্রামের কন্ট্রোলারকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনা করে লাইসেন্স প্রদানের নির্দেশ দেন।

সোহরাওয়ার্দী চট্টগ্রামে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ দপ্তর (Supply Department) কে উন্নীত করে একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক নিয়োগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ক্ষমতা প্রদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে কেন্দ্রীয় সরকার অভিযোগ করতো যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার আর্থিক বছরের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ আসতে বিলম্ব হতো এবং ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যেত। ফলে বহু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। বৃটিশ আমলে অর্থ বছর ছিল ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ। পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে সোহরাওয়ার্দী অর্থ বছর নির্ধারণ করেন ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন যা আজও অব্যাহত আছে। এরূপ সময়সীমা নির্ধারণ করার ফলে পূর্ব বাংলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় শিল্পোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে জুট মার্কেটিং করপোরেশন, ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ডি আই টি), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ইপি আই ডব্লিউ টিএ এবং চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ন্যাশনাল শিপিং করপোরেশন ও ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটও এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হতো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের জন্য ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার যন্ত্রপাতির সহায়তা লাভ করেন। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমালোচনা বন্ধের

www.pathagar.com

জন্য তার মধ্য থেকে ১(এক) কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করেন। এ ৫ কোটি টাকার বিষয়ে পাকিস্তানে সমালোচনার ঝড় ওঠে। মুসলিম লীগ প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনের ব্যয় মেটানোর জন্য ঐ টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করছে। অনেক পত্র-পত্রিকা একই কথা বলতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে মাওলানা ভাসানীর সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে মাওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী টাংগাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের পটভূমিতে এসম্মেলন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পায়। ৭ ফেব্রুয়ারী মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। ৮৯৬ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট পরিমান সাহায্য পাচ্ছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাকিস্তনের মত ক্ষুদ্র দেশগুলোকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার এবং বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে হবে। ভারতের দখল থেকে কাশ্মীরকে উদ্ধার এবং আত্মরক্ষা ও বিশ্ব শান্তিতে অবদান রাখার জন্য পাকিস্তানকে সামরিক জোটে থাকতে হবে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কাগমারী সম্মেলনের পর পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা ভাসানী নতুন দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের বামপন্থীরা তাঁকে নতুন দল গঠনের জন্য উৎসাহ দিতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীর নীতি ব্যাপকভাবে সমর্থন লাভ করে। সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে পড়ে ৫০০ ভোট এবং ভাসানীর পক্ষে মাত্র ৩৫ ভোট। মাওলানা ভাসানী ২৯ জন এম এল এ এবং ওয়ার্কিং কমিটির ৯জন সদস্য নিয়ে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। তিনি পরবর্তীতে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করেন।

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ সফরকালে তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার ও পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেসের সাথে আলোচনা করেন। পরে এক যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী একমত হয়েছেন যে, স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তার পথে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম এক বিরাট হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে। তাঁরা কম্যুনিষ্ট হুমকির বিরোধিতার প্রত্যয় পুনরায় ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বামপন্থী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং ডানপন্থী মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী তাঁর পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করে। পাকিস্তানের অধিকাংশ পত্রিকা সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করে। একমাত্র দৈনিক ইত্তেফাক সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে ভূমিকা নেয়।

আওয়ামী লীগ বিভক্ত হওয়ায় প্রদেশ ও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ন্যাপের ২৯ জন সদস্য আওয়ামী লীগ সরকারের উপর তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে সরকারের পতনের আশংকা দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও কে এস পি-র মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের চাপে আইন পরিষদের সদস্যগণ এক ইউনিট বাতিল করে চারটি প্রদেশ পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এতে খুশী হন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'এক ইউনিট ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া।' তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর করে জনসভা করেন এবং এতে তিনি এক ইউনিট বিরোধিতাকারীদের পাকিস্তানের দুশমন বলে আখ্যায়িত করেন। এসব জনসভার আয়োজন করেছিল রিপাবলিকান পার্টি অর্থাৎ কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কোয়ালিশন পার্টনার। রিপাবলিকান পার্টি এক ইউনিটের বিরোধী ছিল। রিপাবলিকান নেতারা সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের কথা প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে জানায়। এমতাবস্থায় সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. মোহাম্মদ এইচ. আর তালুকদার, মেমোয়ারস অব হুসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭।

২. রাগিব আহসান, জীবন নয় ইতিহাস, ঢাকাঃ দৈনিক ইত্তেফাক (সম্পাদকঃ তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া), মার্চ,১৯৬৪।

৩. নুরুদ্দীন আহমদ, আমাদের ইতিহাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

৪. আবুল ফজল, সোহরাওয়ার্দী প্রসঙ্গে, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

৫. ক. আহমাদ, বাংলার জাতীয় জাগরণ ও সোহরাওয়ার্দী, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৬. ------, সোসিও পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এন্ড দি বার্থ অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৭৫।

৭. শেখ মুজিবুর রহমান, নেতাকে যেমন দেখেছি, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

৮. ------, মাই লীডার: এ মেসেঞ্জার অব পীচ, ঢাকাঃ মর্নিং নিউজ, ডিসেম্বর ৫, ১৯৬৯।

৯. হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, করাচীঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৭০।

১০. আবুল মনসুর আহমেদ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী: দি স্টেটসম্যান,পাকিস্তান, ঢাকাঃ দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার, ডিসেম্বর ৫, ১৯৬৯।

১১. এস. ইসলাম, সোহরাওয়ার্দী, এ ট্রিবিউট, ঢাকা ঃ পাকিস্তান অবজারভার, প্রাগুক্ত।

১২. এম.এন.হুদা, সোহরাওয়ার্দীকে যেমন দেখেছি, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

১৩. তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮৪।

১৪. ম্যারন স্ট্যানলী, দি প্রোব্লেমস অব ইস্ট পাকিস্তান, প্যাসিফিক এ্যাফেয়ার্স, ভল্যূম-২৭, জুন, ১৯৫৫।

১৫. আতাউর রহমান খান, শহীদ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

১৬. তালুকদার মনিরুজ্জামান, গ্রুপ ইনটারেস্ট ইন পাকিস্তান পলিটিকস ১৯৪৭-১৯৫৮, প্যাসিফিক এ্যাফেয়ার্স, ভল্যম-৩৯।

১৭. এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান, জেনারেলস ইন পলিটিকস ১৯৬৮-৮২, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮২।

১৮. সিরাজ উদদীন আহমেদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকাঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬।

১৯. সিরাজ উদদীন আহমেদ, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, ঢাকা ঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২০. এ.কে ব্রোহী, এ ট্রিবিউট টু সুহরাওয়ার্দী, করাচী ঃ দি মর্নিং নিউজ, ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

২১. আবুল হাশিম, আমার দৃষ্টিতে মরহুম সোহরাওয়ার্দী, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আইয়ুব খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মোহাম্মদ আইয়ুব খান

"People in developing countries seek assistance, on the basis of mutual respect ; they want to have friends not masters."

— Mohammad Ayub Khan

জন্ম : ১৪ মে ১৯০৭।

জন্মস্থান : রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।

পিতা : রিসালদার মেজর মীর দাদ খান।

শিক্ষা : ১৯২২ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার আগেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি।

সৈনিক জীবন : ১৯২৬ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান; ঐ বছরেই প্রশিক্ষণের জন্য বৃটেনের স্যান্ডহার্টে গমন।

- ২য় বিশ্বযুদ্ধে (বৃটিশ, ভারতে) অংশগ্রহণ।
- ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি নিযুক্ত।
- ১৯৪৮ সালে সেনাবাহিনীর এডজুট্যান্ট জেনারেল নিয়োগ।
- ১৯৫০ সালে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত।
- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দান।
- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ।
- ১৯৬০ সালে আস্থা ভোটের নির্বাচনে জয়লাভ।
- ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন নয়া সংবিধান ঘোষণা।
- ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার।
- ১৯৬৪ সালে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন সম্পন্ন।
- ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহর বিরুদ্ধে জয়লাভ।
- ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু।
- ১৯৬৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু।
- ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগ।

বিশেষ অবদান : পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে রাওয়ালপিন্ডি /ইসলামাবাদে স্থানান্তর, ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন নির্মাণ, পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কার, পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, ঘোড়াশাল ও ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ১৪টি সুগার মিল, ১২টি জুট মিল, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক, তারবেলা ড্যাম, ডিএনডি প্রকল্প, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ইত্যাদি।

মৃত্যু : ১৯৭৪ সাল।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালে যদিও পাকিস্তানে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সংবিধান চালু হয়, কিন্তু তাতে প্রেসিডেন্টকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয়। ২৩ মার্চ সংবিধান কার্যকরী হলে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা প্রতিনায়কের ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু মাত্র ১৩ মাসের মাথায় তাঁকে অপসারণ করে আই.আই. চুন্দ্রীগড়কে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনিও মাত্র ৬০ দিনের মাথায় অপসারিত হন। এবারে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন ফিরোজ খান নুন। শাসনতন্ত্র বহাল থাকা অবস্থায় ইস্কান্দার মির্জা আড়াই বছরে পর পর চারজনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান প্রদেশেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। একে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা ভেংগে দেন। একই স্টাইলে ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর ফজলুল হককে অপসারণ করেন। আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১২ঘন্টার ব্যবধানে তিনিও বিদায় নিতে বাধ্য হন। আতাউর রহমান খান পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৫৮ সালের জুন ম্যসে তিনি আবার অপসারিত হন। আবু হোসেন সরকার আরেকবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন; কিন্তু চার দিনের ব্যবধানে আবার বিদায় নেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রায় দু'মাস সরাসরি প্রেসিডেন্টের শাসনাধীন থাকার পর আতাউর রহমান খান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যপারে এমন দর কষাকষি করতে থাকেন যা পাকিস্তানের নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। ইস্কান্দার মির্জার তখনকার ভূমিকা সম্পর্কে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর Friends Not Masters গ্রন্থে বলেন, "ধূর্ত মির্জা জানতেন কিভাবে শাসনতন্ত্রকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও দর কষাকষির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কে কোন রাজনৈতিক দলে অবস্থান করছে সেটা বোঝাই ছিল কষ্টকর। খুব তাড়াতাড়ি তাদের লেবেল বদলে যাচ্ছিল। আজকে যে ছিল মুসলিম লীগ আগামীকাল তাকেই দেখা যাচ্ছিল রিপাবলিকান হিসাবে।"

ঘন ঘন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও ওলট পালটের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে তা বাতিল করে প্রথমে ১৯৫৮ সালে এবং পরে চূড়ান্তভাবে ১৯৫৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা আশাবাদের সঞ্চার হয়। ধারণা করা হয় যে, সাধারণ নির্বাচন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংহত হবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পথও সুগম হবে। কিন্তু নির্বাচনের সম্ভাবনা কায়েমী স্বার্থবাদী শিবিরে হতাশার সৃষ্টি করে এবং তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মওদুদ আহমেদ তাঁর "বাংলাদেশঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা" গ্রন্থে বলেন,

> "গোটা পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভীত করে তোলে। বাজেট ছাঁটাই কিংবা ব্যয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্বন্টনের আশংকায় সেনাবাহিনী যেমন শংকিত হয়ে পড়ে, পাঞ্জাবী এবং ভারত প্রত্যাগত মুহাজিরদের সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং কূটনীতিবিদরা তেমনি ক্ষমতা ও সুবিধাদি ছাঁটাইয়ের অনুরূপ আশংকায় উদ্বেলিত হতে থাকে। পাকিস্তানব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের উপর শোষণের প্রক্রিয়াও উম্মোচিত হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এতে করে এতদিন যাবৎ হিসাব যোগ্যতাবিহীন ক্ষমতাসীনরা সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এত ঘন ঘন পরিবর্তন করা হচ্ছিল যে ক্ষমতা ক্রমশঃ বেসামরিক আমলাদের করায়ত্ত হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু গোলাম মোহাম্মদ এবং ইস্কান্দার মির্জা সাত বছর যাবৎ প্রেসিডেন্ট অধিষ্ঠিত থাকায় বেসামরিক আমলারা রাষ্ট্রযন্ত্রে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছিলেন। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুবাদে তারা পাকিস্তানে তৈরী করে নিয়েছিলেন স্বার্থবাদী সুবিধাভোগী আরেকটি শ্রেণী। কাজেই বেসামরিক আমলাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রবল বিরোধিতা করা হতে থাকে। এই স্বার্থবাদী মহলের প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক পদ্ধতির নিন্দা করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে গোলযোগ ও বিভ্রান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সরকারের ব্যাপক প্রচারণাও সারা দেশে নির্বাচন সম্পর্কে জনমনে শংকা ও ভীতির সঞ্চার ঘটাতে থাকে। ....এ সমস্ত সম্ভাবনা (নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া) পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মহলে এক প্রকার ভীতির সূচনা ঘটায়। বারো বছরে অবস্থান সংহতকারী ও সম্পদ আহরণকারী আমলা, সেনাবাহিনী, নব্য পুঁজিবাদী ও সামন্ত এলিট সকলের কাছেই ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবিত নির্বাচন ছিল একটি হুমকি, বিরাট ধরনের শংকা। সে কারণেই তারা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বানচাল করার ষড়যন্ত্রে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।"

www.pathagar.com

সামরিক অভ্যুত্থান

বৃটিশ রাজকীয় সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসার, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রথম মুসলিম সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ও প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা পাকিস্তানের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনালগ্নে স্বৈরশাসনের হাতিয়ার নিয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক আইন জারী করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থেকে জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অচিরেই ইস্কান্দার মির্জা নিজের খননকৃত কুয়োয় নিপতিত হন। জেনারেল আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেই প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসকের কর্তৃত্ব হাতে নেন এবং তিনি এ প্রক্রিয়াকে একটি 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। সামরিক অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা প্রসংগে আইয়ুব খান তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> "প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের দুর্বলতাকে পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন এবং দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকলকে প্রকাশ্যে অবমাননা করেছেন। আমার মনে হয় না যে, তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানে উৎসাহী ছিলেন; বরং তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর সব কাজ গুছিয়ে এনেছিলেন। একজন সৈনিকের অবস্থানে থেকে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটবে। সারা দেশে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দেবে, রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপে যন্ত্রণাবিদ্ধ বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেনাবাহিনীও এতে জড়িত হয়ে পড়বে, কারণ চূড়ান্ত পর্যালোচনায় দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীর অবস্থানও অক্ষত থাকবে না এবং এটা প্রত্যাশাও করা যায় না যে রাজনৈতিক ছলচাতুরী, ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও অযোগ্যতার প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত জীবনযাত্রায় সর্বস্তরের অবর্ণনীয় দুর্দশায় অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকেরা কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে না। তাদেরও আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং কারো কারো গণসংযোগও রয়েছে। দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় সেনাবাহিনী হিসাবে এটা নিশ্চিত ছিল যে তারাও জনগণের চিন্তাধারায় সাড়া দেবে।"

www.pathagar.com

বলাই বাহুল্য সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সামরিক আইন জারীর সাথে সাথে (১) ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়; (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে অপসারণ করা হয়; (৩) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়; (৪) সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়; এবং (৫) বিকল্প কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান একের পর এক সামরিক আইন বিধি (Martial Law Regulation) জারী করতে থাকেন। জারীকৃত বিভিন্ন বিধির আওতায় মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার হরণ করে নেয়া হয়। 'বিভিন্ন ঘোষণা ও হুকুম প্রদানের মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মানুষের ঘাড় ফেরানোর মত কোন সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়নি। এমন কি পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল যে, প্রতিবাদ সভা ও ধর্মঘট করা সম্ভবপর ছিল না। দেশের জনগণের এ সময় সমস্ত ধরনের মত প্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেয়া হয়; সামরিক শাসনের ব্যাপারে যে কোন ধরনের সমালোচনাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে হরণ করা হয়; সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন ধরনের সামরিক আদালতের হাতে শাস্তি প্রদানের চূড়ান্ত অধিকার অর্পণ করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দণ্ডাদেশ প্রদানের ক্ষমতা এ সকল কোর্টের উপর অর্পণ করা হয়। এ সকল দন্ডাদেশ প্রদানের বিরুদ্ধে আপীল করারও কোন সুযোগ রাখা হয়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের উপর এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে, কেউ ইঙ্গিতেও যদি সামরিক শাসনকে কিংবা সামরিক বাহিনীকে সমালোচনা বা বিদ্রুপ করছে বলে তারা মনে করে তাহলেও শুধুমাত্র সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম শাস্তির বিধান রাখা হয় ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড। ফলে সমগ্র পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ এমন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়েছিল যে, যে কোন ব্যক্তিকে যখন তখন তারা অপমান করতে পারতো। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে চললে, পথের বাম দিক দিয়ে হাঁটলে, ময়লা কাপড় গায়ে থাকলে, রাস্তা অপরিষ্কার থাকলে, কিংবা অভিভাবকহীন কুকুর পথে চলাফেরা করলে, এমন কি মিলিটারীদের প্রতি সোজাভাবে তাকালে পর্যন্ত এলাকায় জনসাধারণের জন্য সে সব শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত। অবশ্য একথা ঠিক যে, রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে দেশের অভ্যন্তরে আইয়ুব খান তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন বিপুল জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে - এমন কি পূর্ব পাকিস্তানেও। জনগণ দেশের সংসদীয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা

www.pathagar.com

ও অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে সামরিক আইন জারী পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য ছিল এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। জনসাধারণ প্রাথমিকভাবে সামরিক আইন জারীকে স্বাগত জানালেও কিছুদিনের ব্যবধানেই একথা উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয়নি যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের উপর সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া মোটেই ইতিবাচক হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব সামরিক বাহিনী সরাসরি করে অত্যন্ত সফলতার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বহুবিধ কঠোর সামরিক কালাকানুন জারী করেও জেনারেল আইয়ুব পূর্ব পকিস্তানের উপর পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সফল হননি। বরং আত্মগোপনকারী বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন অনেক বেশী স্বাধীনতা পেয়েও রাজনীতিবিদদের পরিবর্তে সামরিক শাসনকে স্বাগত জানাতে আগ্রহী ছিল না।

জেনারেল আইয়ুব কথিত 'নির্লজ্জ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের ৬ আগস্ট The Elected Bodies (Disqualification) Order, 1957 (EBDO) জারী করেন। এবডো ঘোষণার পরে সমগ্র পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীন। সরকারের বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা, ঘরোয়া পর্যায়েও রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করাও এ আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে গণ্য হয়। 'পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন এক্ট' জারী করে সাবেক মন্ত্রী ও আইন পরিষদের সাবেক সদস্যদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিচারে যদি কেউ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে EBDO-র আওতায় অপরাধী ব্যক্তি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। সামরিক আইন জারীর পর কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নেয়া হয়। এমন কি এক সামরিক ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থিত হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবু হোসেন সরকারের মত নেতা সকল অভিযোগ অস্বীকার করা সত্ত্বেও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আতাউর রহমান খান অর্ডিন্যান্সের শর্ত মেনে নিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণে সম্মত হয়ে ট্রাইব্যুনাল মোকাবেলা করা থেকে অব্যাহতি পান। মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের ৪৩ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, স্পীকার ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের উপর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অপরদিকে দুর্নীতি, কর্মবিমুখতা, অদক্ষতা ও শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণের অজুহাতে আইয়ুব খান সরকার কর্তৃক পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি) ১২ জন অফিসার, ৮৪ জন অন্যান্য

www.pathagar.com

পদস্থ কর্মকর্তা ও ২৫০০-র মত নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতারকৃতদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। সীমান্ত প্রদেশে প্রায় তিন হাজার নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার এবং তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোয়েটাতে ৪০০ জন বালুচকে গ্রেফতার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দড়িতে বেঁধে অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাখা হয় এবং তাদের মাঝে মধ্যে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়। সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদের কারাগারে ৭ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়। সামরিক আইনের অধীনে আয়কর ফাঁকিদাতা, বৈদেশিক মুদ্রা পাচারকারী ও সীমান্ত চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে এক কোটি ষাট লক্ষ স্টার্লিং বৈদেশিক মুদ্রা ও সমুদ্র তীর থেকে দুই টন স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়।

আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কম্যুনিস্টদের উপর বিশেষ দমন অভিযান পরিচালনা করে। বিশেষ ক্ষমতা অধ্যাদেশ বলে গ্রাম-গ্রামান্তরে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশেই অভিযান চলে। কোন রকম গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই বামপন্থীদের বাসগৃহে হামলা চলতে থাকে। বাম রাজনীতি সংক্রান্ত কোন বই বা দলিলপত্র পেলেই গৃহস্বামীকে গ্রেফতার করা হতে থাকে। সকল কম্যুনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয়। আইয়ুব সামরিক শাসন যে কী ভয়াবহ রূপ নিয়ে পাকিস্তানের জনসাধারনের কাছে আবির্ভূত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন পূর্ব বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তাঁর 'স্বৈরাচারের দশ বছর' নামক গ্রন্থেঃ

> "দেশে জঙ্গী আইন ঘোষণা করেছে-মার্শাল ল রেগুলেশন। রেগুলেশনের নির্দেশে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হুকুম অমান্য করলে মার্শাল ল' রেগুলেশনে অপরাধ ও বিচার। রোজই দু'চার পাঁচটা রেগুলেশন জারি হচ্ছে। এটা করলে তিন সাল, ওটা না করলে পাঁচ সাল, দশ সাল। শুধু সালই নয়, বেত্রঘাতও সাথে সাথে। চরম দন্ডও দেওয়ার অধিকার আছে রেগুলেশনের-মৃত্যুদণ্ড।
>
> হুকুম জারি হল, দ্রব্যমূল্য কমাও। হু-হু কমতে লাগল। না কমায়ে উপায় নাই। তিরিশ টাকা গজের কাপর পনর টাকা! এমনি হিসাব। একজন ব্যাপারী টেলিফোন করে দুরবস্থার বর্ণনা দিল। দু'দিনে আশি হাজার নেমে গেছে। কাল নাগাদ মালখালাস। লাখের উপর লোকসান দিয়ে দোকানে তালা লাগবে। চীনা মাটির দোকানে মানুষের মাথা-লাইন লেগে আছে। তিনশ টাকার ডিনার সেট দেড়শ টাকায়-পঞ্চাশ টাকার টি সেট কুড়ি

www.pathagar.com

টাকায়। অন্যান্য জিনিসও ঐ দরে। দোকানদার তার মাল খরিদের রশিদ পত্র দেখায়ে অন্ততঃ কেনা দামে বিক্রি করার অনুমতি দেবার জন্য মিনতি করেছে। কোন ফল হয় নাই---------

কিন্তু যাদের সুবিধার জন্য সস্তা দরে বিক্রি করার হুকুম জারী হল গরীব জনগণ, তারা এর আশে পাশেও না; অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে দেখেই খুশী। এসব কেনার ক্ষমতা তাদের নাই------

অফিস-আদালতেও দারুণ তাড়াহুড়া। কাজ হোক না হোক হাত-পা নাড়াচাড়া খুব চলছে। সবাই শশব্যস্ত।

কাচারিতে হাকিমের ক্ষিপ্রগতি। কচু কাটার মতো মোকদ্দমা ধরছেন আর শেষ করছেন। মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সব মোকদ্দমা শেষ করতে হবে। গুদাম খালাস করার মত।

এক রসিক হাকিমের সাথে দেখা। বললাম, খুব চালাচ্ছেন বুঝি! হেসে বললেন, খুব চালাচ্ছি। ইনসাফ হোক না হোক সাফ করে ফেলেছি সব। মামলা-মোকদ্দমার আবর্জনা রাখব না। সেক্রেটারীয়েটে বড় বড় আমলাদের ঘাঁটি। হঠাৎ একদিন সব দরজা বন্ধ। বাইরে সিপাই সান্ত্রী পাহারা। ব্যাপার কি? বড় বড় কর্মচারী বিলম্বে অফিসে আসেন। তাদের ধরার জন্য এই ব্যবস্থা।

বাড়িঘর পরিষ্কার করার নির্দেশ হল। সবাই লেগে গেল ঘষামাজার কাজে। চারদিকের গাছপালা কেটে পয়মাল। ফলবান বৃক্ষ। সবই আবর্জনা। অনেক পুরাতন বাড়ি নতুন পোষাক পরলো। মেরামত চুনকাম হল বহু কাল পরে। টাকা ধার করে বা বউয়ের গয়না বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়ে এসব করলো।

মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কয়েক বছর অনাদায়। লাখ দশেক কি তারও বেশী হবে। হুকুম হল পনর দিনের ভেতর সব আদায় করতে হবে। হয়ে গেল আদায়। হাঁড়ি পাতিল, ঘটিবাটি, তাম্রকাঁসা বেচে ট্যাক্স আদায় করল।

ওমরাও খাঁ (প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক-লেখক) একদিন বললেন, দেখলেন কেমন করে টাকা আদায় হয়? আপনারা ফেলে রেখেছিলেন দশ বছর।"

www.pathagar.com

আইয়ুব আমলে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা

সংবিধান প্রণয়ন

আইয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে জনগণের অনুমোদন ও সমর্থন আছে তা বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য তিনি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র পাকিস্তানে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী আয়োজন করেন 'আস্থাভোটের'। ইউ পি সদস্যরা 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটে ভোটার হিসাবে ভোট দেয়। জেনারেল আইয়ুব ৯৫.৬% ভাগ 'হ্যাঁ' সূচক আস্থা ভোট লাভে সক্ষম হন। 'আস্থা' লাভের পর তিনি ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী দেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে Constitution Commission গঠন করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল আবু সাইদ চৌধূরী (পরবর্তী হাইকোর্টের বিচারপতি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) উক্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। উক্ত কমিশন ১৯৬১ সালের মে মাসে রিপোর্ট পেশ করে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ এক সংবিধান জারী করেন। উল্লেখ্য যে, কমিশন তার প্রতিবেদনে মন্তব্য করে যে সংসদীয় প্রক্রিয়া পাকিস্তানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কমিশন সুপারিশ করে যে, পাকিস্তানের নাগরিকগণ দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা আইনসভার সদস্যদের নির্বাচিত করার যোগ্যতাসম্পন্ন নন বিধায় উচ্চতর আসনসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এদ্বারা কমিশন নির্বাহী বিভাগের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণরক্ষাকারী শক্তিশালী আইনসভা ভিত্তিক আমেরিকান পদ্ধতির অনুরূপ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠনের সুপারিশ করে। এতে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং পাকিস্তানের দু'টি অংশ থেকে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার কথা বলা হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১৯৬২ সালের জুন মাসে তাঁর নিজ নামে জারীকৃত শাসনতন্ত্রে ফেডারেল কাঠামো বাদ দিয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামো প্রবর্তন করেন। বস্তুত আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র কমিশনের সুপারিশমালার যে সমস্ত প্রস্তাব তাঁর স্বার্থানুকূলে ছিল সেগুলো গ্রহণ করে বাকীগুলো বাদ দিয়ে দেন। নতুন শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট পদকে অত্যন্ত ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে আইনসভাকে তাঁর অধস্তন করা হয়। শাসনতন্ত্রে সবচেয়ে আশংকাজনক যে দিকটি ছিল তা হলো ফেডারেল পদ্ধতির পরিবর্তে এককেন্দ্রিক সরকারের ধাঁচে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করা। 'এটা ছিল পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ইতিহাসে কাঙ্ক্ষিত ও গৃহীত সব রকম পদক্ষেপের চাইতে বিপরীতমুখী'। সামরিক শাসনের পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার নামে জেনারেল আইয়ুব জাতির সামনে এমন

www.pathagar.com

এক সংবিধান উপস্থাপন করেন যাতে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা তাঁর হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে কোনভাবে অপসারণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বস্তুতপক্ষে তিনি 'এমনভাবে প্রেসিডেন্ট নামক ইমারতটি তৈরি করেছেন, একমাত্র পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু ছাড়া উক্ত পদাধিকারীকে অপসারণ করার প্রায় কোন পথই রাখেন নি।" সংবিধান প্রণয়নে আইয়ুব খানের গণতন্ত্রের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভংগি ও তাঁর কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল আইয়ুবকে তিন মাসের মধ্যে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তখন তিনি যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন ১৯৬২ সালের সংবিধানে তার মূল ভিত্তিগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। তিনি এতে এমন এক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের ছবি এঁকেছিলেন যেখানে রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তিটি অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে এমনভাবে উর্ধ্বে স্থাপন করা হয় যাতে তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁর হাতেই থাকবে ক্ষমতার চাবিকাঠি। আইয়ুব খান মনে করতেন, 'অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ জনসাধারণ' যে কোন সময় সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদদের খপ্পরে বিশেষতঃ 'কম্যুনিস্টদের খপ্পরে' পড়ে যেতে পারে, আর সে কারণেই তাদেরকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রণয়ন করা দেশ ও জনসাধারণের স্বার্থের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ মনোনীত সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রার্থীরাই জয়লাভ করে। ১৯৬২ সালের ৮ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে এবং ঐদিন দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

মৌলিক গণতন্ত্র

আইয়ুব খান সীমিত মাত্রার গণতন্ত্রের ধারণা বাস্তবে রূপ দিতে ১৯৫৯ সনের ২৬ অক্টোবর অভিনব 'মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি' চালু করেন। তাঁর মতে 'গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই'। এমনও কোন কথা নেই যে, কোন রকম সংশোধন বা সংযোজন ছাড়া তা সব দেশে একইভাবে ব্যবহৃত হবে। পাকিস্তানের মত একটি পশ্চাৎপদ জনগণের দেশে তাই ছোট ছোট অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্বই শুধু জনগণের উপর দেয়া যেতে পারে। এ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) প্রেসিডেন্ট এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট নির্বাচিত করবে। আর এটাই হবে সবচেয়ে সহজ নিয়ন্ত্রণযোগ্য দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উত্তম পথ।' নতুন এ রাজনৈতিক পদ্ধতির আওতায় চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেন।

www.pathagar.com

এর সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী-যার অর্ধেক ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং অর্ধেক ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। এরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হত। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে 'ইলেক্টোরাল কলেজ' হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ব্যবস্থাকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' এবং নির্বাচক মন্ডলীকে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' বলা হয়।

আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী মৌলিক গণতন্ত্রীদের ৯৫.৬% ভোট পেয়ে 8 বছরের জন্য দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মৌলিক গণতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রদেশ থেকে সামরিক আইন প্রশাসক প্রত্যাহার করেন এবং তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন।

রাজনৈতিক দলে যোগদান

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে সংবিধান প্রণয়ন ও মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিষদ গঠনের পর রাজনৈতিক দলে যোগদানের মাধ্যমে তার ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য আরো এক ধাপ অগ্রসর হন। তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিলে মুসলিম লীগের একটি অংশ তার সংগে যোগ দেয়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক কনভেনশনের মাধ্যমে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠিত হয়। আইয়ুব খান ১৯৬৩ সালের মে মাসে তাতে যোগ দেন এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। আইয়ুব খান অবশ্য রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ফলে রাজনৈতিক দল গঠন করলেও দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য তিনি তেমন সক্রিয় ছিলেন না। ১৯৬৫ সালে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করলেও তিনি দলীয় কর্মকান্ডের চাইতে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই প্রচারণা চালান। এমনকি নির্বাচনী ইশতেহার তৈরীর ক্ষেত্রেও দলকে কাজে লাগাননি; পরবর্তীতে দলের অনুমোদন নেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের ২ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা হয়। এর পরপরই মার্চে জাতীয় পরিষদ ও এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য স্থির হরা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত এ সব নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার ছিল না। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাররা ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য 'নির্বাচকমন্ডলী' (Electoral College) হিসেবে যে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচিত করে তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করে।

www.pathagar.com

আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও তৎকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামী প্রতিনিধিবৃন্দ আইয়ুবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রত্যয় নিয়ে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে ১৯৬৫ সালের ২০ জুলাই এক বৈঠকে মিলিত হন। চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় ৯ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Party) গঠন করা হয়। ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনীত করেন। তাঁর এ মনোনয়ন সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু বি, ডি মেম্বারদের প্রদত্ত ভোটের ভিত্তিতে আইয়ুব খান বিজয় লাভ করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি যথাক্রমে ২১০১২ ও ২৮৯২১ ভোট সর্বমোট ৪৯,৯৩৩ লাভ করেন। ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ১৮৪২৪ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০২৪৪ ভোট সর্বমোট ২৮৬৬৮ লাভ করেন।

পররাষ্ট্র নীতি

সামরিক আইন জারীর পর আইয়ুব খান পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতিই বহাল রাখেন। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি আরো গতিশীলতা আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর আবির্ভাব এবং পাশ্চাত্য ও কম্যুনিস্ট ব্লকের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিতে সতর্ক কৌশল অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করেন।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্কই ছিল সবচেয়ে স্পর্শকাতর। শরণার্থী বিনিময় সমস্যা নিরসনের পূর্বেই কাশ্মীর নিয়ে মারাত্মক বিরোধ দেখা দেয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই। ভারত কাশ্মীরের বিরাট অংশ দখল করে নিলে পাকিস্তান ভৌগলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিষয়ে শংকিত হয়ে পড়ে। পকিস্তান শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো এবং চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান মোটামুটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ ক্ষমতায় আসার পর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য তিনি যুক্তরাষ্টের কাছে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য চান। এর মধ্যে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকে। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে পাকিস্তান সেন্টো-(CENTO)-র সদস্যপদ লাভ করে। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আবার সিয়েটো (SEATO)-র সদস্য হয়। দুটো সংস্থাতেই যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

সদস্য ছিল এবং কম্যুনিস্ট হুমকির মোকাবেলা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এ ঘটনায় চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করে। এদিকে চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে শক্তিশালী করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কৌশল গ্রহণ করে। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করে।

আইয়ুব সরকার চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘে চীনের স্বীকৃতির প্রশ্নে সরাসরি সমর্থন প্রকাশ করে। মধ্যপ্রচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দিক থেকে সাহায্য লাভ করতে থাকায় ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে যা প্রকারান্তরে পাকিস্তান ও প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোর জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মন্তব্য করেন । তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে ওয়াশিংটন সফরে যাবার পথে লন্ডনে বলেন,

> "Pakistan might have slide towards neutrality if forced by circumstances or dictated by requirements of security. There is grave concern about the ratifications of the new American policy. Smaller Asian countries like Ceylon, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sikkim, Burma and Malaya were apprehensive. If India became overwhelmingly strong militarily or economically,these countries would look for protection elsewhere."

১৯৬১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু পাকিস্তানে আগমন করেন এবং আইয়ুব খানের সঙ্গে সিন্ধু নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধের পরে আমেরিকা চীনকে প্রতিরোধ করার জন্য ভারতে ব্যাপকভাবে অস্ত্র পাঠাতে থাকলে আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে পাকিস্তানের উদ্বেগের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র আশ্বাস দিলেও ভারতের প্রতি তাদের নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং কম্যুনিস্ট চীনের বিপরীতে ভারতে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহয্য প্রদান করার জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন।

১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান মস্কো, পিকিং ও ওয়াশিংটন সফরের ত্রিমুখী পরিকল্পনা করেন। তিনি সাফল্যের সাথে মস্কো ও পিকিং সফর করলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসন শেষ মুহূর্তে তাঁর ওয়াশিংটন সফরের কর্মসূচী অসৌজন্যমূলকভাবে বাতিল করে দেন। এতে অবশ্য আইয়ুবের ভাবমূর্তি আরো বেড়ে যায়। তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করছেন বলে ধারণা জোরদার হতে থাকে। চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই এবং সোভিয়েত নেতাদের সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বৈঠক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আইয়ুব চীন সফর করে চীনের সঙ্গে সীমান্ত ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

কাশ্মীর প্রশ্নে ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান আক্রমন করে এবং তা ভয়াবহ যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ১৭ দিনের যুদ্ধ জয় পরাজয় ছাড়াই শেষ হয়। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের আবসান ঘটলেও এযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর উপর আইয়ুব খানের কর্তৃত্ব ও ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রদেশের নিরাপত্তার বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটা বড় অংশ এরূপ মনে করতে থাকে যে, চীনের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত। তারা মনে করেন যে, আইয়ুব খান বাইরের চাপের মুখে যুদ্ধে সন্ধি ও তাসখন্ধ চুক্তি করেছেন। তাসখন্দ চুক্তিকে পাকিস্তানের রাজনীতিকরা এবং সেনাবাহিনী 'জাতীয় স্বার্থের জলাঞ্জলি" বলে গণ্য করে। আইয়ুব খান পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে 'দুর্বল ও মারাত্মক ব্যাপার' বলে মন্তব্য করেন। তিনি তাঁকে ভুলপথে পরিচালনার জন্য তাঁর পররাষ্ট্র সচিব আজীজ আহম্মদকে দায়ী করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে ভূট্টোকে বরখাস্ত করেন। ভূট্টো পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ময়দানে বড় সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হন।

আইয়ুব খানের আমলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কার

বিপ্লবের পরে আইয়ুব খান-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং দ্বিতীয়তঃ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও মুজাহির সমস্যার সমাধান। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে তিনি একে একে ৩০টি উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন গঠন করেন এবং সে সব কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সফল হন। কমিশনগুলোর মধ্যে ভূমি সংস্কার কমিশন, জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন, বিজ্ঞান কমিশন, বেতন ও চাকুরী কমিশন, প্রেস ও সাংবাদিক কমিশন, মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশন। করাচী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করার জন্য তিনি একটি কমিশন নিয়োগ করেন। প্রথমে অস্থায়ীভাবে রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে স্থানান্তরিত করেন, পরে কমিশনের সুপারিশক্রমে সেখান থেকে ১০মাইল উত্তরে পোটওয়ার মালভূমিতে প্রাচীন গান্ধারা সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দেশের স্থায়ী রাজধানী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে সেখানে ইসলামাবাদ নামে নতুন রাজধানীর নির্মাণ কার্য শুরু হয়। কিছুকাল পরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ঢাকা শহরের উত্তরাংশে একটি দ্বিতীয়

www.pathagar.com

রাজধানী নির্মাণ করেন। বিখ্যাত আমেরিকান স্থপিত কান-এর (Kahn) পরিকল্পিত সুদৃশ্য সংসদ ভবন এবং অন্যান্য মনোরম ভবন নির্মাণের জন্য তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আইয়ুব-এর নির্মিত দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণ করা হয় শেরে বাংলা নগর।

সামরিক আইন জারীর ফলে উভয় পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন জনগণের কাছে সামরিক শাসন উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিলেও জেনারেল আইয়ুব খান প্রাথমিকভাবে সমগ্র দেশে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এরপর তিনি তাঁর শাসনের অনুকূলে একটা সামাজিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য কতিপয় সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মজার বিষয় হলো, সামরিক প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব সকল সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিমালার দোহাই দেন। তিনি বলেনঃ

> "The whole pattern of social and political life in the country had to be reorganized on democratic principles so as to ensure the participation of the people in the affairs of the country in a construction and meaningful way."

ভূমি সংস্কার

তিনি ভূমি সংস্কার ও মুহাজির সমস্যাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। ১৯৫৮ সালে ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। আইয়ুব খান নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৫৮ সালে পাঞ্জাবের শতকরা ৫০ভাগের বেশি জমি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অর্ধেকের কিছু কম এবং সিন্ধুর শতকরা ৮০ভাগেরও বেশি জমির মালিকানা ছিল অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের (absentee landlords) দখলে। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি মালিকদের মাত্র ০.১%(দশমিক এক) ভাগ শতকরা ১৫ ভাগ জমির মালিক ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের ৫০০ একরের বেশী জমি ছিল। পক্ষান্তরে শতকরা ৬৫ভাগ ভূমি মালিক প্রত্যেকে ৫ একরের কম জমির মালিক ছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কার কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ পাঞ্জাবে মাত্র ১০০০টি অভিজাত পরিবার মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ১০.৩ ভাগ দখল করে রেখেছিল। এ অভিজাতবর্গের প্রত্যেকের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ৫০০ একর এবং এদের খামারের গড় আয়তন ছিল ২,২৯৫ একর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে এ অভিজাতদের ভূমির উপর আধিপত্য ছিল আরো অধিক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এ অভিজাত শ্রেণীর মালিকানায় ছিল মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ১২.৫ ভাগ জমি; আর সিন্ধু প্রদেশে এ শ্রেণীর মালিকানায় ছিল শতকরা

www.pathagar.com

৩০ ভাগ জমি। ভূমি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আইয়ুব সরকার ১৯৫৯ সালের ২৪ জানুয়ারী ভূমি সংস্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তে বলা হয় কোন ভূমি মালিক সেচযোগ্য ৫০০ একরের বেশি এবং সেচবিহীন ১০০ একরের বেশি জমি রাখতে পারবে না। উদ্বৃত্ত জমি সরকার ক্ষতি পূরণ দিয়ে গ্রহণ করবে এবং তা অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬০০০ ভূমি মালিককে অতিরিক্ত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়। এক হিসাব মতে ২৭ লক্ষ একর জমি হস্তান্তর করা হয়, তম্মধ্যে পূর্বোল্লিখিত ৬০০০ ভূমি মালিকের কাছ থেকেই পাওয়া যায় ২০ লক্ষ একর। আর ৫ লক্ষ একর পাওয়া যায় 'জায়গীর' ব্যবস্থা বিলোপ করে। ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা কাঠামো ও গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ 'আজন্ম অধীনতামুলক বন্ধন' থেকে মুক্তি লাভ করে। একজন কৃষক প্রথমবরের মত তার অধীনস্থ আবাদী জমির মালিক বলে দাবী করার অধিকার পায়। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে চাষের আধুনিক যন্ত্রপাতি বিশেষত ট্রাক্টর ও সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ফলে নতুন খামার মালিকগণ তাদের সামর্থ্য মত আধুনিক প্রযুক্তির উপর নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যূনতম দাম বেঁধে দেয়া হয় এবং কৃষিকাজে বিদ্যুতের ব্যবহার সহজলভ্য করা হয়। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটে যার প্রায় পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করে গ্রামীণ পুঁজিপতি খামার মালিকগণ। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে অভিজাত ভূমি মালিকদের বিপরীতে একটি বিকল্প মধ্যবিত্ত শক্তির বিকাশ ঘটে।

ভূমি সংস্কার কর্মসূচী দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে ইতিবাচক ফল দেখা গেলেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। যদিও ভূমি মালিকানার একটি উচ্চতম সীমা বেধে দেয়া সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে খুব বেশী পরিমাণ জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, কারণ অধিকাংশ উদ্বৃত্ত জমিই ভূমি অভিজাতদের অনুগত লোকজন ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে বন্টিত হয়েছে। ফলে বড় ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমি নিয়ে যাদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে সে সব ব্যক্তির অধিকাংশই পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত বন্ধন ও 'বিরাদারী' প্রথার অধীনতাকে মেনে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রাক্তন মনিব তথা ভূমি অভিজাতদের অনুগত থেকে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি মালিকানার ধরন ছিল আলাদা। এখানে ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতিতে ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি পশ্চিম পাকিস্তানের মত প্রবল ছিল না। সামরিক সরকার ১৯৫৮ সালে East Bengal

www.pathagar.com

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরুর সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (১৯৬০)

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান

www.pathagar.com

State Acquisition and Tenancy Act, ১৯৫০ সংশোধনের লক্ষ্যে একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করে। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে জমির শিলিং ১০০ বিঘা থেকে ৩৭৫ বিঘায় বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে ভূমি মালিকদের অবস্থান পূর্বের চাইতে সংহত হয়।

আইন সংস্কার

সামরিক সরকার আইন সংস্কারের জন্য একটি আইন সংস্কার কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন ছিল বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সামরিক শাসন বলবৎ থাকাকালে বেশ কিছু সুপারিশ কার্যকর করা হয়। সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরেও আইন সংস্কারের কাজ অব্যাহত থাকে। বিচার ব্যবস্থা জনগণের জন্য সহজতর করার লক্ষ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধিতে বিভিন্ন সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। আইয়ুব খানের আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিতর্কিত ছিল ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ। উল্লেখ্য যে, শরীয়াহ্ আইন মোতাবেক কোন মুসলমান পিতা জীবিত থাকাকালীন তার কোন সন্তানাদি মারা গেলে ঐ মৃত সন্তানের কোন সন্তানাদি জীবিত থাকলে তারা তাদের মৃত পিতার পিতা অর্থাৎ দাদার মৃত্যুর পর তারা দাদার সম্পত্তিতে কোন অংশ পেতো না। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী ঐ নিয়মের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়। এতে বিধান রাখা হয় যে, যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তার মৃত্যুর পূর্বে কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা কিংবা মাতা জীবিত থাকলে পেতেন। এ আইন জারী করার পর আলেম সমাজ একে ইসলাম বিরোধী আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বহু প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করে।

শিক্ষা সংস্কার

আইয়ুব খানের শাসনের শুরুতে পাকিস্তানে শিক্ষার হার ছিল মাত্র ১৫% ভাগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্য ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদে ১০ লক্ষ শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে সাড়ে ৪ লক্ষের বেশী শিশুকে এসময় স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য এসময়কালে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংখ্যা

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালের পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ; ১৯৬৫-৬৬ সালে তা বৃদ্ধি পায় ২ কোটি ৮০ লক্ষে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৪৯ সালের চাইতে ১৯৬৬ সালে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে। আইয়ুব খান পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাজানোর লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিক্ষা সচিব ডঃ এসএম শরিফের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৬০ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ৩৬০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। এতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; অবশ্য সাথে সাথে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এ রিপোর্টে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ করে ডিগ্রী স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় যা ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ছাত্রদের সমালোচনার মুখে সরকার রিপোর্টটি পর্যালোচনার জন্য বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন ১৯৬১ সালে সংশোধিত আকারে রিপোর্টটি পেশ করে। পরবর্তীকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেন-দরবারের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সরকার উক্ত শিক্ষানীতি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেয়।

আইয়ুব খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), চট্টগাম ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সম্প্রসারণ করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়ন

নব্য স্বাধীন দেশ পাকিস্তান ১৯৪৭থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে অতিবাহিত করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য এসময় কোন সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যাভিমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর সামরিক ও সিভিল্ আমলাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনী পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

www.pathagar.com

জেনারেল আইয়ুবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়ার ফলে পাকিস্তানে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

জেনারেল আইয়ুবের সামরিক সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। ফলে সামরিক শাসন জারীর পূর্বের অবস্থার চাইতে পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৬০ সালের মাথাপিছু আয় ৩১২ রূপী থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৭২ রূপীতে। মোট জাতীয় উৎপাদনের মেনুফ্যাকচারিং খাতের অবদানের হার যেখানে ১৯৪৯-৫০ সালে ছিল মাত্র ৫.৯% ভাগ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৯.৩% ভাগে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ১১.৭% ভাগে। অপরদিকে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৪৯-৫০ সালের ০.৫%ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে দাঁড়ায় ৩.৫%ভাগে। রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে রপ্তানীর পরিমান ছিল ৭১৭ মিলিয়ন রূপী; ১৯৫৮-৫৯ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১৩২৫ মিলিয়নে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ৩০০৬ মিলিয়নে। ১৯৬০-৬৮ সময়কালে আইয়ুব খানের শাসনামলে শিল্প উৎপাদন ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্পপতিদের কর হ্রাস, আমদানীর সুযোগ-সুবিধা এবং রপ্তানী বোনাসের মত সুবিধা দেয়া হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর পর ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রেও বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৬৬ মিলিয়ন রূপী এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩৩৬ মিলিয়ন রূপী। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে ঘাটতি পূরণ হয়ে ৩৫ মিলিয়ন রূপী উদ্বৃত্ত থাকে। পরবর্তী বছরগুলোতে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে স্বর্ণ, ডলার ও স্টার্লিং এর যে মওজুদ ছিল তার মূল্য ছিল মাত্র ৮৮০ মিলিয়ন রূপী, ১৯৬০ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১৩০০ মিলিয়ন রূপীতে।

আইয়ুব খানের শাসনামলে অর্থনৈতিক অবকাঠামো খাতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে পাকা সড়কের পরিমাণ ছিল ১৫,৯৬৬ মাইল তা ১৯৫৮-৫৯ সালেই ২০,২৬১ মাইলে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৪,২৮৯ মাইলে উন্নীত হয়। রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ১৯৪৯-৫০ সালে ৯,৯৪৩ মাইল তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৮-৫৯সালে ১০,০৩৩ মাইল এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ১০,১৯০ মাইলে দাঁড়ায়। ১৯৫৯-৫০ সালে পাকিস্তানে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৩১,৫৯০ টি, ১৯৬৫-৬৬ সালে তা বৃদ্ধি পায় ২,৮২,০৯৭টিতে। ডাক্তার সংখ্যা ১৯৪৯-৫০ সালে ছিল মাত্র ২,৩৪৬ জন, ১৯৬৫-৬৬ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১৭,৪৭৭ জনে। হাসপাতাল ছিল ৩৬৪টি (১৯৫০), তা বৃদ্ধি পায় ৪৫৯ টিতে (১৯৬৬)। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে টেলিফোন সংখ্যা ছিল ১৫,২৮৩ টি, ১৯৬৬ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১,৪১,০৪৫ টিতে।

www.pathagar.com

সারণী-১ঃ আইয়ুব খানের আমলে উন্নয়নের কয়েকটি পরিসংখ্যান

উন্নয়নের খাতসমূহ	১৯৫৮-৫০	১৯৫৮-৫৯	১৬৫-৬৬
সড়কের দৈর্ঘ্য (মাইল)	১৫,৯৬৬	২০,২৬১	২৪,২৯৮
রেলওয়ে	৯,৯৪৩	১০,০৩৩	১০,১৯০
মটরযান	৩১,৫৯০	১১০,৪৯৭	২২৮,০৯৭
রেডিও লাইসেন্স	৬৩,০৭৬	২৮৭,২৮১	৯২১,৫৯৩
ডাক্তার	২,৩৪৬	৯,৬১৪	১৭,৪৭৭
হাসপাতাল	৩৪৬	৪০৯	৪৫৯
সংবাদপত্র ও সাময়িকী	৪৪৬	১,১১৬	১,৫৮৮
ডাকঘর	৬,৪৭৪	১০,১৪৯	১২,১৫৬
টেলিফোন	১৫,২৮৩	৬৫,৭৫৯	১৪১,০৪৫

Source: Pakistan, Central Statistical Office, Twenty Years of Pakistan in Statistics, 1947-67, (Karachi: Government of Pakistan Press,1968)

আইয়ুব খানের শাসনামলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক সাহায্য । ১৯৫৪-৫৫ সালে যেখানে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে তা ১৯৫৯-৬০ সালে বৃদ্ধি পায় ২৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ৬৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আইয়ুব খানের অর্থনৈতিক নীতি বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি আনয়ন করেছিল ঠিকই, কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বন্টনের দিকটিকে উপেক্ষা করেছিল। আইয়ুব খান পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পক্ষে অন্তরায় হিসেবে অনুন্নয়নকে দায়ী করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তাঁর সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। আইয়ুব খান নিজে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর মুখ্য অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক বলেন যে, দেশের সম্পদ 'বাইশ পরিবারের' শিল্প-কারখানার পরিচালকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আইয়ুবের নিজের পরিবারও ঐ ভাগ্যবান বাইশ পরিবারের একটি ছিল। সরকার অর্থনৈতিক নীতিমালার উন্নয়নের সুফলকে সমান ও কার্যকরভাবে বন্টনের নিশ্চয়তা প্রদানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

শিল্পোন্নয়ন

১৯৫২ সালে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু হয়। একই সময় পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনও গঠিত হয়। একই সময় পূর্ব পাকিস্তানে ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৫৮-৬২ সালের মধ্যে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ৭টি শিল্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে ছিল দুটি জুট মিল, ৩টি সুগার মিল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল এবং ঘোড়াশাল ও ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ইপিআইডিসি ৬৫কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ করে। এ সময়কালে ১২টি জুটমিল, ১৪টি সুগার মিল, ১টি পেপার মিল, ১টি কেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার আওতায় প্রদেশের প্রথম স্টিল মিল, ১১টি জুট মিল, ২টি সুগার মিল, প্রদেশের প্রথম তেল শোধনাগার ও ডিডিটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়। দেখা যায় ইপিআইডিসি ১৯৫৮-৬৮ সালের মধ্যে ১৫৭কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭টি কারখানা স্থাপন করে।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে এবং বিদেশী সাহায্য হ্রাস পাওয়ার দরুন তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রথম দু'বছর শিল্প অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৬ ভাগ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ১১ ভাগ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে তা ১৩ ভাগে বৃদ্ধি পায়।

পাট শিল্প

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পূর্ব পাকিস্তানে কোন চটকল ছিল না। ১৯৫৭-৫৮ সাল নাগাদ মোট ১৪টি চটকল স্থাপিত হয়। আইয়ুবের শাসনামলে ১৯৬৮ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানে চটকলের সংখ্যা ৪০ এ উন্নীত হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে পাট শিল্পের উৎপাদন ১৯৫৮ সালের চেয়ে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৭ টনে উন্নীত হয়।

বস্ত্র শিল্প

১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানে ১৮লক্ষ ৮৯ হাজার টাকুসহ তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার। ১৯৬৭-৬৮ সালে টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ হাজার ৭৫৪-এ উন্নীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে বস্ত্রের উৎপাদন ১৯৫৭-৫৮ সালের ৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ গজ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৭৮কোটি ৭০ লক্ষ গজে বৃদ্ধি পায়।

চিনি শিল্প

১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানে চিনি কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি এবং ১৯৬৭-৬৮সালে চিনি কলের সংখ্যা ১৯টিতে উন্নীত হয়। এ সকল চিনি কলের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় বার্ষিক ৪ লক্ষ ৭ হাজার টন। অথচ ১৯৫৮ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টন।

www.pathagar.com

অন্যান্য শিল্প

১৯৪৭-৪৮ সালে সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ লক্ষ টন। ১৯৫৭-৫৮ সালে তা প্রায় ১১ লক্ষ টনে পৌছে। সামরিক শাসন জারীর পূর্বে কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ হাজার টন এবং দশ বছর পর তা ১ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে ২টি সার কারখানা ছিল। আইয়ুব শাসন অবসানের প্রাক্কালে সমগ্র পাকিস্তানে সার কারখানার সংখ্যা প্রায় ১৫টিতে পৌছে। তাঁর শাসনামলে চট্টগ্রাম ও করাচীতে ২টি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় এবং 'পাকিস্তান স্টিল মিলস কর্পোরেশন' গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে ঢাকার জয়দেবপুরে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রায় একই সময় চট্টগ্রামে ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা ও বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল প্রস্তুতকারী কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। আইয়ুব খানের সরকার করাচী শিপইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, চট্টগ্রামের ড্রাইডক ও হেভী স্টিল ওয়ার্কস এবং নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

শিল্পোন্নয়নের পটভূমি

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মূল অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এ নীতিতে দেশী কাঁচামালের ব্যবহার, দেশী সম্পদ বিনিয়োগ ও অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্রুত শিল্পায়নের উপর জোর দেয়া হয়। বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং এরূপ পুঁজি বিনিয়োগকে কারিগরি জ্ঞানের বাহক হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়। বিদেশী পুঁজি রিনিয়োগকারীদের আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। এ সবের মধ্যে ছিল পুঁজি ও মুনাফা স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার, বিদেশী কারিগরি লোকদের বেতন স্বদেশে প্রেরণের (remittance) সুবিধা এবং তাদের জন্য আয়কর মওকুফ। এসময় সমগ্র শিল্পখাত বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যেখানে বেসরকারী খাত বিনিয়োগে আগ্রহী নয়, কেবল সেখানে সরকারী বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ ছিল বিধায় এখানে নয়া পুঁজি বিনিয়োগকারী সৃষ্টির জন্য Progressive disinvestment নীতি প্রবর্তন করা হয়।

১৯৫৮ সালের পূর্বে আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পের ধারণা ব্যাপকতা লাভ করেনি। আইয়ুব খানের সরকার দেশে বেশ কিছু হস্তচালিত তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক শিল্প এস্টেট স্থাপন

www.pathagar.com

করা হয়। উভয় প্রদেশের মধ্যে এবং প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য শিল্প-নীতিতে নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়। সরকার আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়কে একটি শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর দেশের বিভিন্ন অংশে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কম উন্নত এলাকাগুলোতে বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়। উৎপাদনকারী ও ভারী যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হয় এবং ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করা হয়।

শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শিল্প বিভাগ, পুঁজি বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক, পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও পুঁজি বিনিয়োগ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ৩০০০ মাইল বাঁধ এবং ৪৩০ টি স্লুইজ গেইট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তারবেলা-মংলা ড্যাম নির্মাণ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কোন সেচ সুবিধা ছিল না। ১৯৬৮ সাল নাগাদ ৪,২৫,৬৪০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৮ সালে মাত্র ৪০ হাজার একর জমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় ছিল। ১৯৬৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩১ লাখ ৮৭ হাজার একরে। এর মধ্যে দীর্ঘ ১৬২০ মাইল উপকূলীয় বাঁধ অন্যতম।

উপকূলীয় বাঁধ ছাড়াও আইয়ুব সরকার গঙ্গা-কপোতাক্ষ বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আধুনিক সেচ পরিকল্পনা। প্রথম পর্যায়ে ১৯৬৮ সাল নাগাদ যশোর ও কুষ্টিয়ার ৬৩ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আসে। দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলে ২ লাখ ৩৩ হাজার একর জমিতে সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। এ আমলে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে ৩৬৮টি গভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি লো-লিফট পাম্প স্থাপন করা হয়। তাছাড়া ১৩৫ মাইল দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র ডান তীরের বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক ৫ কোটি ঘন্টা শ্রম দিয়ে এ প্রকল্পের কাজ ১৯৬৬ সালে শেষ করে। এর ফলে ৫ লাখ ৮০ হাজার একর জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। ডি এন ডি (ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প আইয়ুব খানের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯৬৭ সালে সমাপ্ত এ প্রকল্প

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৫০০০ একর জমি উপকৃত হয়। কৃষি উন্নয়নের জন্য উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ছাড়াও পানি সম্পর্কে অনুসন্ধান, মাটি ও কৃষি জরিপ পরিচালনা, কৃষি গবেষণার ব্যবস্থা এবং বিভিন্নভাবে চাষীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় কৃষি সংক্রান্ত ১২টি অনুসন্ধান ও জরিপ প্রকল্প, ১০টি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় ছিল।

বিদ্যুৎ খাত

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য আইয়ুব সরকারের আমলে প্রায় ৩ ডজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সময়ের মধ্যে ৫০ হাজার কিলোওয়াটের তৃতীয় টারবাইন প্রতিষ্ঠা এবং ১১০ মাইল দীর্ঘ ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ অন্যতম। যমুনা নদীর উপর দিয়ে ১০ মাইল দীর্ঘ পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ এ সরকারের আমলে গৃহীত হয়। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মোট ৪ লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয় এবং তা বাস্তবায়িত হয়। অপরদিকে শিল্প ও গৃহস্থালীর কাজে দ্রুত চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ৩৭ হাজার কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৭৬ মেগাওয়াট। ১৯৬৮ সালে তা ১৫২৫ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পায়। এ সময় বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৪,৯২৫ মাইল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,৪৫৫ মাইলে উন্নীত হয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ থেকে ১৫ লাখে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ছিল মাত্র ৩৩৪ মাইল। ১৯৬৮ সালে তা ৪৪৫৫ মাইলে বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক সম্পদ

১৯৬০ সালে সরকার তৈল ও গ্যাস উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন করে। উক্ত কর্পোরেশন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তৈল ও গ্যাস খনি আবিষ্কার করে। ৭টি গ্যাস খনির মধ্যে ৫টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৫৮ সালে ৭৮৪ মাইল গ্যাস পাইপ লাইন ছিল, ১৯৬৮ সালে তা ২৪০৭ মাইলে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে যেখানে ৪টি শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হত, ১৯৬৮সালে এরূপ শহরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টিতে। এসময় চট্টগ্রাম ও করাচীতে ৩টি তেল শোধনাগার নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক বৈষম্য

১৯৬৮-৬৯ সালে রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়ে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন একটি দলিল প্রকাশ করে এবং তাতে একথা স্বীকার করা হয় যে, অর্থনৈতিক নীতিমালা উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিলেও অর্থনৈতিক উন্নতির সুফলকে সামাজিক ও আঞ্চলিকভাবে বন্টনে উপেক্ষা করেছে। প্রকৃতপক্ষে আইয়ুবের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আইয়ুব খান যদিও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণকে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু আয়ের চাইতে ৩২ শতাংশ বেশী ছিল। পরবর্তী এক দশকে বার্ষিক আয়ের প্রবৃদ্ধির হার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৬.২ শতাংশ আর পূর্ব পাকিস্তানে ৪.২ শতাংশ মাত্র। ১৯৬৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় থেকে ৬১ শতাংশ বেশীতে দাঁড়ায়। এভাবে আইয়ুব শাসনামলে বৈষম্যের শতকরা হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। পরম মানদণ্ডে (benchmark) এ বৈষম্য ছিল আরো বেশী।

আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে সে অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্রতর হয়েছিল তা নিম্নের সারণী থেকে স্পষ্ট হবেঃ

সাল	আমদানী			রপ্তানী বাণিজ্য			ব্যালান্স		
	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	মোট	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	মোট
১৯৫৮-৫৯	৫৫.৩৮	১০২.৪৬	১৫৭.৮৪	৮৮.১০	৪৪.৪৪	১৩২.৫৪	-৩২.৭২	৫৮.০২	২৫.৩০
	(৩৫.০৯	(৬৪.৯১	(১০০)	(৬৬.৪৭)	(৩৩.৫৩)	(১০০)	(১২৯.৩৩)	(২২৯.৩৩)	(১০০)
১৯৫৯-৬০	৬৫.৫৩	১৮০.৫৭	২৪৬.১০	১০৭.৯৬	৭৬.৩০	১৮৪.২৬	-৪২.৪৩	১০৪.২৭	৬১.৮৪
	(১৬.৬৩)	(৭৩.৩৭)	(১০০)	(৫৮.৫৯)	(৪১.৪১)	(১০০)	(-৬৪.৬১)	(+১৬৪.৬১)	(১০০)
১৯৬০-৬১	১০১.৪৫	২১৭.৩২	৩১৮.৭৭	১২৫.৯২	৫৪.২৮)	১৭৯.৯৩	-২৪.৪৭	১৬৩.০১	১৩৮.৮৪
	(৩১.৮৩)	(৬৮.১৭)	(১০০)	(৬৯.৯৮)	(৩০.০২)	(১০০)	(-১৭.৬২)	(+১১৭.৬২))	(১০০)
১৯৬১-৬২	৮৭.২৯	২২৩.৬২	৩১০.৯১)	১৩০.০৬	৫৪.২৮	১৮৮.৩৪	-৪২.৭৭	১৬৫.৩৪	১২২.৫৭
	(২৮.০৮)	(৭১.৯২)	(১০০)	(৬৯.০৫)	(৩০.৯৪)	(১০০)	(-৩৪.৮৯)	(+৩৪.৮৯)	(১০০)
মোট	৩০৯.৬৫	৭২৩.৯৭	১০৩৩.৬২	৪৫২.০৪	২৩৩.০৩	৬৮৫.০৭	-১৪২.৩৯	৪৯০.৯৪	৩৪৮.৫৫
	(২৯.৯৬	(৭০.০৫)	(১০০)	(৬৫.৯৮)	(৩৪.০২)	(১০০)	(-৪০.৮৫)	(+১৪০.৮৫	(১০০)

www.pathagar.com

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল সময়কালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের (৬৮৫ কোটি টাকা ৭ লাখ টাকা) শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান আয় করে। অপরদিকে মাত্র ৩৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান আয় করে। একই সময় পাকিস্তানের মোট আমদানীর (১০৩৩ কোটি টাকা) মাত্র ৩০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে আসে; পক্ষান্তরে রপ্তানি আয়ে মাত্র ৩৪ ভাগ অবদান রেখেও পশ্চিম পাকিস্তান আমদানীর ৭০ ভাগ লাভ করে। রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থার পাশাপাশি রাজস্ব আয়েরও একটি বৃহৎ অংশ কেন্দ্রীয় খাতের নামে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে স্থানান্তর করা হয়। কখনও কখনও মোট রাজস্ব আয়ের অর্ধেক অর্থই পূর্ব পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যায়।

রাজস্ব বাজেট

আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দেন। তাঁর শাসন আমলের প্রথম বছরেই আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৬৩.৭১ ভাগ বেশী রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় খাত ও প্রাদেশিক খাত উভয় ক্ষেত্রেই রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হলেও, প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় খাতের তুলনায় প্রাদেশিক খাতে বেশী বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় খাতের রাজস্ব অনেক বেশী বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় খাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে তা শতকরা ৪৮২.৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩ কোটি ১১ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রাদেশিক খাতে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। ১৯৬৮-৬৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকায় অর্থাৎ বৃদ্ধির হার শতকরা ২৭৯.৮৭ ভাগ।

বর্ণিত উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আইয়ুবের দশ বছরে প্রদেশিক ও কেন্দ্রীয় খাতের উভয় ক্ষেত্রে কর ও রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সার্বিকভাবে ১৯৫৭-৫৮ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব ও কর সংগ্রহ করা হয়েছিল ৩৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে তা ১৪২ কোটি ৭৬ লাখ টাকায় বৃদ্ধি পায়। ১০ বছরে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩২৮.১৯ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় বিপুলভাবে বাড়ানো হলেও ১৯৬৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত অর্থ পরিপূর্ণভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থও এখানে ব্যয় করা হয়নি। ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব আয়ের তুলনায় ৫৩ কোটি টাকা কম ব্যয় করা হয়।

www.pathagar.com

শিল্পোন্নয়নে বৈষম্য

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং বার্ষিক রাজস্ব বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষিত না হলে ও শিল্পক্ষেত্রে আইয়ুব সরকারের আমলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে এসময় শিল্পোন্নয়নের গতি আরো বেশী ছিল। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম বছরেই ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করে। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নের জন্য মোট ৮১১ কোটি টাকা ১১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। অবশ্য একই সময়ের পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোয়নের জন্য দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করা হয়। এ পাঁচ বছরে পাকিস্তানের শিল্পায়নে সরকারী খাতে ব্যয় করা হয়েছিল ২,৩৯৯.৯০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৩৩.৭৯ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৬৬.২১ শতাংশ ব্যয় হয়। উল্লেখ্য যে, এসময়ে পাকিস্তানে বিনিয়োগের শতকরা ৬৩.৭২ ভাগ ব্যয় হয় নির্মাণ খাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একই খাতে শতকরা ৫৩.৯৫ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে যন্ত্রপাতি ও কলকজার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশী ছিল। অবশ্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানকেও ছাড়িয়ে যায়। তবে বেসরকারী খাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ বেশী হয়।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, তৃতীয় পাঁচ সালা পরিকল্পনায় মোট ১২৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়; তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পায় ৬৯০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তান পায় ৫৮৭ কোটি টাকা। বন্টনের হার ছিল যথাক্রমে ৫৪.৩% ভাগ ও ৪৫.৯৭%। এসময় শিল্পের উন্নয়নে সরকারী খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৪৭ কোটি টাকা এবং তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ৬৯.৩৫% ভাগ ও পশ্চিম পাকিস্তান পায় ৩০.৬৫%। বেসরকারী খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৩০ কোটি যার ৪৫.৭৮% ভাগ পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৫৪.২২% ভাগ পায় পাকিস্তান। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পকিস্তানে শিল্পপণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

কৃষি উন্নয়ন

স্বাধীনতাত্তোর কালে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশ মোটামুটি সমমাত্রা নিয়ে কৃষি উৎপাদন শুরু করে। তবে শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে শর্করা জাতীয় ফসল এবং

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থকরী ফসল বেশী উৎপাদিত হত। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর পাকিস্তানের উভয় অংশেই কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য গতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত প্রথম চার বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ৫ কোটি ৮৪ লাখ ১২ হাজার টন ফসল উৎপাদিত হয় যা পূর্ববর্তী চার বছরের চেয়ে শতকরা ১৭.৪২ ভাগ বেশী। এর মধ্যে শুধু শর্করা জাতীয় খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ২৪.৫৭ ভাগ। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত হয় ৮ কোটি ৩৬ লাখ ৩৫ হাজার টন ফসল এবং তা পূর্ববর্তী চার বছরের তুলনায় শতকরা ২৪.৩৩ ভাগ বেশী। লক্ষণীয় যে সামগ্রিক উৎপাদনে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশী। পরবর্তী চার বছরে অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সময়কালে পূর্ব পকিস্তানের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ আগের চার বছরের চাইতে ২৫.৬০% বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৩৩ লাখ ৬৭ হাজার টনে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম অর্থকরী ফসলের উৎপাদনও উচ্চমাত্রায় পৌছায়। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদন আগের চার বছরের তুলনায় ৪৩.৩০% ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৯৮ লাখ ৯১ হাজার টনে পৌছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা সরকারের স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক নীতির কারণে। কিন্তু সরকারী বাজেট বরাদ্দ বহির্ভূত আরো কিছু খাতে বৈষম্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে যা পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চাৎপদ থাকার অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। যেমন ব্যাংক বীমা ও আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল এর মত বরাদ্দ বহির্ভূত দুটো খাতে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত মোট ৬০৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হতো না। কিন্তু এসব খাতে পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে কখনোই ২৫% ভাগের বেশী ব্যয় করা হয়নি। তবে "পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এত সব বৈষম্য সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ষাটের দশকে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সূচিত হয়। এ সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে মোট জাতীয় উৎপাদন, বিনিয়োগের পরিমাণ ও জাতীয় সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে; বৈদেশিক পুঁজিও এসময়ে উল্লেখযোগ্য হারে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে থাকে। মোটকথা, জাতীয় উৎপাদন ও সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য করলে ষাটের দশকে পূর্ব পকিস্তানে বেশ ভাল ধরণের অগ্রগতি হয়েছিল"। (লেনিন আজাদ, ১৯৯৭)

১৯৫৯-৬০ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে স্থায়ী মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ৪৫১ কোটি ৭০ লাখ

www.pathagar.com

টাকা এবং একই সময়ে মোট পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় ১৮৬৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা অর্থাৎ মোট পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯.১১ ভাগ। মোট পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে স্থায়ী মূলধন বিনিয়োজিত হয়েছে শতকরা ৯১.৩০ ভাগ এবং পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান খাত ছিল ভারী শিল্প। এ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজির আন্তঃ প্রবাহের নীট পরিমাণ ছিল মোট ৩৯৮ কোটি ১০ লাখ টাকা। ফলে নীট জাতীয় বিনিয়োগ হয়েছে ১৪৬৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা যা মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৭.১৭ ভাগ। বিনিয়োগের এ হার নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির হার (growth rate) নির্দেশ করে। বছর ভিত্তিক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে পরবর্তী প্রতি বছর অগ্রগতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে বাইরে থেকে পুঁজি এসেছিল মাত্র ৪.২০ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে তা ৫৬.৮০ কোটিতে পৌছায় অর্থাৎ ১০ বছরে বৃদ্ধির হার ছিল ১৩ গুণেরও বেশী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এসময় পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক বিনিয়োগের পরিমাণ বিন্দুমাত্র হ্রাস না পেয়ে শতকরা ১৪১.৪৭ ভাগ বেড়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় বিনিয়োগের হারও কমেনি, বরং তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা ১০.১১ ভাগে এসে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন কিন্তু বিদেশী পুঁজিনির্ভর হয়ে পড়েনি, বরং তাতে দেশীয় পুঁজির প্রভাব ছিল সর্বদাই। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫৯-১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির পরিমাণ ছিল ২০০৫.৪৩ কোটি টাকা; এর মধ্যে বৈদেশিক পুঁজি ছিল মাত্র ১৯.৮৫% ভাগ; অবশিষ্ট ৮০.১৫% ভাগই এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানের সঞ্চয় থেকে অর্থাৎ প্রাদেশিক সঞ্চয় থেকে বৈদেশিক পুঁজি অপেক্ষা চারগুণ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এ ১১ বছরে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির বার্ষিক গড় ছিল ১১.৩৫% ভাগ। একথা উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের ২৫ বছরে (১৯৪৭-৭১) পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার সার্বিকভাবে বেশ নিম্ন মাত্রায় থাকলেও আইয়ুব শাসনামলে ১৯৫৮ থেকে অতীতের নেতিবাচক প্রবণতাকে অতিক্রম করে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তর ঘটে।

•

প্রবৃদ্ধির হার

১৯৫৮-৫৯ সালে পূর্বে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার ছিল হতাশাব্যঞ্জক। মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ২৬২.৩০ টাকা। ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক ৭.১৩% ভাগে উন্নীত হয় এবং মাথাপিছু আয় বেড়ে গিয়ে ৩০০ টাকায় উপনীত হয়। বিশ্লেষকদের মতে, আইয়ুব আমলে পূর্ব পাকিস্তানের

www.pathagar.com

সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে আইয়ুব খান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সাথে আইয়ুব খাঁন

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। তবে এ প্রবৃদ্ধি থেকে সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হয়েছে তারা সে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কেননা পূর্ব পাকিস্তনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কৃষি উৎপাদনে যে অগ্রগতি হয়েছিল তা সন্তোষজনক ছিল না। এর ফলশ্রুতিতে এ সময় সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় নি। খাজনা-ট্যাক্স বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুতপক্ষে আইয়ুব আমলে গ্রামের চাইতে শহরাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ বেশী হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব আমলে উল্লেখযোগ্য হারে শিল্পোন্নয়ন ঘটলেও এখানকার বাঙালীরা শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে নি। অবাঙালী শিল্পপতিগণ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পের শতকরা ৪৭% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। পূর্ব বাংলার শিল্পপতিরা মাত্র ২৬% ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (EPIDC) বাকী ৩৪% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৭২% ভাগেরই মালিক ছিল অবাঙালীরা। এমন কি চা বাগানের ১৯% ভাগের মালিকানাও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য সার্বিকভাবে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত ছিল। আমদানি বাণিজ্যের শতকরা ৯৩% ভাগ তারা নিয়ন্ত্রণ করতো। একমাত্র মেমন সম্প্রদায়ের হাতেই ৫৭% ভাগের নিয়ন্ত্রণ ছিল। আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেও পূর্ব বাংলার ব্যবসায়ীদের কোন প্রভাব ছিল না। আমদানি বাণিজ্যের সামান্য কিছু লাইসেন্স পেলেও তার অধিকাংশই তারা পুঁজির অভাবে অবাঙালী বিত্তবান ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত। এ ধরনের বাঙালী লাইসেন্সধারীদের ৯৫% ভাই ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এমনি পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্যেও অবাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল। শুধুমাত্র পাট রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার ব্যবসায়ীরা ৩৩% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা ২৩% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। অবশিষ্টাংশ সরকারী সংস্থার আয়ত্ত্বে ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংক বীমাও পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আইয়ুব আমলে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংকসমূহে যে পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছিল তার ৭০% ভাগই ছিল অবাঙালী মালিকদের ব্যাংকসমূহে। বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রভাব ছিল সর্বজনবিদিত।

বস্তুতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের তো বটেই এমন কি সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর হাতে গোনা কতিপয় ব্যবসায়ী পরিবারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য এরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল সম্পদ করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৬২ সালে ৪৩ টি পরিবার পাকিস্তানের সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের শতকরা ৭২.৮% ভাগের মালিক ছিল। ঐ পরিবারগুলো পূর্ব পাকিস্তানের ৪৫.১% ভাগ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, ঐ ৪৩ টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ১ টি পরিবার ছিল পূর্ব বাংলার। এ, কে, খানের ঐ পরিবার ছিল উক্ত ৪৩ জনের ২৯ তম। পূর্ব পকিস্তানের মোট শিল্প সম্পদের ৪.৩% ভাগ ছিল এ,কে, খান পরিবারের অর্থাৎ বাকী ৪০.৮% ভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ৪২ টি পরিবারের মালিকানাধীন। পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় যে সকল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলো ছিল তাদের সম্পত্তির ৭৫.৬% ভাগই ছিল উক্ত ৪৩ জনের মধ্যে ১৪ জনের মালিকানায়। এ, কে, খান পরিবার ছিল মাত্র ২% ভাগের মালিক।

"ষাটের দশকের শেষদিকে এসে যদিও পূর্ব পাকিস্তানে বেশ দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন হয়েছে এবং তার ফলাফল হিসেবে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশ বেড়ে গেছে। কিন্তু এ সকল শিল্প সম্পদের মালিকানা কিংবা বাড়তি আয়ের অংশীদার খুব অল্প সংখ্যক বাঙালীরা হতে পেরেছে। অন্যদিকে অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করে পশ্চিম পাকিস্তানকে তারা তাদের স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের বাইরেও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু এ সকল অবাংগালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অধিকাংশেরই স্থায়ী বাসস্থান শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না, তারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থও পশ্চিম পাকিস্তানে জমা করতো। তারা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়তি মুনাফা অর্জনের জন্যই শুধু পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল। তবে এদের মধ্যে দু'চার জন অবাঙালী শিল্পপতি বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস শুরু করে, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানই তাদের মূল বাড়ি-ঘর ছিল এবং তাদের পরিবার-পরিজন সেখানেই থাকত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিনিয়োজিত পুঁজি থেকে অর্জিত মুনাফার অংশ পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োজিত হত না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদের মুনাফার উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়মিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতো। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল ইস্পহানী পরিবার যারা অবাঙালী হয়েও পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রস্থল পূর্ব পাকিস্তানে থাকায় ঐ পরিবারের অর্জিত মুনাফারও একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। ষাটের দশকে এসে পূর্ব পাকিস্তানে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সেখানকার বাঙালী জনসাধারণের কাছে ছিল একটি নির্মম তামাশার শামিল। কারণ এতে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের তেমন কোন উন্নতি হয়নি।

www.pathagar.com

কেননা সাধারণত উন্নতির সাথে সাথে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনে এসময় সুযোগ-সুবিধা সামান্যই বাড়ে।" (লেলিন আজাদ, ১৯৯৭)

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "মার্শাল ল, সামরিক বিপ্লব ও ব্যক্তিগত ডিক্টেটরশীপের কোনটাই নির্ভেজাল অভিশাপ নয়। অনেক সময় ঐসবের দ্বারা পরিণামে দেশ ও দেশবাসী জনসাধারণের উপকার হইয়া থাকে। রাজতন্ত্র ও ডিক্টেটরশীপের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধরনের বিপ্লব সর্বদাই দেশের কল্যাণ করিয়া থাকে, তাতে দ্বিমত নাই। তাছাড়াও শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র ও সামাজিক অর্থনীতিক কাঠামো বদলাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লব হইলেও তা দেশের মংগল সাধন করিতে পারে। আইয়ুব সাহেব যদি মোটামুটি দেশের কল্যাণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁর গোড়ার ক্ষমতা দখলের অন্যায় ও বেআইনী কাজটাও জনসাধারণ ও ইতিহাসের বিচারে ভালো কাজ বিবেচিত হইবে।"

"আগে-তার ভালো কাজগুলিই উল্লেখ করা যাক। তিনি (১) পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার নীতির অবসান করিয়াছেন; (২) এক বিবাহকে কার্যত বাধ্যতামূলক করিয়াছেন; (৩) দুই পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন; (৪) রেলওয়ে প্রদেশকে দিয়েছেন; (৫) কয়েকটি নিখিল পাকিস্তানীয় অর্থ-বন্টন প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন; (৬) শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনকে দুই প্রদেশের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছেন; (৭) পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করিয়া উভয় পাকিস্তানের নিম্নস্তরের স্বায়ত্তশাসনকে একই প্যাটার্নের করিয়াছেন; (৮) জাতীয় শিপিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন; এবং (৯) সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করিয়া বৈদেশিক নীতিকে সুসংহত করিয়াছেন।"

"আইয়ুবের দুর্ভাগ্য এই যে, যে দৃষ্টিশক্তির জোরে তিনি জনগণের অদৃশ্য যোগ্যতা অবিষ্কার করিতে পারিলেন, তার জোরে তিনি নিজের অনুচরদের সুস্পষ্ট যোগ্যতা দেখিতে পারিলেন না। স্পষ্টতই তাঁর লং সাইটের মত শর্ট সাইটটা তেজী না। গোড়ায় তিনি পাকিস্তান রক্ষার জন্য নয়, বরং ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোভেই, পদাধিকারের অপব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ক্ষমতা দখলের পরে তিনি সত্য-সত্যই দেশের ভাল করিতে পারিতেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ও

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা ছিল। একাদিক্রমে আট বছর পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি এবং ঐ সংগে প্রায় বছর খানেক দেশরক্ষা মন্ত্রী থাকার ফলে তাঁর একটা আন্তর্জাতিক 'পুল' গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সংগে তিনি একটা ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী ছিলেন। এতসব গুণের অধিকারী হইয়াও কোন লোক নির্বিঘ্নে দশ বছর দেশ শাসন করার সুযোগ পাইলে তিনি ভাল না হইয়া পারেন না। গোড়ায় যতই খারাপ হউন, মহান দায়িত্বই তাঁকে মহৎ করিয়া তুলে। আইয়ুবের দোষ এইখানে যে তিনি দশ-দশটা বছরেও মহৎ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। 'ক্ষমতা মানুষেকে খারাপ করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবেই খারাপ করে'- লর্ড একটনের এই কথাটা আইয়ুব আগেই জানিতেন নিশ্চয়ই। তাঁর মত বুদ্ধিমান বিদ্বান লোকের পক্ষে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হওয়া উচিৎ ছিল না। তিনি বলিবেনঃ তাঁর স্বার্থপর স্তাবকেরা তাঁহাকে ভাল হইতে দেন নাই। তাঁর এতদিনের পূজারীরা বলিবেনঃ আইয়ুবকে সুবুদ্ধি তাহারা দিয়াছিলেন; আইয়ুব তাহাদের পরামর্শ মানেন নাই।"

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর আইয়ুবের ভাবমূর্তি জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে হ্রাস পেতে থাকে। তাসখন্দ চুক্তির ব্যাপারে অসন্তোষ, পূর্ব-পাকিস্তানে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধূমায়িত ক্ষোভ ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি সব মিলিয়ে আইয়ুবের ক্ষমতার ভিত্ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন এবং তা প্রদেশের মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

"যে সময় ৬ দফা কর্মসূচী প্রদান করা হয় তখন পূর্ব বাংলায় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, বাঙ্গালীদের অসংখ্য ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠেছে, ছোট ও মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি শ্রেণীগত আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীদের সাথে বাঙ্গালি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্ক-বীমার ক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি জনসাধারণের অসংখ্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আন্তঃআঞ্চলিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথেও কিছু কিছু বাঙ্গালী পরিবার যুক্ত হতে শুরু করেছে। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীরা ছিল অবাঙালীদের অধীনস্ত ও দুর্বল। পক্ষপাতদুষ্ট সরকারি নীতি বাঙালীদের এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। বাঙালীদের আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। চাকরি, ব্যবসা কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠায় যেমন অবাঙালীদের আধিপত্য ছিল, তেমনই রাজনীতি ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীদের ছিল অবাধ ক্ষমতা। আর সমাজ ব্যবস্থা আমলাতন্ত্র দ্বারা এত প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রিত হত যে, পূর্ব পাকিস্তানের সরকার চাইলেও উক্ত আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা

www.pathagar.com

কিংবা হস্তক্ষেপের কারণে তা সে কার্যকরী করতে পারত না। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতিনিধি। তাদের নিজস্ব কোন স্বকীয়তা ছিল না। এরা ছিল ভীষণভাবে বাঙালী স্বার্থের বিরোধী ও গণনিপীড়ক। সমাজের ওপর যে অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া শোষণ চলছিল তাকে নিরাপত্তা দান করাই ছিল এ সরকারের প্রধান কাজ। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী কোন ভূমিকা গ্রহণ করা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবে সে সময়ের গঠনতন্ত্রের অধীনে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিকাশের কোন সম্ভাবনা নেই-একথাটি সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এরকম একটি পর্যায়ে শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচি ব্যাপক সাধারণ মানুষের চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। ৬ দফা কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে কোন দাবি না থাকলেও যেহেতু তারা অবাঙালী মালিক ও কর্মকর্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছিল সেহেতু তারা এ কর্মসূচীর মধ্যে কিছু আশার আলো দেখতে পায়। বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তরের দাবি ৬ দফাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে খোদ কৃষক-জনতাও এ কর্মসূচীর মধ্যে নিজের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পেয়েছিল। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, ৬ দফা কার্যকরী হওয়ার অর্থই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান। কেননা ৬ দফায় মুদ্রার মত বিষয়কেও প্রাদেশিক সরকারের আওতায় নেওয়ার কথা বলায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বৃত্ত পাচারের বৈধ পথের অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল-যা কেন্দ্রীয় সরকারের তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তিকেই বিনষ্ট করে দিতে পারে। এ আশংকা থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধি জেনারেল আইয়ুব খানের সরকার ৬ দফা কর্মসূচীকে খুবই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং ৬ দফা কর্মসূচীর প্রণেতা শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করে। মাওলানা ভাসানী এক বিশাল কর্মী বাহিনী নিয়ে কৃষকদের আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। খাজনা, ট্যাক্স, জমির উপর সার্টিফিকেট মামলা জারি, জোতদারী-মহাজনী শোষণ, হাট ও ঘাটকে কেন্দ্র করে ইজারাদারী শোষণ, জলাভূমিকে কেন্দ্র করে ইজারাদারী ও মহাজনী শোষণ, অর্থকরী ফসলের মূল্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কোথাও কোথাও এসব আন্দোলন জঙ্গী রূপ লাভ করে।" (লেনিন আজাদ, ১৯৯৭)

www.pathagar.com

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তান জুলফিকার আলী ভূট্টোও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করার জন্য কিছু জেনারেলের মদদ লাভ করেন। ভূট্টো প্রধানতঃ তাসখন্দ চুক্তির জন্যই আইয়ুবকে অভিযুক্ত করতে থাকেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে আইয়ুব খানকে অপহরণ ও হত্যার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে জড়ানো হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা বিশ্বাস করেনি। বরং এতে করে শেখ মুজিব বাঙালীদের কাছে জাতীয় বীরের মর্যাদা পান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঘোষণার পর পরই আইয়ুব খান মারাত্মক রোগ আক্রান্ত হন। দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি ঐবছরের গ্রীষ্মকালে লন্ডনে যান মেডিক্যাল চেক আপের জন্য।

১৯৬৮ সালের ৭ নভেম্বর রাওয়াল পিন্ডিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ফলে পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্রের মৃত্যুর পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন প্রচণ্ড রূপ লাভ করে। সর্বস্তরের মানুষ এ আন্দোলনে যোগ দেয়। পূর্বপাকিস্তানে এ আন্দোলন শুধু আইয়ুব কিংবা তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ রইলো না, বরং বাঙালীরা যাকে ভাবতো পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাঞ্জাবীদের 'আধিপত্য' তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিণত হল। পশ্চিম পাকিস্তানে যখন সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম শুরু করলো, বাঙ্গালীরা তখন পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তথা শেখ মুজিবের ছয় দফা বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার হল। দেশের এরূপ জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৮টি রাজনৈতিক দল ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (Democratic Action Committee) 'ডাক' গঠন করে। ডাক ৮ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনের সূচনা করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে থাকে। এদিকে ছাত্র সংগঠনগুলো ১১ দফার ভিত্তিতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে। ছাত্রদের ১১ দফার মধ্যে আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ন্যাপের ১৪ দফা এবং ছাত্রসমাজের ১৭দফা দাবীর সমন্বয় ঘটে।

আইয়ুব খান ডাক এর চেয়ারম্যান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের আহ্বান করেন। ডাক নেতৃবৃন্দ-এর জবাবে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালীন সময় হতে জারীকৃত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, প্রতিরক্ষা আইন বাতিল, আটককৃত ছাত্রদের মুক্তিদান এবং জনসভা ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান। আইয়ুব খান কিছুটা কৌশলগত বিলম্বের পর দাবীগুলো মেনে নেন। এসময় শেখ মুজিব ও ভুট্টো কারাগারে। মাওলানা ভাসানী আইয়ুবের সাথে কোন আলোচনার বিরোধিতা

www.pathagar.com

করেন। প্রতিরক্ষা আইন প্রত্যাহার করা হলে ভুট্টো মুক্তি পান। তিনিও আইয়ুবের সাথে আলোচনায় আগ্রহী হননি। শেখ মুজিবের ব্যাপারটা ছিল জটিল। তাঁকে মুক্তি দিতে হলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে হয়। কিন্তু সামরিক জেনারেলরা তার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন এতটা প্রবল এবং মুজিবের অনুকূলে ছিল যে তাঁকে অবহেলা করার সুযোগ আইয়ুবের ছিল না। এদিকে আইয়ুব খান বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিতে রাজী হলেন। শেখ মুজিবও তৈরি হন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণের আগে তার পূর্ণ মুক্তি দাবী করলেন। বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন এবং মুজিব বৈঠকে যোগ দিতে রাওয়ালপিন্ডি যান। আইয়ুব মুজিবের মধ্যে বোঝাপড়ার কঠিন প্রচেষ্টা চলে। প্রেসিডেন্ট ভবনে আইয়ুব খান ও শেখ মুজিবের মধ্যে গোপন বৈঠক হয়। এসংবাদ জানাজানি হয়ে গেলে ভুট্টো ও ভাসানী তার প্রতিবাদ করেন এবং ভাসানী 'জ্বালাও পোড়াও' বাণী এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহবান জানান। কোন চুক্তি ছাড়াই গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় আইয়ুব খান সংসদীয় ও ফেডারেল পদ্ধতি বহাল ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো তা মেনে নেয়নি। এরপর দেশের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

১৯৬৯ সালের মার্চের মাঝামাঝি আইয়ুব খান তাঁর মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক ডাকেন। এতে তিনি সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে এ বৈঠকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মন্ত্রিসভা এবং বিশেষভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে বলেন যে, দেশকে রক্ষার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সামরিক আইন জারী করা। এসময় সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইয়াহিয়ার উপর। ইয়াহিয়া ইংগিত দেন যে, তিনি নিজে প্রেসিডেন্টের সাথে একাকী আলাপ করবেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মন্ত্রিসভার বৈঠক চিরতরে মুলতবী হয়ে যায়। দুই পুরাতন বন্ধু আইয়ুব ও ইয়াহিয়া একান্তে আইয়ুবের দপ্তরে বৈঠক করেন। আইয়ুব খানের প্রস্তাবমত জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক আইনই সংকটের একমাত্র সমাধান বলে সামরিক আইন জারীর সিদ্ধান্ত নেন।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

২. কমরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৩. কীথ ক্যালার্ড, পাকিস্তান-এ পলিটিক্যাল স্টাডি, লন্ডন ঃ জর্জ এলেন এন্ড উনউইন, ১৯৫৭।

৪. জি. ডব্লিউ. চৌধুরী, ডেমোক্র্যাসি ইন পাকিস্তান, ঢাকাঃ লংম্যান, ১৯৬৩।

৫. ------,কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান, লন্ডনঃ লংম্যান, ১৯৫৯।

৫. -----, ডকুমেন্টস এন্ড স্পীসেস অন পাকিস্তান কনস্টিটিউশন, ঢাকা, ১৯৬৩।

৬. -----, অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি, ঢাকাঃ হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১।

৭. বদরুদ্দীন ওমর, পলিটিকস এন্ড সোসাইটি ইন ইস্ট পাকিস্তান, ঢাকা ঃ মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪।

৮. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৮।

৯. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

১০. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা, ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্র, ১৯৮৭।

১১. মোহাম্মদ আইয়ুব খান, ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস, লাহোরঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭।

১২. লেনিন আজাদ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,১৯৯৭।

১৩. জগলুল আলম, বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-১৯৮৯, ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০।

১৪. এমাজুদ্দিন আহমেদ, বুরোক্র্যাটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ: বাংলাদেশ এন্ড পাকিস্তান, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,১৯৮০।

১৫. জিরিং লরেন্স, দি আইয়ুব খান এরা: পলিটিকস ইন পাকিস্তান ১৯৫৮-১৯৬৯, সাইরাকিউস: সাইরাকিউস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১।

www.pathagar.com

১৬. উইনি. এ. উইলকক্স, এ ডিকেড অব আইয়ুব, এশিয়ান সার্ভে,ভল্যুম-৯, ১৯৬৯।

১৭. বদরুদ্দীন ওমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আনোদালন ও তৎকালীন রাজনীতি, কোলকাতাঃ আনন্দধারা, ১৯৭১।

১৮. রেহমান সোবহান, বেসিক ডেমোক্র্যাসিস, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ, ১৯৬৮।

১৯. কে.বি.সাঈদ, পাকিস্তান: দি ফরমেটিভ ফেইজ, ১৮৫৭-১৯৪৮, লন্ডনঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

২০. ------, দি পলিটিক্যাল সিস্টেম অব পাকিস্তান, বোস্টনঃ হাউটন মিফলিন, ১৯৬৭।

২১. ------, "পাকিস্তান"স বেসিক ডেমোক্রাসি", মিডল ইস্ট জার্নাল, ভল্যুম-১৫, ১৯৬১।

২২. তালুকদার মনিরুজ্জামান, "ক্রাইসিস ইন পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড দি কলাপস অব দি আইয়ুব রেজিম," দি জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াস, ভল্যুম-৫, ১৯৭১।

২৩. রওনক জাহান, পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭২।

২৪. মাহবুবুল হক,দি স্ট্র্যাটেজি অব ইকোনোমিক প্ল্যানিং: এ কেইস স্টাডি অব পাকিস্তান, করাচীঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩।

২৫. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৬০-৬৫, করাচী, ১৯৬১।

২৬. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন, রিপোর্ট অব দি প্যানেল অব ইকোনোমিস্ট অন দি সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ১৯৬০-৬৫, করাচী, ১৯৬১।

২৭. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন,গাইড লাইনস ফর দি থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, করাচী, ১৯৬৩।

২৮. পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন, প্রিলিমিনারী ইভাল্যুশন রিপোর্ট অব দি প্রোগ্রেস ডিউরিং দি সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ১৯৬৫।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

"আপনারা যদি পূর্ব পাকিস্তানের এই হায়াত-মউতের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হন তাহা হইলে পূর্ব-পাকিস্তানকে 'তালাক' দিন, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৬ কোটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে দিন; নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করিতে দিন।"

-মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

জন্ম	ঃ	১৮৮০ সাল।
জন্মস্থান	ঃ	ধনপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
পিতা	ঃ	হাজী শরাফত আলী খান।
শিক্ষা	ঃ	প্রাথমিক শিক্ষা ধনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।
	❑	সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায় কিছুকাল লেখাপড়া।
	❑	দেওবন্দ মাদ্রাসায় কিছুকাল লেখাপড়া।
কর্ম জীবন	ঃ	কাগমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে কর্ম জীবন শুরু।
	❑	ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটস্থ কলা গ্রামের মাদ্রাসায় শিক্ষকতা। এখানে তাঁকে মওলানা টাইটেল প্রদান।
	❑	১৩১১ বাংলা সনে আসামের জলেশ্বরে সুফী দরবেশ শাহ্ আবদ-আল নাসের আলী বোগদাদীর মুরীদ হন এবং তাঁর সান্নিধ্যে তিন-চার বছর কাটান। বাহাদুরাবাদ স্টীমার ঘাট মসজিদের ইমাম।
বিবাহ	ঃ	পাঁচবিবির বীর নগরের জমিদার সামির উদ্দিন চৌধুরীর কন্যা আলীমা খাতুনকে বিবাহ ও শ্বশুরের জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন।
রাজনৈতিক জীবন	ঃ	১৯১৯ সালে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে যোগদান।
	❑	উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ বন্যার সময়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা উপলক্ষে নেতাজী সুভাষ বসুর সংগে পরিচয়।
	❑	টাংগাইলের সন্তোষ ও কাগমারী পরগনার জমিদার কর্তৃক দরিদ্র কৃষকদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী কৃষকদের সংগঠিত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জমিদার ও বৃটিশ সরকার মওলানাকে টাংগাইল ত্যাগের নির্দেশ দেয়।
	❑	১৯২৮ সালে জমিদার ও বৃটিশ সরকারের রোষানল থেকে রক্ষার জন্য আসামের ঘাগমারার গভীর জংগলে বসবাস শুরু।
	❑	কিছুকাল পরে ধুবড়ী মহকুমার ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে অবস্থিত ভাসান চরে গমন করেন।

www.pathagar.com

- ১৯৩৬ সাল থেকে আসামে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন।
- ১৯৩৭ সালে টাংগাইলের জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন ও সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।
- ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান এবং আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত।
- ১৯৪৭ সালে আসামের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গ্রেফতার ও ১৯৪৮ সালে মুক্তি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আগমন।
- ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত হন
- ১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর পাকিস্তান সরকার গ্রেফতার করেন।
- ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে গ্রেফতার।
- ১৯৫৩ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট গঠন।
- ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়।
- ১৯৫৪ সালে কম্যুনিস্ট পরিচালিত আন্তর্জাতিক শান্তি কমিটির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নির্বাচিত।
- ১৯৫৪ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত কম্যুনিস্ট আয়োজিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর।
- ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত।
- ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার কর্তৃক গ্রেফতার।
- ১৯৬৩ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে গণচীনে গমন।
- ১৯৬৪ সালে হাভানায় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান।
- ১৯৬৮-৬৯ সালে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন।
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বর্জন।
- ১৯৭১ সালে ভারতে গেলে ভারত সরকার কর্তৃক গ্রেফতার এবং স্বাধীন হলে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন।
- ১৯৭৩ সালে খাদ্য সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা অবনতির জন্য অনশন ধর্মঘট পালন।
- ১৯৭৩ সালে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান ও হরতাল পালনের ডাক দেন।
- ১৯৭৪ সালে হুকুমতে রব্বানীয়া সমিতি গঠন।
- ১৯৭৪ সালের ২৩ জুন ঢাকায় গ্রেফতার এবং টাংগাইলের সন্তোষে অন্তরীণ জীবনযাপন।
- ১৯৭৬ সালের সালে ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চে নেতৃত্ব দান।
- ১৯৭৬ সালে খোদায়ী খেদমতগার দল গঠন করেন।

বিশেষ অবদান ঃ টাংগাইলের সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল কলেজ, বালিকা বিদ্যালয় ও শিশু মিলনায়তন, কাগমারীতে প্রতিষ্ঠিত মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, পাঁচবিবিতে নজরুল ইসলাম কলেজ, আসামে প্রতিষ্ঠিত ৩০ টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মৃত্যু ঃ ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৬ ইং

মাজার ঃ সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

১৯১৯ সালে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ফিরে এসে কিছুকাল ময়মনসিংহ জেলার কাগমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। জনসাধারণকে কথার মাধুর্য দিয়ে সহজেই জয় করতে পারতেন। তিনি স্বভাবগতভাবে ছিলেন প্রতিবাদী চরিত্রের। যেখানেই অন্যায় দেখতেন, তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করতেন।

এসময় সন্তোষ ও কাগমারী পরগনার জমিদারদের অত্যাচারে কৃষকরা ছিল দিশেহারা। তারা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। মাওলানা ভাসানী কৃষকদের পক্ষ হয়ে জমিদারদের নায়েব, গোমস্তা প্রমুখের সংগে লড়াই করতে থাকেন। তিনি কৃষকদের সুদ মওকুফের জন্য মহাজনদের সাথে দেন-দরবার শুরু করেন। এতে জমিদারদের নায়েব ও মহাজনরা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করায়। মাওলানা ভাসানী নিরুপায় হয়ে ঐ এলাকা ত্যাগ করে হালুয়াঘাটের নিকটস্থ কলা গ্রামে সুফী সাধক শাহ আবদ-আল নাসের আলী বোগদাদীর মাদ্রাসায় পরিচয় গোপন রেখে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। দেওবন্দে লেখাপড়া করেছেন জেনে ছাত্ররা তাঁকে 'মাওলানা' টাইটেল দেয় এবং ছাত্রদের দাবীর ফলে তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে থাকাকালে তিনি আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত জলেশ্বরে অবস্থানকারী সুফী দরবেশ শাহ আবদ-আল নাসের আলী বোগদাদীর বিভিন্ন কেরামতি সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি তাঁর কাছে গমন করেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের পর তাঁর মুরীদ হন। এর পরবর্তী ৩-৪ বছর তিনি পীর সাহেবের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন।

১৯১৯ সালে সমগ্র ভারতে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে মওলানা ভাসানী এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এসময় তিনি ভারতের বহু স্থান সফর করেন। মওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানরা যখন খিলাফত আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল, তখন তুরস্কে মোস্তফা কামাল পাশা খিলাফত বিলুপ্ত করে। ফলে ভারতে খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

খিলাফত আন্দোলন থেমে গেলে মওলানা ভাসানী কোন নেতার পক্ষ থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা না পেয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাহাদুরাবাদ স্টীমার ঘাট মসজিদে ইমামতি শুরু করেন। এখানে থেকে সর্বস্তরের জনগণের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। মওলানা বিপন্ন মানবতার সেবা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ দুর্যোগকালে বহু ত্রাণ শিবির খোলা হয় এবং এর নেতৃত্ব দেন নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু। মওলানা এ সময় নেতাজীর সংস্পর্শে

www.pathagar.com

আসেন এবং রাজনৈতিক ও দেশের আজাদী বিষয়ক আলোচনার সুযোগ লাভ করেন। ত্রাণ শিবিরগুলো রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় বৃটিশ সরকার মওলানা ভাসানীসহ অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। ফলে তিনি অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হন।।

আত্মগোপন করার জন্য তিনি বগুড়ার পাঁচবিবি থানার বীর নগরের প্রভাবশালী জমিদার সামিরউদ্দিন চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। মওলানা ছিলেন জমিদার বিরোধী। কিন্তু সামির উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। মওলানা ভাসানী জমিদার সাহেবের সাথে জমিদারদের শোষণ-অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করেন। সামির উদ্দিন সাহেব দাবী করেন যে, তিনি প্রজাদের কল্যাণে অনেক পদেক্ষেপ নিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য মওলানাকে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। মওলানা সাহেব সানন্দে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। জমিদার সামির উদ্দিন মাওলানার গুণ ও বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজ কন্যা আলীমা বেগমকে আবদুল হামিদ খানের সংগে বিয়ে দেন। এ সময় ভাসানীর বয়স ৩৫ বছর। শ্বশুর জামাতার হাতে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। জমিদারী কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য এবং মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য তিনি প্রায়ই কোলকাতায় যেতেন। কিন্তু তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্মের চেয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে সময় কাটাতেন। মওলানা জমিদারী পরিচালনায় বেশী দিন আগ্রহ দেখান নি। কারন এটা ছিল তার নীতিবিরুদ্ধ।

তাঁর জমিদারীতে প্রজারা সুখে থাকলেও সন্তোষে মহাজনদের অন্যায়-অত্যাচারে কৃষকরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারা খাজনার অতিরিক্ত অন্যায় লেভী দিতে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে মওলানার সাহায্য কামনা করে। মওলানা বীর নগরের জমিদারী ত্যাগ করে সন্তোষ ও কাগমারীর নির্যাতিত কৃষকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। তিনি কৃষকদের খাজনা না দিতে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করে তোলেন। মহাজনরা এতে প্রমাদ গোনে এবং মওলানা ভাসানীকে টাংগাইল এলাকা থেকে বিতাড়নের জন্য বৃটিশ সরকারের সাহায্য প্রার্থী হয়। টাংগাইলের স্থায়ী বাসিন্দা নন বলে সরকার তাঁকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ঐ এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়। উপায়ন্তর না দেখে মওলানা তাঁরই এক গুণমুগ্ধ কৃষকের অসুস্থ মৃত্যু পথযাত্রী কন্যাকে বিয়ে করেন এবং স্ত্রীর চিকিৎসা ও শ্বশুরের সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য টাংগাইলে থাকার অনুমতি চেয়ে ময়মনসিহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে আবেদন জানান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে হাসলেন এবং তাঁর টাংগাইল ত্যাগের নির্দেশ প্রত্যাহার করেন। কিন্তু জমিদারের নায়েব ও গোমস্তরা নানাভাবে মওলানার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করায়। ফলে তিনি ঐ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

গ্রেফতারী এড়াবার জন্য আবদুল হামিদ খান ১৯২৮ সালে আসামের ঘাগমারার গভীর জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে জংগল কেটে এক টাকা চৌদ্দ আনা ব্যয়ে তিনি একটি কুঁড়েঘর তৈরী করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যে স্ত্রী আলীমা বেগমও তাঁর সাথে মিলিত হয়।

মওলানার নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণ জংগল পরিষ্কার করার কাজ করতে থাকে। টাংগাইলের নির্যাতিত প্রজারা সেখানে যেয়ে বসতি স্থাপন করতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে ঘাগমারায় বৃহৎ জনপদ গড়ে ওঠে। মওলানা নতুন জনপদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নতির জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ইসলামিয়া কলেজ, পশু চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার জনগণ এলাকার নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করে হামিদাবাদ।

কিছুকাল পরে মাওলানা গোয়ালপাড়া জেলায় ধুবড়ী মহকুমার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যস্থ ভাসান চরে গমন করেন। এখানে তিনি জোয়ারের পানিতে ডুবে যাওয়া ভাসান চরকে রক্ষার জন্য জনগণের ডাকে সাড়া দেন এবং মাটি কেটে বাঁধ নির্মাণের কাজে নেতৃত্ব দেন। দীর্ঘদিন এ চর এলাকায় মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে মওলানা নানা জনকল্যাণমূলক কাজে নেতৃত্ব দেন এবং জনসাধারণের মণিকোঠায় নিজের স্থান করে নেন। কিংবদন্তী আছে যে, মওলানা যেখানেই দীর্ঘদিন থেকেছেন এবং দোয়া করেছেন সে এলাকা আর পানিতে ডুবেনি। মাওলানার কাজই যেন ছিল ডুবন্ত চরকে ভাসানো। ক্রমান্বয়ে মওলানার নাম হয়ে গেলো ভাসানী এবং চরের নাম হলো ভাসানীর চর। ১৯৭১ সালে তিনি শেষ বারের মত ঐ চরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আর সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল-মাদ্রাসাগুলো ছিল না। এ দুঃখে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদেছিলেন।

ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতের এক প্রদেশের অধিবাসীদের আরেক প্রদেশে বসতি স্থাপনের অধিকার ছিল। কিন্তু আসাম সরকার আইন করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাংগালীরা একটি নির্দিষ্ট লাইনের উপরে বসতি স্থাপন করতে পারবে না এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের পরে যারা আসামে প্রবেশ করেছে তাদের আসামে থাকার অধিকার থাকবে না। কিন্তু বাংগালীদের জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তা ছিল অপর্যাপ্ত। তদুপরি যে লাইন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তার ভেতরে লক্ষ লক্ষ বাংগালী বহু পূর্ব থেকেই বসতি স্থাপন করেছিল। এসমস্ত বাংগালীদের আসাম থেকে বহিষ্কারের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় "বাংগাল খেদাও আন্দোলন"। মূলত বাংগালীরা জংগল পরিষ্কার করে যে জমি আবাদ করছিল তা দখলের জন্য শুরু হয় নির্মম নির্যাতন।

www.pathagar.com

হাতী দিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর ভেংগে দেয়া হয়, ফসল বিনষ্ট করে দেয়া হয় এবং শিকারী তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। মওলানা ভাসানী এরূপ নির্যাতন ও লাইন প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। একই সময় গোয়াল পাড়ার জমিদার হুকুম জারী করেন যে, তাঁর জমিদারীতে কেউ গরু জবাই করতে পারবে না। মওলানা ভাসানী এর প্রতিবাদে গরু জবাই সম্মেলন আহ্বান করে ওরশ অনুষ্ঠান করেন।

মওলানা ১৯৩৬ সাল থেকে সুদীর্ঘ ১০ বছর 'লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন' পরিচালনা করেন। এ সময় নির্যাতিত বাংগালী কৃষকদের চরম দুর্দশার দিনে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মনোবল প্রজ্জ্বলিত করার উদ্যেশ্যে মওলানা ভাসানী মাঝে মধ্যে বিরাট বিরাট কৃষক সম্মেলন আহ্বান করতেন। বাংলার অন্য কোন বড় নেতাকে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষ সংগ্রাম চালাতে দেখা যায়নি। আসাম সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী মংগলদহতে আসাম প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। এতে দু'লাখ কৃষক হাজির হয় এবং আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সভাপতিত্ব করেন। বাংলা ১৩৪২ সালে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে মওলানা আরেকটি ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন করেন ভাসান চরে। এ সম্মেলন সমগ্র ভারতে সাড়া জাগায়।

১৯৩৭ সালে ময়মনসিংহসহ উত্তরবঙ্গে বন্যা দেখা দেয়। মওলানা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে টাংগাইল গমন করেন। বন্যার পরে তিনি কাগমারীস্থ হযরত শাহ জামানের মাযারে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু সন্তোষের জমিদার তাতে বাধা দেন। মওলানা সে বাধা উপেক্ষা করে জনগণ থেকে মসজিদ নির্মাণের চাঁদা সংগ্রহ করতে থাকেন। খাজনা ব্যতীত জমিদারের দাবী না মানার জন্য তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন। একই সংগে তিনি দাবী করেন যে, সন্তোষের জমিদারের সম্পত্তি অবৈধ। তিনি তা জনগণের কাছে ফেরৎ দেয়ার দাবী জানান। তিনি দলিল-দস্তাবেজ থেকে প্রমাণ করেন যে, উক্ত জমিদারীর সম্পত্তি সম্রাট আওরঙ্গজেব ইসলাম প্রচার ও জনগণের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের আমলাদের সামনে মওলানা টিকতে পারেননি। তাঁকে আবার টাংগাইল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৩৭ সালে টাংগাইল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি নিজ বাসস্থান সিরাজগঞ্জে গমন করেন। সেখানেও ঋণভারে জর্জরিত কৃষক প্রজাদের মুক্তির জন্য তিনি মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদ বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সিরাজগঞ্জে আহ্বান করেন বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন। কিন্তু সরকারী নির্দেশে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁকে সরকার সিরাজগঞ্জ থেকেও বহিষ্কার করে। এবার তিনি যান রংপুরে। ১৯৩৮ সালে তিনি গাইবান্ধায় আহ্বান করেন প্রজা সম্মেলন। কিন্তু সেখান থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৩৬-৩৭ সালের দিকে মওলানা ভাসানী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহ্বানে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই আসাম মুসলিম লীগের নেতৃত্বের অগ্রভাগে চলে আসেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লীগের স্যার মুহাম্মদ সাদুল্লাহ। তিনি 'বাংগাল খেদাও' আন্দোলন তথা লাইন প্রথার কড়া সমর্থক ছিলেন। এনিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে তাঁর বিরোধ ছিল। ১৯৩৭ সালে মওলানা আসামের কামরূপ জেলার বড়পেটায় মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং তাতে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কয়েকজন নেতা যোগ দেন। মওলানা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহর কড়া সমালোচনা করেন। এসময় সাদুল্লাহ মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। এ নিয়ে দু'জনের মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং কেন্দ্রীয় নেতারা তা প্রশমিত করতে ব্যর্থ হন। সাদুল্লাহ বাংগালী মুসলিম কৃষকদের স্বার্থ না দেখে অসমীয়দের সমর্থন লাভে সচেষ্ট ছিলেন। এ দু'নেতার বিরোধ এত মারাত্মক ছিল যে, ১৯৪৭ সালে সাদুল্লাহর কারণে পাকিস্তানের পক্ষে আসামে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে শুধুমাত্র সিলেট ছাড়া আসামের অন্য কোন অংশ পাকিস্তানের অংশে পড়েনি। আসামের মুসলমানদের ব্যাপারে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের এ উপেক্ষা মওলানা ভাসানী কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় মওলানা আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরই আসামের কংগ্রেসী সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে তাঁকে এ শর্তে মুক্তি দেয়া হয় যে, তাঁকে আসাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ১৯৪৮ সালের শুরুতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা মুসলিম লীগ পর্লামেন্টারী পার্টির সদস্যগণ এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে ৫৭-৩৯ ভোটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত করেন। সোহরাওয়ার্দী মনের দুঃখে ভারতে থেকে যান। মওলানা ভাসানী ঢাকায় এলে মুসলিম ছাত্রলীগের ছাত্ররা উৎসাহিত হয়।

স্বাধীনতার পর বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ভেংগে দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সিলেট জেলার সদস্যদের নিয়ে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। পরে মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু এতে আসামের প্রাক্তন মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানীকে রাখা হয়নি। ফলে তিনি মনে আঘাত পান।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক আইন পরিষদের দক্ষিণ টাংগাইল নির্বাচনী আসনটি সংসদ সদস্যের মৃত্যুর কারণে শূন্য হয়। উপনির্বাচনে মাওলানা ভাসানী প্রার্থী হন এবং মুসলিম লীগ প্রার্থী করোটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী ও অপর ২জন প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। কিন্তু নির্বাচনী ত্রুটির অপরাধে গর্ভনরের এক আদেশে সকল প্রার্থীকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। মজার ব্যাপার হলো ১৯৪৯ সালে খুররম খান পন্নীর পূর্ব ঘোষিত অযোগ্যতা আদেশ বাতিল করা হলেও মওলানা ভাসানীর ওপর আদেশ বহাল থাকে। ১৯৪৯ সালে মওলানা পুনরায় আসামে গেলে সেখানকার কংগ্রেস সরকার তাঁকে আটক করে ধুবরী কারাগারে প্রেরণ করে। কিছুকাল পরে তিনি মুক্তি পেয়ে ঢাকায় আসেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও মওলানা ভাসানীর মত নেতার প্রতি অবহেলা এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের কারণে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের একটি অংশ বিশেষ করে তরুণ মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছিল। এ অংশটি ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ও ২৪ জুন ঢাকায় মুসলিম লীগের এক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও ইয়ার মুহাম্মদ খানকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। সরকারী পথে কোন পাবলিক হল না পাওয়ায় কে এম দাস লেনে কে. এম. বশীর উদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে রোজ গার্ডেনের হল কামরায় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫০-৩০০ জন ডেলিগেট যোগদান করেন। ২৪ জুন মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও শামসুল হককে সাধারণ সম্পদক করে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন দল গঠন করা হয়। ৪০ সদস্য বিশিষ্ট অর্গানাইজিং কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান। শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহম্মদ যুগ্ম-সম্পাদক মনোনীত হন। ঐ দিন অপরাহ্নে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে নবগঠিত দলের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে আনুষ্ঠিত নতুন দলের পরবর্তী জনসভায় মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুঃখ- দুর্দশায় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করেন। সভা শেষে তিনি একটি ভূখা মিছিল নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পুলিশী হামলায় তা ছত্রভংগ হয়ে যায়। মওলনা ভাসানী ও শামসুল হক সহ আরও অনেকে গ্রেফতার হন। অবশেষে জেলে বসে অনশন ধর্মঘট করে ১৯৫০ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

www.pathagar.com

ঢাকায় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সংবর্ধনা সভায় মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় মিছিলের পুরো ভাগে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

চীন সফরকালে চীনা নেতৃবৃন্দের সাথে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের সময় মওলানা ভাসানী ঢাকায় ছিলেন না। তিনি ছিলেন রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ফিরে আসেন। আন্দোলনের অবস্থা তখন উত্তেজনাপূর্ণ। জনতা মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। মওলানা সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে কড়া বিবৃতি দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অভিযোগে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের জন্য নতুন নির্বাচনের দাবী প্রবলভাবে উত্থাপিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গণদাবীর মুখে সরকার ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নিধারণ করে।

১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ সমন্বয়ে নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়। তখনকার "যুগের দাবী" পত্রিকার সম্পাদক খন্দকার ইলিয়াসের বাসায় মওলানা ভাসানীর সাথে কমিউনিস্ট পার্টির মনিসিং ও অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের একটি প্রস্তুতিমূলক সভা হয়। এসভায় বসার আগে মওলানা ভাসানী শর্ত দেন যে, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই করতে আমি রাজী নই।" এতে বামপন্থীরা কোন আপত্তি না করায় তিনি বৈঠকে বসতে রাজী হন। বৈঠকের শুরুতে কমরেড মনি সিংকে উদ্দেশ্য করে মওলানা সাহেব বলেন,

"মনিবাবু, আপনারা বস্তুবাদী কমিউনিস্ট, আমি মুসলমান। আমি বিশ্বাস করি এই দুনিয়ার বিষয়-আসয় সবকিছুর মালিক আল্লাহ। কাজেই ইসলামে শোষণের কোন স্থান নেই, থাকতে পারে না। তাই সকল জালিমের বিরুদ্ধেও মজলুমের জন্য কাজ করা আমার অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি।" তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। এ বৈঠকেই যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয় বিলম্ব না করে আওয়ামী লীগের পক্ষে মওলানা ভাসানী এবং কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষে এ কে ফজলুল হক চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়ে গেলে হক-ভাসানী নামটি নির্বাচনী প্রচারণায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কৃষক প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি কফিল উদ্দিন চৌধুরীর বংশাল রোডস্থ বাসভবনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা রচিত হয়। রচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন আবুল মনসুর আহমদ। ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর এ কে ফজুলল হক ও মওলানা ভাসানী সারা দেশে ব্যাপক গণসংযোগ সফর করেন এবং ফলশ্রুতিতে তাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে এবং ফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়।

www.pathagar.com

বামপন্থীদের প্রভাব

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের কারণে কারাগারে থাকাকালে কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। মোহাম্মদ তোয়াহা, মুজাফফর আহমদ প্রমুখ নেতা মওলানাকে কমিউনিজম সম্পর্কে ধারণা দেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি কমিউনিস্ট নেতাদের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় মওলানার ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হওয়ায় কমিউনিস্ট নেতারা তাঁকে তাদের বাম আদর্শের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা করে। এরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা প্রথমে মওলানাকে আদমজী জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন এবং ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ শ্রমিক লীগের সভাপতি নির্বাচিত করে। মোহাম্মদ তোয়াহা প্রথম সংগঠনটির সহ-সভাপতি এবং দ্বিতীয়টির ঢাকা জোনের সভাপতি ছিলেন। তিনি কাছে থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মওলানাকে দীক্ষা দেন।

১৯৫৪ সালের পহেলা মে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ঢাকায় পল্টন ময়দানে এবং নারায়ণগঞ্জে দু'টি পৃথক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশ দুটোতে মওলানাকে সভাপতিত্ব করার সুযোগ দেয়া হয়। সমাবেশের পর একত্রে নারায়নগঞ্জে রাত্রি যাপনকালে জনাব তোয়াহা বিশ্বব্যাপী মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলন তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁকে বুঝানো হয় যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করে অতীতে কেউ কিছু করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। কমিউনিস্ট পার্টি মওলানা ভাসানীর ইমেজকে কাজে লাগানোর জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থকে। কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৪ সালে মওলানাকে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি করা হয়। কিছুদিন পর তাঁকে কমিউনিস্টদের পরিচালিত আন্তর্জাতিক শান্তি কমিটির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি মনোনীত করা হয়। এ কমিটির সভাপতি হিসেবে তাঁকে ১৯৫৪ সালে স্টকহমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পাঠানো হয়। এদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে কয়েকটি বিশেষ আইনের ধারা (৯২-ক ধারা) জারী করে। পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত তৎকালীন জিওসি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ঘোষণা করেন যে, মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলে তাকে গুলি করা হবে। এমতাবস্থায় মওলানা ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন। তিনি এসময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভের সুযোগ পান।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর ইউরোপ যাত্রার পর পরই যুক্তফ্রন্ট ভাংগার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। মওলানা সাহেব যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার জন্য বহু নেতাকে অনুরোধ করে বার্তা পাঠান। তিনি বিদেশে থাকাকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে এবং আতাউর রহমানের নেতৃত্বে প্রদেশে সরকার গঠন করে।

এদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে ওলটপালট হচ্ছিল। ১৯৫৫ সালের ২০ ডিসেম্বর একজন সিনিয়র আমলা বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি জুরিখে অবস্থানরত সোহরাওয়ার্দীকে আমন্ত্রণ করে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী করার আশ্বাস দিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহ্বান জানান। সোহরাওয়ার্দী তাঁরই জুনিয়র সহকর্মীর নেতৃত্বে সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। অপরদিকে শেরে বাংলা ফজলুল হকের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং যুক্তফ্রন্ট ভাংগনের পর্যায়ে চলে আসে।

সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের জন্য সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। সংবিধানে বিভিন্ন প্রদেশের সংখ্যাসাম্যের নীতি গ্রহণ করা হয় এবং এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সোহরাওয়ার্দীর হাতেই বিপন্ন হয়। সোহরাওয়ার্দীর মতে, পূর্ব বাংলার প্রাপ্য পূর্ণ অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার লাভের সংখ্যাসাম্য মেনে নেয়াই হচ্ছে প্রধান পথ এবং কেন্দ্রেও সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রকৃষ্ট পন্থা। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী তখন দেশের বাইরে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেয়ার জন্য আওয়ামী লীগকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু এ প্রশ্নে দলে মতপার্থক্য প্রবলতর হতে থকে। এ নীতির বিরোধীরা বলেন, সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করলে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাভিত্তিক অধিকার অস্বীকার করা হবে এবং সেজন্য আওয়ামী লীগকেই জনগণের কাছে ভবিষ্যতে দায়ী থাকতে হবে। এসময় মওলানা ভাসানীর দেশে উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত অপরিহার্য।

মওলানার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বিদ্যমান থাকায় তিনি ঢাকায় না এসে কোলকাতায় যান। অবশ্য পরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেবার ব্যবস্থা করলে তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সংখ্যাসাম্য নীতির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাট ভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা ডাকেন। মওলানা সাহেব এসভায় যোগদান করে সংখ্যসাম্য নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁর সাথে একমত পোষণ করেননি। ফলে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তখন মওলানা সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেন।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালে উত্তরবঙ্গের জয়পুরে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থী প্রগতিবাদীদের প্রচেষ্টায় আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবছরেই পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান চালু হয়। এতে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। সোহরাওয়ার্দী নিজে তা সমর্থন করতেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী এর বিরোধিতা করে সাড়া দেশে সমাবেশ করে বেড়ান। এনিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকরী হয়নি। ১৯৫৭ সালের দিকে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানার মত পার্থক্য আরো প্রবল হয়ে উঠে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানে মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং চীনঘেঁষা। এপরিস্থিতিতে মওলানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে দলের সম্মেলন আহ্বান করেন। এসম্মেলনে মওলানা সাহেব আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্র নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ফলশ্রুতিতে দলের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সোহরাওয়ার্দী সমর্থক নেতা-কর্মীরা মওলানাকে 'ভারতের দালাল', এমন কি 'দেশের শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করে। ঐ বছরই মওলানা ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে নিখিল পাকিস্তানের বামপন্থীদের সম্মেলন আহ্বান করে "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি" (ন্যাপ) নামে নতুন দল গঠন করেন। মওলানা ভাসানী নিজে সভাপতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। নতুন দলের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় দেশকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আধিপত্যবাদের হাত থেকে রক্ষা করা। এরপর থেকে মওলানা সাহেব বাম ধারার রাজনীতি অনুসরণ করতে থাকেন।

কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কৃষক সমিতি আগে থেকেই কাজ করছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। মওলানা ভাসানী বামধারার রাজনীতি শুরু করলে কমিউনিস্টরা তাঁকে কৃষক সমিতি পুনর্গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। মওলানা সাহেবের দেশব্যাপী সফরের ফলে কৃষক সমিতি সারা দেশে তৎপর হয়ে উঠে। বিশেষ করে টাঙ্গাইল-পাবনার চরাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ ও আসামের কৃষকদের মধ্যে মওলানার জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। 'মওলানা ভাসানী ছিলেন মূলত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। কৃষকদের মনে তাদের নিজস্ব দুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনার কারণকে তুলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সৃষ্টি করায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কৃষক সমিতি গঠনের পর ষাটের দশকে তিনি পর পর মহীপুর, পাকশী, ঢাকা, সন্তোষ প্রভৃতি স্থানে বিশাল বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। প্রতিটি সমাবেশের মধ্য দিয়েই কৃষকদের মধ্যে জাগরণের নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন।'

www.pathagar.com

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে মুক্তিলাভের পর তিনি গণচীন সফর করেন। এসফরকালে তিনি চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের নায়ক মাও-সে-তুং-কে বলেছিলেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানকে বাদ দিয়ে বিপ্লব কখনও চিরস্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারে না। ১৯৬৪ সালে তিনি হাভানায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। এসম্মেলনে মওলানা সাহেব ঘোষণা করেন যে, ইসলামের দর্শন এবং বাণী বিশ্বে স্থায়ী শান্তি দিতে পারে।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে মওলানা ভাসানী তার তীব্র বিরোধিতা করে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জোর দাবী জানান। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা হলে তিনি সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী মোহতারামা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন দেবার প্রস্তাব করেন।

১৯৬৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাপও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী চীনপন্থী গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। ৩০ নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত দলের বিশেষ কাউন্সিলে এক নীতি নির্ধারণী বক্তৃতায় মওলানা সাহেব বলেন, "ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকার হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট, বড় বুর্জোয়া ও সামন্তবাদ। এই ত্রিশক্তি শ্রেণী স্বার্থের প্রতিরক্ষক। এই তিন শক্তির শাসনের অবসানের মধ্য দিয়েই কেবল দেশের জনগণ তাদের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারে।" পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে মওলানা বলেন, "পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের স্বাধিকারসহ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতির দাবীতে ন্যাপের জন্ম হয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর বিরোধিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে যেভাবে "জাতীয় মুক্তি সনদ" বলে চিত্রিত করা হচ্ছে তার সাথে ন্যাপ একমত নয়। কেননা এখানে শুধু উদীয়মান বাঙালী বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থেরই প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু বৃহত্তর জনগণের স্বার্থের কোন প্রতিফলন সেখানে ঘটে নি। স্বায়ত্তশাসন বলতে ন্যাপ দেশের কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত তথা শতকরা ৯৮ জন মেহনতী মানুষের স্বায়ত্তশাসন বুঝে।"

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে মওলানা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এবছর ৩ নভেম্বর দাবী দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে মওলানা আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করার আহবান জানান এবং দেশব্যাপী লাগাতার ঘেরাও আন্দোলন শুরু করার ডাক দেন। ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি বলেন, শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে দেশে ফরাসী বিপ্লব ঘটানো হবে। পাকিস্তান সরকার ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলে তিনি তাঁর সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন।

১৯৬৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জেলায় জেলায় ঘুরে মওলানা সাহেব দুর্নীতিবাজ আমলাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। এধরনের সমাবেশে তিনি লাল টুপির সমাবেশ ঘটান। এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের উদাহরণ দিতেন। সরকারী বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে এসব সমাবেশে কৃষকদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব গড়ে উঠে। এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েও তিনি কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। টোবাটেক সিং নামক স্থানে মওলানা ভাসানী আয়োজিত এরূপ সমাবেশে এক লক্ষের মত কৃষক উপস্থিত হয়েছিল। বিভিন্ন কৃষক সমাবেশগুলোতে মওলানা সাহেব দৃপ্তকণ্ঠে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কৃষকদের প্রতি আহবান জানাতেন এবং এতে কিছু ফলও হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন,

> "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ১৩ শত মাইলের ব্যবধানের কথা স্মরনে রাখিয়াই নিজেদেরকে শাসন করার পূর্ণ অধিকারসমূহ দু'টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে পাকিস্তান গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে জিন্নাহ সাহেবের সভাপতিত্বে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।... ... পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা পূর্ব পাকিস্তানের অসহায়তা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর একান্ত অপরিহার্যতাকে পুনর্বার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।"

১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। তিনি ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ঐ বছরই ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ জলোচ্ছাস সংঘটিত হয়। ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। মওলানা এসময় ভোটের রাজনীতির বিরোধিতা করে "ভোটের বাক্সে লাথি মার পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর", "গোলটেবিল না রাজপথ-রাজপথ, রাজপথ" ইত্যাদি শ্লোগানে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে

www.pathagar.com

একুশের শহীদদের স্মরণে শোভাযাত্রায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সাথে কাগমারীতে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

চেষ্টা করেন। তিনি এসময় নির্বাচনী তৎপরতা বাদ দিয়ে উপকূলবর্তী জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। নির্বাচন বর্জন করে দক্ষিণ বাংলা ঘুরে এসে ৪ ডিসেম্বর তিনি পল্টনে এক জনসভায় "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে ১৬ এপ্রিল তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গমন করেন। কিন্তু ভারত প্রবাসে তাঁকে পুরো সময় কাটাতে হয়েছে দিল্লীতে অন্তরীণ অবস্থায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে

১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেনঃ (১) যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ; (২) অস্ত্র উদ্ধার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা; (৩) দেশের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও লুটপাট এবং সীমান্তে চোরাচালান দমন; (৪) ধর্মীয় অবমূল্যায়ন রোধ; (৫) বিদেশী আধিপত্যবাদের অবসান; ও (৬) সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা।

দেশে ফিরেই মওলানা সাহেব বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য সকল রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। তিনি অস্ত্র জমা দেয়ার জন্যও আহ্বান জানান। যারা মুক্তযুদ্ধের ও দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের বিচারের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে না নিয়ে গণতন্ত্রের খাতিরে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা না করে আদালতে হাজির করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ২৫ ফেব্রুয়ারী "হক কথা" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পকাশ করেন। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারী সন্তোষে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি দেশ গড়ার কাজে সকলের ঐক্যবদ্ধ অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারের ব্যর্থতা, বাংলাদেশের মাটিতে রুশ-ভারত আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তার, সীমান্ত পথে দেশের মূল্যবান সম্পদ অবাধে পাচার এবং দেশের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে নীতিবোধ বিবর্জিত দুর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষীদের অবাধ লুন্ঠন ও শোষণের বিরুদ্ধে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। পল্টনে এক জনসভায় তিনি বলেন, "বাংগালীরা ভারত, চীন, বৃটেন, বা আমেরিকার গোলামী স্বীকার করবে না। প্রতি বিন্দু রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করবো ইনশাআল্লাহ।"

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পরে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোর একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়। মওলানা সাহেব এর বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি প্রথম ঢাকায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভা শুরু করেন। তিনি অবিলম্বে দেশের মাদ্রাসাগুলো খুলে দেবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,"স্কুল খুলিয়াছে, কলেজ খুলিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে। হাজার হাজার মাদ্রাসায় আজো তালা কেন? রাজাকার-আলবদর-আল-শামস শুধু মাদ্রাসার ছাত্ররা হয় নাই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও হইয়াছে। তাই শুধুমাত্র মাদ্রাসা বন্ধ রাখা চলিবে না। মাদ্রাসাগুলি অবিলম্বে খুলিয়া দাও। লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা-ছাত্রের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা বন্ধ কর। স্বাধীনতার পর সমাজে আযান দেওয়া, ইমামতি, জুমা, ঈদ, খুতবা, জানাজা পড়ার প্রয়োজন কি শেষ হইয়া গিয়াছে?"

মওলানা ভাসানী ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, "দশ দিনের মধ্যে হিন্দুস্তানের সৈন্য প্রত্যাহার কর।" তিনি বলেন, "বন্ধুত্ব ও প্রভুত্ব এক কথা নয়। ভারত ও রাশিয়ার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব থাকিবে, কিন্তু আমরা কাহারো প্রভুত্ব মানিয়া লই নাই এবং ভবিষ্যতেও মানিব না।" এসময় "হক কথা" পত্রিকা সরকারের দোষত্রুটি অত্যন্ত কড়া ভাষায় তুলে ধরছিল। সরকার ঐ পত্রিকার সম্পাদক ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করে। মওলানা এ ঘটনার প্রতিবাদ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট এক বার্তা প্রেরণ করেন। ১৯৭২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "হক কথা শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতির কথা প্রকাশ করিত বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 'হক কথা' বন্ধ করিয়া সত্য বলা বন্ধ করা যাইবে না। আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাইবে না। আমি থানায় থানায় কনফারেন্স করিয়া হক কথার চাইতে বেশী কাজ করিব। আমি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করিতেছে, এই কথা পারিলে অস্বীকার কর।" এর পরপরই তিনি দেশব্যাপী সফরে বের হন।

১৯৭২ সালের ২২ অক্টোবর মওলানা সাহেব দেশের খসড়া সংবিধান সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'সংবিধানে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অহেতুক অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যাহা একনায়কত্ববাদী শাসনের দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে।' মওলানার সভাপতিত্বে তাঁর দলের নির্বাহী কমিটির সভায় বলা হয়ঃ "পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান রচনার অধিকার রাখে না।"

২৯ নভেম্বর কালিয়াকৈরে এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী দালাল আইন বাতিলের দাবী জানিয়ে বলেন, এই আইন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্বাচনের তিন মাস আগে বর্তমান সরকার ভেঙ্গে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

www.pathagar.com

গঠনের তিনি দাবী জানান। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এসময় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক রূপে তিনি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল, ৩১শে ডিসেম্বরের পর আর কাউকে দালাল আইনে গ্রেফতার না করা প্রভৃতি দাবীসহ ১৫ দফা দাবীনামা পেশ করেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও, টেলিভিশনে বিরোধী দলের নির্বাচনী বক্তব্য প্রচারের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ২৫ ডিসেম্বর তিনি চোরাচালান, মজুদদারী, কালোবাজারী, ঘুষ, দুর্নীতি, হাইজ্যাক, রাহাজানি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস ও ফ্যাসিবাদী হামলার প্রতিরোধকল্পে সন্তোষে নিখিল বাংলা জোয়ান-কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেন।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর দেশের রাজনীতিতে সংকট দানা বাঁধতে থাকে। এসময় মওলানা ভাসানী খাদ্য সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধের দাবীতে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশনকে কেন্দ্র করে তখনকার রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁর তিন দফা দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। ১৪ মে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "যুবক হইয়া বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে গিয়া জনসভা করিয়া সরকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তাই আমি অনশন ধর্মঘট করিয়া দেশের মানুষের মনে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাইতেছি।"

১৯৭৩ সালের ২০ জুন মওলানা ভাসানীর কাছে লেখা এক চিঠিতে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম বাংলা থেকে আগত প্রায় ১৫ হাজার নকশালকে দমনের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। মওলানা তাঁর সাহায্যের শর্ত হিসেবে জানান, তার আগে ভারতের শোষকদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবকে সুস্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে। মওলানা তাঁর অনশন ধর্মঘটের পর ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেন। জুন মাসে চট্টগ্রামের এক বিশাল জনসভায় তিনি ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানালে সভায় উপস্থিত প্রায় আড়াই লক্ষ লোক দুই হাত তুলে তাঁর প্রতি সমর্থন জানায়। জুলাই মাসে তিনি পল্টনের এক জনসভায় ভারতীয় পণ্য বর্জন এবং ভারতের সাথে সকল গোপন চুক্তি বাতিলের আহবান জানান। এজন্য তিনি হরতালও আহ্বান করেন।

মওলানা ভাসানী সরকার বিরোধী ভূমিকা জোরদার করলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাঁকে 'পাকিস্তানের দালাল' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ভারতের হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা মওলানা সাহেবকে কটাক্ষ করে একটি কার্টুন ছাপে। এতে তাঁকে গাছের বাকল পরা অবস্থায় দেখানো হয় এবং নীচে লেখা হয়ঃ 'বয়কট ইন্ডিয়ান গুডস'। কলকাতার যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁকে 'শয়তান', 'বেঈমান', 'ধূর্ত', 'ধুরন্ধর', 'পাগল', 'নিমকহারাম' প্রভৃতি অশালীন বিশেষণে গালিগালাজ করে কমপক্ষে

www.pathagar.com

আটটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এদিকে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো) ও সিপিবি সমন্বয়ে গঠিত ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কমরেড মনি সিং মওলানা ভাসানীকে 'টুকরো টুকরো করে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত' করার হুমকি দেন। জবাবে মওলানা বলেন,"শ্রী মনি সিং দেশে বড় একটা গোলযোগ বাঁধাইয়া উহার উসিলায় এখানে রুশ-হিন্দের প্রভাব আরও প্রত্যক্ষ ও মজবুত করিতে চাহিতেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এক বিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে রাশিয়া ও ভারতের কোন প্রকার ষড়যন্ত্রই কায়েম হইতে দিব না।"

১৯৭৪ সালে মওলানা ভাসানী সকল প্রকার দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার এবং রবুবিয়াত দর্শনের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হুকুমাতে রব্বানীয়া সমিতি গঠন করেন। হুকুমাতে রব্বানীয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মওলানা বলেন, "আমার বিশ্বাস, একমাত্র রবুবিয়াতের দর্শনই জাতি-ধর্ম-মতবাদ নির্বিশেষে সকল মানুষকে শান্তি দিতে পারে। সবার লক্ষ্য যদি স্রষ্টা হয়, সকল সমস্যা সমাধান কল্পে যদি স্রষ্টার নিয়ম প্রবর্তিত হয় তবে হানাহানির অবকাশ কোথায়? স্রষ্টার নিকট তো সবাই সমান। তিনি একই বিধানে সকলের নিকট দাতা, দয়াময়, প্রেরণাদানকারী -এক কথায় সকল চেতনার উৎস।... হুকুমাতে রব্বানীয়ার মূলকথা-আল্লাহর দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহর দুশমন আমাদের দুশমন।.. .."

মওলানা ভাসানী ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, লুটপাট এবং রুশ-ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "আমরা হিন্দুস্তান, হিন্দু মহাসভা এবং বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ ভাগ মুসলমানের অপরাপর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করিব, যাহারা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নষ্ট করিয়া দিতে চায়। আমরা মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করিব, কারণ তাহারা আমাদের সকল ধান, চাউল, পাট, মাছ, সোনা ইত্যাদি পাচার করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা হত্যা ও লুটপাটকারী সকল বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিব।" মওলানা মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্যে বলেন, "সময় থাকিতে মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর মতো কাজ আরম্ভ করো। তোমাকে এই সকল কথা জানাইয়া কোন ফল হইবে না। তবে মনে রাখিও, অত্যাচারী ও তাহাদের সাহায্যকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না।"

১৯৭৪ সালের এপ্রিলে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "এদেশের মানুষ না খাইয়া মারা যাইতেছে। আইনের শাসন নাই। রক্ষীবাহিনী লোকজনকে ঘর হইতে টানিয়া নিয়া হত্যা করিতেছে এবং লাশ নিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতেছে। রক্ত পানি করিয়া উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্যের বদলে বিদেশ

www.pathagar.com

হইতে সিনেমা আমদানী করা হইতেছে।" তিনি বলেন, 'রাজবন্দীদের অপরাধ কি পাকিস্তানী যুদ্ধ অপরাধীদের চাইতেও বেশী ?------পটাইয়া, জেলে পাঠাইয়া গুলি করিয়া মুজিববাদের আর্দশ গ্রহণ করিতে জনগণকে বাধ্য করা যাইবে না। জনগণ একমাত্র আল্লাহর আর্দশ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করিবে না।'

১৯৭৪ সালের মধ্য এপ্রিলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৬ দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ঐক্যফ্রন্ট ৩০ জুন এর মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বাতিল এবং সর্বপ্রকার দমন নীতি প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে চরমপত্র দেয়। এতে বলা হয়, দাবী না মানলে ৩০ জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করা হবে। এ ঘোষণার পর বিরোধী দলের উপর ব্যাপক জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়। এসময় মওলানা সাহেব ঢাকায় ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে এক দলীয় কর্মী সমাবেশে সকলের কাছ থেকে 'বিদায়' গ্রহণ করেন এবং তাঁর দোষ-ত্রুটি আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ৩০ জুন তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে টাঙ্গাইলের সন্তোষে অন্তরীণ করা হয়। ফলে দেশের রাজনীতিতে নেমে আসে আপাত নীরবতা।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সরকার সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দেশে একক রাজনৈতিক দলরূপে 'বাকশাল' গঠন করে। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সন্তোষে গিয়ে মওলানার সাথে দেখা করে একান্তে আলাপ করেন। ১২ মার্চ মওলানা সাহেব সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, "আমার বয়স এখন ৯৪ বছর। সুদীর্ঘ ৭৩ বছর যাবত আমি রাজনীতিতে ছিলাম। কিন্তু বর্তমানের মত নোংরা রাজনীতি আমি অতীতে দেখি নাই। তাই এখন আমি রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইয়াছি।"

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হলে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে মওলানা ভাসানী তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করেন। তিনি ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। ৭ ডিসেম্বর তিনি সন্তোষে এক ধর্মীয় সমাবেশ আহ্বান করেন। এতে তিনি দীর্ঘকাল পরে প্রাণ খুলে বক্তৃতা করেন। তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহতকরণ এবং ভারত কর্তৃক ফারাক্কা চালুর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

১৯৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারী মওলানা ভাসানী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় আসেন এবং পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন। একটু সুস্থ হয়েই তিনি মোমেনশাহী ও যশোরের সীমান্ত অঞ্চল সফর করেন। তিনি যশোর সফরকালে ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক একতরফা পানি

প্রত্যাহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তদন্তের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি সমন্বয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের দাবী ক্রমাগত প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জাতিসংঘে*উত্থাপনের আহ্বান জানান। ২০ মার্চ তিনি এ বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ভারত ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার বন্ধ না করলে এবং আপোস-মীমাংসায় রাজী না হলে ভারতের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন শুরু করা হবে। মওলানার আহ্বানে ১৭ এপ্রিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'মুনাজাত সভা'। এই অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো তাঁর খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে মওলানা ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। মুনাজাত সভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, "এই নীতি অনুসৃত না হইলে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু বাঙ্গালীসহ অহিংস শান্তিপূর্ণ নীরব মিছিল লইয়া ফারাক্কার দিকে অগ্রসর হইব।" ফারাক্কা মিছিল সম্পর্কে ২৮ এপ্রিল মওলানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে এই মিছিলে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মিছিল পরিচালনার জন্য মওলানা ভাসানী ১১ মে রাজশাহী উপস্থিত হন। ১৪ মে তিনি ঘোষণা করেন, "ফারাক্কা মিছিল হবেই, কোন চোখ রাঙানিকে পরোয়া করি না।" মওলানার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ফারাক্কা মিছিলে যোগদানের জন্য রাজশাহীতে সমবেত হন। ১৬ মে মিছিল শুরু হওয়ার আগে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে বিশাল সমাবেশে মওলানা ঘোষণা করেন, "সুবিচার অর্জনের লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।" ১৬ মে সন্ধ্যায় ফারাক্কা মিছিল নবাবগঞ্জে পৌঁছলে তিনি ঘোষণা করেন, "ভারত ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে রাজী না হইলে আমি ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু করিবো।" ফারাক্কার প্রতিক্রিয়া সচক্ষে দেখে যাওয়ার জন্য তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। মিছিলের সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলার জন্য ভারত সরকার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। রাজশাহী শহর থেকে দীর্ঘ মিছিলের নেতত্ব দিয়ে ৯৬ বছরের বয়োবৃদ্ধ নেতা ১৭ মে সীমান্তবর্তী কনসার্টে গিয়ে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তাঁর সমাপনী ভাষণে তিনি বলেন, "নিরস্ত্র মানুষের ভয়ে ভারতকে যখন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছে তখন তার অবিলম্বে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসা উচিত।" তিনি ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার দাবী ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে অস্বীকৃতি জানাইলে আগামী মাসের মধ্যে আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিব এবং সে বাহিনী লইয়া ১৬ আগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু করিব।"

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালের ২ অক্টোবর মওলানা ভাসানী "খোদায়ী খেদমতগার" নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণে বলেন, "বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে রবুবিয়াতের প্রচার ও প্রসারের উদ্দশ্যে সুশিক্ষিত চরিত্রবান ও জেহাদী চেতনাসম্পন্ন কর্মী তৈয়ার করার লক্ষ্যেই আমি ইতিহাস বিশ্রুত খোশনদপুরে (সন্তোষ) হযরত পীর শাহ জামান কাশ্মীরীর (রঃ) মিশনের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়াছি।... .. ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী, কুরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা অনুযায়ী সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব স্থায়ীভাবে গঠন করাই হইবে শান্তি আনয়নের একমাত্র উপায়।"

মওলানা ভাসানী ১৯৭৪ সালে সন্তোষে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চালাতে থাকেন। সন্তোষ ও তার আশেপাশের প্রায় একশ' একর জমি নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে তোলেন এবং প্রাথমিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করেন। ১৯৭৪ সালেই তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যাদেশ জারীর জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের পরামর্শ দেন। মওলানা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আসলে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই। ইহার আদর্শ ইসলাম ও রবুবিয়াতের প্রচার। ইহাতে মওলানা ভাসানীর নাম সংযোজন মানে বিসমিল্লাতেই গলদ-রবুবিয়াতের বরখেলাফে নফসানিয়াত কায়েম করিয়া দেয়।" মওলানা আরো বলেন, 'আমি একজন একক ব্যক্তি। আর ইসলাম একটি সুমহান আদর্শ, বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। আমি তোমার পরামর্শ মানিয়া নিতে পারিলাম না।' মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ১৯৭৪ সালেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করেন।

সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও টেকনিক্যাল কলেজ, বালিকা বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে আসামে প্রায় ৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া পাঁচবিবিতে নজরুল ইসলাম কলেজ এবং কাগমারীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. তালুকদার মনিরুজ্জামান, গ্রুপ ইনটারেষ্ট ইন পাকিস্তান পলিটিকস ১৯৪৭-১৯৫৮, প্যাসিফিক এফেয়ার্স, ভল্যুম-৩৯।

২. এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান, জেনারেলস ইন পলিটিকস ১৯৬৮-৮২, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮২।

৩. সিরাজ উদদীন আহমেদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকাঃ ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬।

৪. আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

৫. কমরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৬. কীথ ক্যালার্ড, পাকিস্তান-এ পলিটিক্যাল স্টাডি, লন্ডন ঃ জর্জ এলেন এন্ড উনউইন,১৯৫৭।

৭. বদরুদ্দীন উমর, পলিটিকস এন্ড সোসাইটি ইন ইস্ট পাকিস্তান, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪।

৮. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৮।

৯. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

১০. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবনতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা, ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭।

১১. লেনিন আজাদ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,১৯৯৭।

১২. জগলুল আলম, বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-১৯৮৯, ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০।

১৩. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আনোদালন ও তৎকালীন রাজনীতি, কোলকাতাঃ আনন্দধারা, ১৯৭১।

১৪. হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রও চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।

১৫. মুনির উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০।

১৬. হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদিত), মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সে রক্ত দিয়ে দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে, তবুও স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না।"

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম ঃ ১৭ মার্চ, ১৯২০ ইং।

পিতা ঃ শেখ লুৎফর রহমান।

মাতা ঃ মোসাম্মাত সায়রা খাতুন ।

শিক্ষা ঃ ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ।

- ❑ ১৯৪৭ সালে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাশ।
- ❑ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার।

রাজনীতি ঃ ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত।

- ❑ ১৯৫৫ সালের ১৫ মে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ও বন মন্ত্রী নিযুক্ত।
- ❑ ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর গ্রেফতার।
- ❑ ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত।
- ❑ ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবী উত্থাপণ।
- ❑ ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত।
- ❑ ১৯৬৯ সালে ২ ফেব্রুয়ারী কারাগার থেকে মুক্তি।
- ❑ ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়।
- ❑ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণ।
- ❑ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা শুরু এবং তাঁকে আটক করে পাকিস্তানে প্রেরণ।
- ❑ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত। শেখ মুজিবকে প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা।
- ❑ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।
- ❑ ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ❑ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পুনরায় রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত।

বিশেষ অবদান ঃ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গঠন, আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে ভূমিকা পালন, ঐতিহাসিক ৬ দফা, স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকার, বাংলাদেশের সংবিধান, বাকশাল গঠন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ, শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ, জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।

মৃত্যু ঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত।

মাজার ঃ টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

www.pathagar.com

১৯৩৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের ছাত্র থাকাকালে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরিচিত হন। সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ শুরু করেন। ১৯৪০ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও বাংলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন।

১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জের মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন এবং সেখানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে থেকে সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন। তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত হন।

১৯৪৬ সালে উপমহাদেশের মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার মুসলমানরা বিপুলভাবে মুসলিম লীগকে জয়ী করার জন্য ভোট দেয়। নির্বাচনী কাজের জন্য মুসলিম লীগ নেতাদের পাশাপাশি ছাত্র নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, যশোর, খুলনা এবং বরিশাল জেলায় ব্যাপক নির্বাচনী সফর করেন। মুসলিম লীগের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য তিনি বহু জনসভায় ভাষণ দেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে যা মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নির্বাচনকে পাকিস্তান ইস্যুতে ভারতের মুসলমানদের গণভোট হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে এককভাবে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। এ সময় পূর্ববঙ্গে সংসদের ভেতরে বাইরে তেমন কোন শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলেও অতি শীঘ্রই মুসলিম লীগের কিছু বাংগালী প্রভাবশালী নেতা-কর্মী প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সোহরাওয়ার্দীসহ মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা ও তাঁদের বেশ কিছু সমর্থক কোলকাতায় থেকে যান। তাঁদের সমর্থক ছাত্র নেতারা ১৪ আগস্টের পর ইসলামিয়া কলেজের সিরাজুদ্দৌলা হলে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠক করে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান (রাজশাহী), শহীদুল্লা কায়সার, আখলাকুর রহমান সহ আরো অনেকে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করা হবে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ রুদ্ধদ্বার বৈঠকের বেশ কিছুদিন পর তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে কাজ

www.pathagar.com

করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধী সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও কর্মসূচীর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ছিটকে পড়া পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীরা এখানে কিভাবে কাজ করবেন তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ঢাকার মোগলটুলীতে এক ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই উদ্যোগে ৪জানুয়ারী গঠিত হয় সরকার বিরোধী পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন-পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যা ছিলো সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। শেখ মুজিবর রহমান এ কমিটি গঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে হরতাল পালন করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নিজস্ব দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৯ মে তারা ব্যাপক কর্মসূচী পালন করে। শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্ব দেন। এ অপরাধে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে আর কখনো কোন আন্দোলনে যোগ দেবেন না—এ শর্তে কর্তৃপক্ষ তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দিলে শেখ মুজিব তাতে রাজী হন নি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যান। ১১ সেপ্টেম্বর পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারী তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মাওলানা আকরাম খাঁ এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বিরোধী মুসলিম লীগ নেতা, কর্মী ও অন্যান্যরা ঢাকার রোজ গার্ডেনে মিলিত হয়ে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এর সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। এ দুর্ভিক্ষের প্রতি সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। শেখ মুজিবকে এ মিছিল থেকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫০ সালে তিনি পুনরায় বন্দী হন। ২৭ ফেব্রুয়ারী তিনি সেখান থেকে মুক্তি পান। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শেখ মুজিবুর রহমান কিছুদিন বাড়ীতে কাটান। অতপর ঢাকায় এসে আবার রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় তিনি প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার জন্য দেশব্যাপী গণসফর শুরু করেন। ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই তাঁকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে ২১ দফার ভিত্তিতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম্ লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এ নির্বাচনে শেখ মুজিব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি আসনে জয়লাভ করে। মাত্র ৯টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিজয়ীর বেশে করাচী পৌঁছলে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় একদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলে এবং অপরদিকে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চরম অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সদস্যদের সভায় এ.কে ফজলুল হক পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচিত হন। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে ফ্রন্টের পক্ষে কেন্দ্রে নেতৃত্ব করবেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি প্রশ্নে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে সোহরাওয়ার্দীর মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক ছিলেন। পক্ষান্তরে মওলানা ভাসানী ও অন্যান্য বামঘেঁষা নেতারা মার্কিন বিরোধী ছিলেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ৩১ মে ১৯৫৪ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এবং চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্নর নিয়োগ করেন। পাশাপাশি শেরে বাংলাকে গৃহবন্দী এবং শেখ মুজিবসহ আরো অনেক মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। ২৫ অক্টোবর সকালে গোলাম মোহাম্মদ আকস্মিকভাবে মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদ বাতিল করে দিয়ে বিকালে আবার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বেই নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন যার নাম দেয়া হয় 'মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্টস'। আওয়ামী লীগের দ্বিমতে সোহরাওয়ার্দী এ মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় শেখ মুজিব জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং ১৯৫৫ সালে 'সংখ্যাসাম্যে'র ভিত্তিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সংখ্যাসাম্যের নীতি মেনে নেয়ার পর ১৯৫৫ সালের ৫ জুন পূর্ববঙ্গ থেকে গভর্নরের শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং ৬ জুন শেরে বাংলার আশীর্বাদপুষ্ট আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে নয়া যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৫৫ সালের ৭ আগস্ট ইস্কান্দার মীর্জা গোলাম মোহাম্মদকে সরিয়ে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১১ আগস্ট তিনি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ

www.pathagar.com

থেকে মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)-কে পদচ্যুত করে সেখানে সাবেক আই সি এস অফিসার পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে নিয়োগ দেন। তিনি শেরে বাংলার কে এস পি'র সহায়তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন যাতে এ কে ফজলুল হকও যোগদান করেন। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে অবস্থান নেয়।

১৯৫৫ সালের ৬ জুন আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই সরকার জনসমর্থন হারায় এবং দেশে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয় যা মোকাবেলা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ১৯৫৬ সালের ৯ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে পূর্ব বাংলার গভর্নর পদে শপথ গ্রহন করেন। কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতির কোনই উন্নতি হলো না। বরং আরো অবনতি ঘটতে থাকে। দেশব্যাপী খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাদ্য সমস্যা সমাধানের দাবীতে আওয়ামী লীগ দেশব্যপী গণআন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঢাকায় ভূখা মিছিল বের হয়। সরকার এ মিছিল মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হয়। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে আইন সভার অধিবেশন ডাকার আহ্বান জনান। ১৯৫৬ সালের ২২ মে অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু বিরোধী দলকে বক্তব্য রাখতে না দিয়েই একই দিনে অধিবেশনের মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ১৩ আগস্ট পুনরায় অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু অধিবেশনের শুরুতেই স্পীকার গভর্নরের একটি আদেশ মত "পুনরায় নয়া আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আইন সভার অধিবেশন বন্ধ রাখা হলো" পড়ে শোনান। সাথে সাথে শেখ মুজিব এর বিরোধিতা করে বলেন,"আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা এ অথর্ব সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছি।" বিরোধী দলের সকল সদস্যই তাঁর ঐ প্রস্তাবে হাত তুলে সমর্থন জানায়। মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতেই প্রায় দু'শজন সদস্যর সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। অতঃপর মন্ত্রিসভা এবং গভর্নরকে অপসারণের দাবী জানিয়ে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার কাছে আলাদা আলাদা প্রস্তাব পাঠান। ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন। ৪ সেপ্টেম্বর গভর্নর আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। এদিনই আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক বসে। বৈঠকে দলের সভাপতি মাওলানা ভাসানী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহের ওয়াদা না করা পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করা অসম্ভব। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার অক্টোবরের শেষ নাগাদ ১ কোটি ৩৭ লাখ মণ চাল আমদানীর প্রতিশ্রুতি দিলে ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প-বাণিজ্য-শ্রম-দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দফতরের দায়িত্ব পান। এর মাত্র ৬ দিন পর ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে বরখাস্ত এবং সে পদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়োগ করা হয়। তিনি রিপাবলিকান পার্টির সাথে কোয়ালিশন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, স্বীয় ক্ষমতাকে মজবুত করার জন্য ইস্কান্দার মীর্জা মুসলিম লীগ ভেঙ্গে রিপাবলিকান পার্টি গঠন করিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর শপথ গ্রহণের কিছুদিন পর গভর্নরের পদ থেকে শেরে বাংলাকে সরিয়ে সুলতান উদ্দিনকে সে পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কেন্দ্র এবং পূর্ব বাংলায় তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তাদের অবস্থান তেমন মজবুত ছিলো না। বরং তাদের দলীয় কোন্দল এ দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পথকে সুগম করে দেয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সাথে মাওলানা ভাসানীর প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তনীদের এক ইউনিট নীতিকে সমর্থন করায় এবং 'ক্ষমতায় গিয়ে তারা ২১ দফা ভুলে যাওয়ায়' সোহরাওয়ার্দী সমালোচনার সম্মুখীন হন। এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী দাবী করলেন "হয় ২১ দফা বাস্তবায়ন কর, না হলে ক্ষমতা ছাড়।" এ সব কারণে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মাঝে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তিনি ১৯৫৭ সনের ৭-৮ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ডাকেন এবং ৮ শত ৯৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা করেন। সবার উপস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দীকে 'ভারতের দালাল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এক পর্যায়ে মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগের অভিপ্রায় জানিয়ে প্রাদেশিক দলের সাধারণ সম্পদক শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে এক পত্রে লেখেন এবং বলেন "কেন্দ্র ও পূর্ববঙ্গে ক্ষমতার আসনে বসে আওয়ামী লীগের নেতাগণ বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দী দলের আদর্শ ও ২১ দফা ক্রমাগতই লঙ্ঘন করে চলেছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী দলের মূল নীতির ও বহু প্রস্তাবের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছেন। কাজেই আমি আর এ দলের সভাপতি পদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চাই না। আগামী ২৫ জুলাই থেকে আমি দলের সদস্যও থাকতে চাই না।" তাঁকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানালেও তিনি সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকার 'পিকচার প্যালেস' হলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আধিবেশন ডাকা হয়। অধিবেশনে মওলানা ভাসানীসহ ৯ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং ২৯ জন এম,এল,এ ও বহু কর্মী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকার "রূপমহল" হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী

www.pathagar.com

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ প্রায় ১২শ কর্মী সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলন শেষে মাওলানা ভাসানীকে প্রধান করে "ন্যশনাল আওয়ামী পার্টি" গঠিত হয়। দলে দলে লোক ন্যাপে যোগদান করতে থাকে এবং আওয়ামী লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থাও নড়বড়ে হয়ে ওঠে। ১১অক্টোবর তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

আওয়ামী লীগের সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদকের মন্ত্রীত্ব গ্রহনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ বিধানকে লংঘন করে শেখ মুজিবুর রহমান আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে দলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা নিয়ে আতাউর রহমানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। শেখ মুজিব কিছুটা কোনঠাসা হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় দলের সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্র এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত দেখে শেখ মুজিব মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে দলের ভাঙ্গন ঠেকাতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তখন পূর্ববঙ্গে আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভার অবস্থানও নাজুক হয়ে পড়ে। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ আতাউর রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয়। আবু হোসেন সরকার নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এতে সোহরাওয়ার্দী ক্ষুব্ধ হন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনকে এ বলে হুমকি দেন যে 'আধা ঘন্টার মধ্যে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী সভা বাতিল না করলে কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে'। ফিরোজ খান নুন তাঁর কাছে মাথা নত করে ১ এপ্রিল আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান। ১৮ জুন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা আবারো সংকটে পড়ে। এ দিন প্রাদেশিক আইন সভায় অতর্কিতভাবে একটি প্রস্তাব ভোটে অসমর্থিত হয়। পরদিন আইন সভার একটি Cut motion-এ হেরে যাওয়ার ফলে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবারও আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন, কিন্তু ২২ জুন শেখ মুজিবুর রহমান আইন সভায় তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনায় ২৩ জুন তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। আর সেই সুযোগে ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব বাংলার আইন সভা সাময়িকভাবে বাতিল করে প্রদেশে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন। প্রবল চাপের মুখে কিছু দিন পর গর্ভনর জেনারেল পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় শাসন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন, ফলে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আবার আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আইন সভার বৈঠক শুরু হয়। বিরোধী দল স্পীকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্ব অস্বীকার করলে আইন সভায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। সদস্যরা ডেপুটি স্পীকারের প্রতি ফাইল-পত্র, টেবিল-চেয়ার ছুঁড়ে মারতে থাকেন। এক সময় তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে পড়ে যান।

www.pathagar.com

তিনি হাসপাতালে নীত হন এবং পরের দিন মারা যান। এদিকে কেন্দ্রও বার বার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। এরূপ রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারী করে জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। সংবিধান বাতিল, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ এবং সংবাদপত্রে সেন্সরশীপ আরোপ করেন। দুর্নীতির অভিযোগ এনে শেখ মুজিবসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চর্চার পথ নিষ্কন্টক করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ২৭ অক্টোবর একটি ভোজসভা থেকে অভুক্ত অবস্থায় বের করে এনে আইয়ুব খান তাঁকে এক বস্ত্রে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করেন। ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু জেলগেট থেকে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ৩১ জানুয়ারী নিরাপত্তা আইনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে

১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগের একটি অংশ আইয়ুব বিরোধী মোর্চা 'ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' গঠন করে। এসময় আওয়ামী লীগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপর। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তিনিই আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন করা হলে শেখ মুজিব দলের সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবার তিনি স্বাধীনভাবে দল পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'। ১৯৬৪ সালের ২১ জুলাই শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে সম্মিলিত বিরোধিদল (Combined Opposition Party) বা 'কপ' গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপ'-এর প্রার্থী হিসেবে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন।

ফাতেমা জিন্নাহর পরাজয়ের পর শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব খানের পতনের জন্য নিজস্ব চিন্তায় সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধ বাধলে পূর্ববঙ্গ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তর উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে ও

www.pathagar.com

পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আইয়ুব বিরোধী মূল দলগুলোর পক্ষে নেজামে ইসলাম নেতা ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৯৬৬ সালের ৫ফেব্রুয়ারী লাহোরে 'সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন' আহ্বান করেন। সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, "১৭ দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্যে ১২শ' মাইল দূরবর্তী পূর্ববাংলা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় 'এতিমের' মতো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে নিপতিত ছিলো। এজন্য পূর্ববাংলার ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে দল মত নির্বিশেষে সবারই উচিৎ সর্বান্তকরণে ৬ দফা দাবী সমর্থন করা। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে শেখ সাহেব আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী উত্থাপন করে তার ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু সরকার বিরোধী সম্মেলনে ন্যাপসহ প্রতিটি দল ৬ দফা দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে। ১১ ফেব্রুয়ারী তাঁরা লাহোর বিমান বন্দরে শেখ মুজিবুর রহমান এক অনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলনে 'পূর্ব বাংলার প্রাণের দাবী ৬ দফা'র ব্যাখ্যা দিয়ে একে 'বাংগালী জাতির মুক্তির সনদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

লাহোর থেকে দেশে ফেরার পর শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবীকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সফর শুরু করেন । জনগণ তাঁর ৬ দফাকে সানন্দে গ্রহণ করে। এতে শাসক গোষ্ঠী দিশেহারা হয়ে পড়ে । পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান বলেন, "আমি যতদিন গভর্নর থাকবো ততদিন শেখ মুজিবকে জেলেই পচতে হবে।" আইয়ুব খান বলেন "তোমাদের দাবীগুলোর জবাব অস্ত্রের ভাষাতেই দেয়া হবে।"এরপর শেখ মুজিবের উপর জুলুম নির্যাতন শুরু হয়। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে একটার পর একটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করতে থাকে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে খুলনায় জনসভা করে ঢাকায় ফেরার পথে ঢাকার জনসভায় রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তৃতা দেয়ার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে যশোরে গ্রেফতার করে। সাথে সাথে যশোরের এক দল আইনজীবী স্থানীয় কোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন জানায়। কোর্টে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে ঢাকায় এসডিও কোর্টে হাজির হবার নির্দেশ দেয় হয়। পরদিন জামিন বাতিল করে দেয়া হয়। সাথে সাথে জজ কোর্টে তাঁর জামিনের প্রার্থনা জানালে তা মঞ্জুর হয়। বাদ মাগরিব তিনি বাসায় আসেন। সন্ধ্যা ৮ টায় পুলিশ গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে তাঁর বাসায় হাজির হয় । অভিযোগ—তিনি সিলেটের জনসভায় রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁকে গ্রেফতার করে নেয়া হয় কমলাপুর রেলস্টেশনে। সেখান থেকে সিলেট জেলা হাজতে। স্থানীয় আইনজীবীরা হাইকোর্টে তাঁর জামিন প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর হয়। তিনি যখন জেলগেট থেকে বেরিয়ে আসেন তখন একজন সিপাহী তাঁর হাতে ধরিয়ে দেয় আরেকখানা গ্রেফতারী পরোয়ানা। ময়মনসিংহের জনসভায় ৬ দফার অনুকূলে প্রদত্ত ভাষণকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক' অভিহিত করে সরকার এ গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। সে রাতেই ট্রেনযোগে তাঁকে ময়মনসিংহে নিয়ে

www.pathagar.com

আসা হয়। পরেরদিন জজকোর্ট থেকে তাঁকে জামিনে মুক্ত করা হয়। তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। এসময় তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ১২টি মামলা দায়ের করা হয়। অসংখ্য দলীয় নেতা-কর্মী জেলে যায়। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান একটুও দমলেন না। তিনি ৮ মে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় ৬ দফার অনুকূলে ভাষণ দেন। রাতে ঢাকায় ফিরলে তাঁকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ নং ধারার আলোকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ৭ জুন ৬ দফার দাবীতে দেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয়। সরকার হরতাল মোকাবেলায় কঠোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হরতালের দিন জনতা-পুলিশ মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতা-পুলিশ প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সরকারী হিসেব মতে এতে ১৩ জন নিহত এবং পুলিশসহ হাজার হাজার লোক আহত হয়। যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ২০ মাস ১০ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারী দিবাগত রাত একটায় কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর মুক্তির নির্দেশ পাঠানো হয়। সাথে সাথেই ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু বিষয়টি তাঁকে চমকিত করলেও তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি জেলারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্যুটকেস হাতে গেট থেকে বেরিয়ে পরলেন। রাস্তায় দাঁড়ানো দুটো সামরিক জীপের একটি থেকে একজন পাকিস্তানী সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে তাঁকে তাদের সাথে যেতে বললেন। তিনি গাড়িতে উঠলে তাঁকে এক অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালের ২ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে ভারতীয় সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী বি.এন.ওঝার সহায়তায় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় এবং আগরতলা সীমান্ত দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্যের জন্য ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে। ১৯৬৮ সালের ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে ৩৫জন রাজনীতিক, আমলা ও সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে সরকার একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শেখ মুজিব এ ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেন। সরকারের ধারণা ছিলো যে, এ মামলার সাথে শেখ মুজিবকে জড়িত করলে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। আসামীরা সবাই বাংগালী হওয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণ একে বাংগালীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের আর একটি ষড়যন্ত্র বলে ধরে নেয়।

www.pathagar.com

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সত্য-মিথ্যা যাই হোকনা কেন সরকার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে গোপনে বিচার কার্যের জন্য সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি এস.এ রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বিশেষ আদালত গঠন করে। ১৯৬৮ সালের জুনে কুর্মিটোলা সামরিক ছাউনিতে বিচারকার্য শুরু হয়। এ বিচারকার্য বাংগালীদের মধ্যে পাকিস্তান-বিরোধী চরম মনোভাব গড়ে তোলে।

১৯৬৮ সালের নভেম্বরের প্রথমদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ফলে ৭ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্রের মৃত্যু ঘটলে, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচণ্ড আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে আরো চাঙ্গা ও গতিশীল করার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগসহ ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি' (ডাক) গঠন করে। এ আন্দোলন মোকাবেলা করতে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী ব্যর্থ হয়। তাই আইয়ুব সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কামনা করেন। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে বেশি কিছু করতে রাজী হলো না। অতপর তিনি 'ডাক' এর চেয়ারম্যান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহখানকে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিয়ে এক চিঠি লেখেন। 'ডাক' এর পক্ষ থেকে জরুরী অবস্থা ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন প্রত্যাহার, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তিদান, জনসভা-মিছিলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও পুলিশী নির্যাতন বন্ধের দাবী জানানো হয়। আইয়ুব দাবীগুলো মেনে নেন। কিন্তু তারপরও 'ডাক' নেতারা শেখ মুজিবকে না নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে রাজী হলেন না। অতঃপর আইয়ুব শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফ্ফরকে নির্দেশ দেন। তিনি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। মুজিব তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। শেখ মুজিবের এ উক্তি আইয়ুব খানের নিকট পৌঁছানো হয়।

প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়, শেখ মুজিব গোপনে রাওয়ালপিন্ডি যাবেন এবং বৈঠক শেষে গোপনে দেশে ফিরবেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি যেকোনভাবেই হোক ফাঁস হয়ে যায় এবং পত্রিকায় প্রকাশ পায়। দেশব্যাপী এর প্রতিবাদ ওঠে। এসময় শেখ মুজিবকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন পাকিস্তানের গোয়েন্দা কর্মকর্তা এ.বি.এস ছফদার। তিনি ছুটে যান বেগম মুজিবের কাছে। তাঁকে বলেন."আইয়ুবের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ সময় শেখ সাহেব যদি প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যান, তবে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার চিরকালের জন্য মসিলিপ্ত হয়ে যাবে। একমাত্র আপনিই পারেন তাঁকে প্যারোলে যাওয়া থেকে নিরস্ত করতে। পারেন তাঁকে বোঝাতে যে জোরাজুরি করলে আইয়ুব তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। দাবার গুঁটি এখন আর আইয়ুবের হাতে নেই। আপনাকে গিয়েই তা বলতে হবে।" বেগম মুজিব স্বামীর সাথে

www.pathagar.com

দেখা করে বলেন, "তুমি 'প্যারোলে মুক্ত হলে আমি বাড়ী গিয়ে ছেলে মেয়েগুলোকে হত্যা করে আত্মহত্যা করবো।" তারপর শেখ মুজিব তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি তাঁর মুক্তি দাবী করেন। এমতাবস্থায় আইয়ুব তাঁর দাবী মেনে নেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী তাঁকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরোচিত গণসংর্ধনা দেয়া হয়। সংর্ধনা সভায় ৫/৬ লাখ লোক জড়ো হয়। এ সভায়ই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয। তিনি বিজয়ী বীরের মতো ১০ মার্চের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। বৈঠক আর এগোয়নি। আইয়ুব বিকল্প পথ ধরেন।

এমতাবস্থায় দেশের সার্বিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। প্রশাসনিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। অনেকটা নৈরাজ্যমূলক অবস্থা দেখা দেয়। মার্চের মাঝামাঝি আইয়ুব খান মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন। ইয়াহিয়া খানও বৈঠকে আমন্ত্রিত হন। বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনার পর আইয়ুব-ইয়াহিয়ার রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

দেশে দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন জারি হয়। ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'পূর্ব বাংলাকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিয়ে এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।' তিনি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ৬ দফার আলোকে অখণ্ড পাকিস্তানের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে ৬ দফার প্রশ্ন উঠলে শেখ মুজিব বলেন, '৬ দফা তো কোরআন নয় যে তা পরিবর্তন করা যাবে না।' ন্যাপ ভাসানীসহ দেশের বামপন্থী সকল রাজনৈতিক দল শেখ মুজিবের এ নীতির বিরোধিতা করতে থাকে। এমন কি আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের একটি বিরাট অংশও তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে। খোদ মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে এক দফার অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর সাথে শরীক হবার আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনের লক্ষ্যে আগাতে থাকেন।

সাধারণ নির্বাচন ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেয়ার মধ্য

www.pathagar.com

দিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন ৬ দফা বাস্তবায়ন ছাড়া আর কোন পথ নেই। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া রাজনৈতিক নেতাদের অনুমোদনক্রমে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আইনগত কাঠামো আদেশ (এল.এফ.ও) জারী করেন।

৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনের অনুকূলে শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশব্যাপী জনসভা করছিলেন তখন তাঁরই অজান্তে ছাত্র লীগের বৃহত্তর অংশ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ব্যানারে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য আন্দোলনকে জোরদার করে। ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ৩৬ জন এর পক্ষে ভোট দেন। সংগঠনের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শেখ শহীদুল ইসলামসহ ৯ জন এর বিরোধিতা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাবটি পাশ হয়।

স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হবার পর 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। অন্যদিকে শেখ মুজিব ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ডিসেম্বর মাসের ৭ ও ১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে উল্লেখ করেন। ২০ ডিসেম্বর ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তিনি বিরোধী দলে বসবেন না। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরে জটিলতা দেখা দেয়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে ৩০০ ফুট দীর্ঘ নৌকার মতো মঞ্চে লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ পড়ানো হয়। শপথে তাঁরা বলেন, 'কোন অবস্থাতেই আমরা ৬ দফা দাবী থেকে বিচ্যুত হবো না। ৬ দফা কর্মসুচী বাস্তবায়ন আমাদের লক্ষ্য, আমাদের ব্রত।' দলীয় প্রধান শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বিষয়টি সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। তারা ৬ দফার উপর সদস্যদের শপথ গ্রহণের বিষয় নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে আলাপ করেন। জানুয়ারীর ১২ তারিখে স্বয়ং ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়েই শেখ মুজিব কাজ করবেন এবং জাতীয় পরিষদে পেশ করার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তা দেখানো হবে বলে শেখ মুজিব কথা দিয়েছেন। এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সকল দলের ঐক্য পরিলক্ষিত হলেই 'এসেমব্লি' ডাকা হবে। এর পরে ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের কথা হয়।

www.pathagar.com

ভুট্টো প্রেসিডেন্ট পদ দাবী করে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হতে বলেন। শেখ মুজিব তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে ইসলামাবাদে ডাকেন। প্রথমে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। পরে শাসনতন্ত্রের খসড়া দলীয় নির্বাহী কমিটিতে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ১৯ ফেব্রুয়ারী যেতে রাজী হন। কিন্তু ১৮ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো "ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য বধ্যভূমি হবে" বললে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান যেতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ইয়াহিয়া ভুট্টো ও সামরিক আমলাদের পরামর্শে সংসদ অধিবেশন মুলতবী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাতটায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আহসান তাঁর বাসভবনে শেখ মুজিবকে ডেকে প্রেসিডেন্টর সিদ্ধান্তটি জানান। তিনি শুনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং অন্য কক্ষে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে নতুন একটা তারিখ ঘোষণা করতে বলেন। কিন্তু তাঁর সে দাবী উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ বেতারে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবীর কথা ঘোষণা করা হয়। সাথে সাথে বাংলাদেশে এর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে জনতা রাজপথে নেমে আসে এবং হোটেল পূর্বাণীর সামনে এসে জড়ো হয় এবং শেখ মুজিবের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী জানায়। এসময় সেখানে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলছিলো। শেখ মুজিব হোটেলের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। জনতা শান্ত হয়। তিনি সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত বক্তব্য রাখেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ২ মার্চ ঢাকায় এবং পরের দিন সারা বাংলাদেশে ধর্মঘট পালিত হবে। তিনি জনতাকে একথাও বলেন যে, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। এরপর শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য গভর্নমেন্ট হাউজে চলে যান। সেখানে তিনি বলেন,"আজ রাতের মধ্যে যদি পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হয় তাহলে আমি উত্তাল আবেগ আয়ত্তে আনতে পারবো, অন্যথায় আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।" ঢাকা থেকে এ বিষয়ে চেষ্টা চালানো হলো; কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেলো না। অতঃপর ৬ মার্চ জাতীয় পরিষদের নতুন অধিবেশন বসার কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয় ২৫ মার্চ অধিবেশন বসবে। পাশাপাশি ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে চিঠি পাঠান যাতে লেখা ছিলো "আপনি যা দাবী করছেন তার চাইতে বেশি কিছু দিতেও আমার আপত্তি নেই। আমি অচিরেই ঢাকা আসছি, তখনই বিস্তারিত আলাপ হবে।" এমন কি টেলিফোনে মুজিবের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ মার্চ নিজ বাসভবনে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে জনতার স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আলোচনা হয়। সারা রাত ও দিনের অর্ধেক সময় ধরে এনিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না।

www.pathagar.com

অতঃপর শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, জনসভা থেকে তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে চার দফা দাবী পেশ এবং প্রদেশব্যাপী অহিংস আন্দোলনের ডাক দেবেন, যা নিশ্চিতভাবে বাঙ্গালীদের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করবে। দাবী চারটি হলোঃ (১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে; (২) সামরিক বাহিনীর লোকদের অবিলম্বে ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে; (৩) নিহতদের জন্য তদন্ত করতে হবে; এবং (৪) অবিলম্বে অর্থাৎ ২৫ মার্চ পরিষদের অধিবেশন শুরুর আগেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাঁর এই প্রস্তাব কমিটি পাশ করে।

৭ মার্চ বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে চারটি দাবী জানালেন ও দশটি নির্দেশ দিলেন। 'বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দেন।

শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ী দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। তাঁর নির্দেশে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে যায়। মূলতঃ তিনিই তখন বাংলার অঘোষিত শাসক। অফিস-আদালতে তাঁরই নির্দেশ পালিত হয়, অন্য কারো নয়। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য আবার ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ উভয়ের মধ্যে একান্ত বৈঠক হয়। ১৭ মার্চ দু'পক্ষের উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। ১৮ মার্চেও বৈঠক চলে এবং সমঝোতা সৃষ্টি হয়। ১৯ মার্চ আবার দু'জনে বৈঠকে বসেন। সন্ধ্যায় উভয়পক্ষের পরামর্শদাতাদের পৃথক পৃথক বৈঠক হয়। ২০ মার্চ আবারো ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২১ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবের সাথে বৈঠক করেন। ২২ মার্চ পার্লামেন্ট অধিবেশন পুনরায় স্থগিত করা হয়। ঢাকার জাতীয় দৈনিকগুলো "বাংলাদেশের মুক্তি" শীর্ষক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। ২৩ মার্চ দু'পক্ষের উপদেষ্টারা সকাল বিকাল দু'দফা বৈঠক করেন। ২৪ মার্চও অনুরূপ বৈঠক হয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

২৫ মার্চ দেশব্যাপী জনগণ অপেক্ষা করছে শেখ মুজিব কি নির্দেশ দেন তার জন্য। দলে দলে লোক তাঁর বাড়ীর সামনে এসে জড়ো হয়। সবার মুখেই একই কথা- রাতে আর্মী আক্রমণ চালাবে। ভিতরে এ নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিব কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। অনেকেই তাঁকে বলেন, রেডিও-টিভি আমাদের হাতে, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন। দুপুরের পর থেকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে মানুষের ভিড় কমতে থাকে। রাস্তায়ও মানুষজন কম দেখা যায়। সকলের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে। বিকেলে ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান।

আওয়ামী লীগ কর্মীরা সামরিক হামলা মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। সন্ধ্যার পর নেতারাও শেখ মুজিবের বাড়ী থেকে

www.pathagar.com

চলে যেতে থাকেন। যারা অবশিষ্ট ছিলেন তারাও ১০টা সাড়ে ১০টার দিকে চলে যান। তারা শেখ মুজিবকে আত্মগোপন করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি সবাইকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। তাজউদ্দিন আহমদ চলে যাবার সময় শেখ মুজিব তাকে কাছাকাছি কোথাও থাকার পরামর্শ দেন যাতে পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে ২৭ মার্চ আলোচনা করা যায়। কিন্তু সে সুযোগ তিনি আর পেলেন না। রাত ১২টার দিকে আর্মী এসে তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

নির্মম গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্য রাতে ঢাকায় সামরিক অভিযান শুরু করে। ইপিআর, পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে হামলা চালায়। সামরিক বাহিনী যে হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ ও সহিংস কার্যকলাপ চালায় তাতে বাঙ্গালীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য পালাতে থাকে। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরা গ্যারিসন ত্যাগ করতে থাকে। পাক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ঢাকা শহর থেকে জেলা শহরগুলোতেও বিস্তৃত হয়। ২৬ মার্চ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে প্রবাসী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।

মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুজিব নগরে প্রবাসী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ইপিআর, ইবিআর, ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক ও সিভিল সার্ভেন্টদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হতে থাকে। কর্নেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালিত হয়। রাজনৈতিকভাবে সরকার বহির্বিশ্বে প্রচারমূলক কাজে মনোনিবেশ করে। এদিকে দেশের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে পাক-বাহিনী নিয়ন্ত্রন সম্প্রসারিত করতে থাকলে লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্ত হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। প্রায় এক লক্ষ যুবক মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। বর্ষাকালে উভয়-পক্ষের হামলায় ততটা তীব্রতা ছিল না। শীতকালে মুক্তিবাহিনী গেরিলা আক্রমণ জোরদার করে। তারা যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে থাকে। সরবরাহ ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আক্রমণ করে। এ পর্যায়ে বহির্বিশ্বে ভারত সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সহানুভূতি ও সহযোগিতার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারণার ফলে মুক্তিবাহিনী ও

www.pathagar.com

জনগণের মনোবল চাঙ্গা হতে থাকে। পরিস্থিতি সামরিক জান্তার প্রতিকূলে চলে যেতে থাকলে জেনারেল ইয়াহিয়া ২৮ জুন ১৯৭১ রাজনৈতিক সমাঝোতার পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি ৩/৪ মাসের মধ্যে সাংবিধানিক সরকার ও বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের নির্বাসিত আওয়ামী লীগের বহু সদস্যকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে তাদের আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টির মত ডান ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো পাকবাহিনীর সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তাদের সহযোগিতায় শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। মুক্তিবাহিনী প্রথমত দুর্বল রাজাকার বাহিনীকে আক্রমণ শুরু করে এবং বহু ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে। এতে উৎসাহিত হয়ে সেপ্টেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী পাক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আক্রমণ তথা যুদ্ধ পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। এসময় সীমান্তে আক্রমণ জোরদার করা হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। নভেম্বর নাগাদ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনী পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর'৭১ পাকিস্তানের ৯৩,০০০ সৈন্য ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। ন'মাসের যুদ্ধের শেষে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতার পর পরই প্রবাসী সরকার ঢাকায় আগমন করে এবং পূর্ণাঙ্গ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। নতুন সরকারের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল অবাঙ্গালী ও স্বাধীনতা বিরোধী লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আইন-শৃঙ্খলা বিধান করা। এজন্য সরকারকে ভারতীয় বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয়। এসময় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও সিভিল প্রশাসন ছিল অসংগঠিত।

পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয়ের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে পরিবর্তন ঘটে। জুলফিকার আলী ভূট্টো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। পাকিস্তান ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিবুর রহমানের নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী গন্তব্যে যাওয়ার জন্য পিআইএ-র একটি জেট বিমানে পাকিস্তান ত্যাগ করার ব্যবস্থা করে দেয় এবং এর ফলে তিনি লন্ডনে যান। তিনি লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন। বৃটেন তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বৃটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফেরার পথে তিনি দিল্লীতে যাত্রা বিরতি করেন। তিনি ভারতের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে এলে তাঁকে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা জানানো হয়। রেসকোর্স ময়দানে তিনি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধবন্দী পাক বাহিনী ও তাদের দালালদের বিচার করা হবে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের আমলে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা

শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তন করেই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে অন্তবর্তীকালীন সাংবিধানিক আদেশ জারী করেন এবং রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একই আদেশ বলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের যে সকল সদস্য বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করে রাষ্ট্রের সাংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে যেয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিব প্রথমে বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে সাময়িক সংবিধান আদেশের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করেন এবং ১২ জানুয়ারী ১৯৭২ তাঁর কাছে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথেই পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর একই আদেশের ৮নং ধারা বলে মন্ত্রিপরিষদ বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করে এবং প্রধান বিচারপতি তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি সাময়িক সংবিধান আদেশের ৭ ধারাবলে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে। শেখ মুজিব ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন।

১৭ জানুয়ারী শেখ মুজিব অস্ত্র সমর্পণের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৪ জানুয়ারী টাংগাইলে কাদের বাহিনীর কাছ থেকে তিনি অস্ত্র গ্রহণ করেন। ৩০ জানুয়ারীর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার অস্ত্র জমা পড়ে। শেখ মুজিবের আহ্বানে ভারতীয় বাহিনী ১২ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। দুই মাসের মধ্যে বেসামরিক প্রশাসন নতুনভাবে সংগঠিত হয়। সকল জেলা-প্রশাসন পুণর্বহাল করা হয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন গণপরিষদ মাত্র ১২ মাসের মধ্যে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। নতুন সংবিধানে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

দেশে প্রত্যাবর্তন করে মুজিব তাঁর দলকে পুনর্গঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি দলীয় সংগঠনকে পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে আলাদা করেন। এর অর্থ ছিল মন্ত্রীরা দলীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন না। অবশ্য দলের পরবর্তী কাউন্সিল সভায়

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠ্য কন্যা শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

পরিবারের সদস্যদের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

www.pathagar.com

শেখ মুজিবকে সভাপতি পদে থাকার অনুরোধ করা হয়। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এড়াতে মুজিব দলীয় সভাপতির পদে থেকে যান। তিনি ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগকে পুনর্গঠিত করেন। এ সময় আওমী যুবলীগ গঠন করা হয় শেখ ফজলুল মনির নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিববাহিনীর ৬০-৭০ হাজার যুবককে এতে সদস্য করা হয়। মুজিব নিজের রাজনৈতিক ক্যারিশমা সৃষ্টির পাশাপাশি একটি নতুন মতবাদ গড়ে তোলেন এর নাম দেয়া হয় 'মুজিববাদ'। রাষ্ট্রীয় চার মূল-নীতিকেই মুজিববাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতে থাকে। এর সমর্থনে ব্যাপক প্রচার-প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাধীনতার অব্যহিত পরে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ডানপন্থী ও ইসলামপন্থী দলগুলো ছিল নিষিদ্ধ। ন্যাপ, (মোজফর) ও ন্যাপ (ভাসানী), কম্যুনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে । তারা মুজিবের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুরাগের জন্য সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মেজর এম এ জলিলের নেতৃত্বে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়। গোপন উগ্র-বামপন্থীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ফলে সরকার আইন-শৃঙ্খলা মোকাবিলায় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সরকার এ প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি 'রক্ষী বাহিনী' গঠন করে।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এতে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টিতে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করে। এমন কি ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। জাসদের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি থাকে। চরমপন্থী দলগুলো বিভিন্ন জেলায় তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। কোন কোন পত্রিকা সরকার বিরোধী সংবাদ ছাপাতে থাকলে তা নিষিদ্ধ করা হয়। বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদের হয়রানি ও নির্যাতন করা হতে থাকে। আওয়ামী লীগের একটি অংশ শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে শেখ মুজিবকে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তন করে "দ্বিতীয় বিপ্লব" শুরু করার জন্য উৎসাহ দিতে থাকে। অবশেষে ২৫ জানুয়রী ১৯৭৫ সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুমোদনের মাধ্যমে 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর সূচনা করা হয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্র, বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা, কতিপয় মৌলিক অধিকারের বিলোপ, জেলা গভর্নর ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিপ্লবের অংশ হিসেবে শেখ মুজিব সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে "বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ" (বাকশাল) গঠন করেন এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলা থেকে শুরু করে সকল স্তরের লোককে ঐ দলে যোগদান বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। বাকশাল গঠন ও 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রওনক জাহান তাঁর Bangladesh Politics: Problems & Issues গ্রন্থে বলেন:

"Abolition of civil liberties and introduction of a one party system, which was a new experience for Bangladesh, threatened the nationalist bourgeoise. The lowers felt threatened by Mujib's promise of reformimg the British legal system. The press was antagonised by the complete staste takeover of newspapers and publications. Students and teachers, the major source of leadership for all opposition political movements, felt threatened by the total state control of thought and action implicit in the one party system and press restriction. The civil bureaucracy was threatened by the proposed district governor's scheme which made bureaucrats completely subservient to the party. Under the parliamentary system the civil bureaucrats were at least legally in charge of the districts, whereas the new system proposed legally and formally to handover power to political appointees. The surplus farmers were antagonized by the compulsory co-operative scheme. Although the regime repeatedly promised that land ownership would be left intact, surplus farmers feared that compulsary co-operative were a prelude to state to state ownership of land. In short, the "second revolution" proposed to introduce a number of new, untried schemes which created uncertainty and fear in the minds of the major groups in society. The latter were not sure what the new system would bring about. What is worse, though the "second revolution" promised democracy of the Sarbahara (have-nots), Mujib still depended on the same old Awami Leaguers who were discredited as corrupt and inefficient. The cabinet remained the same, and the new national party, Bangladesh

www.pathagar.com

Krishak Sramik Awami League (BAKSAL) was the reincarnation of the Awami League. The "second revolution" used revolutionary rhetoric and thretened to disposses existing power groups, but the instrument Mujib used for the revolution was hardly revolutionary."

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে দু'টি বড় চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। এর একটি হলো ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং অপরটি হলো পুনর্গঠন ও উন্নয়ন। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের স্বাধীন দেশে পুনর্বাসন তথা তাদের জন্য জমি, বাসগৃহ, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা ছিলো সরকারের একটি দুরূহ দায়িত্ব। সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশ ও নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত দলীয় সংগঠন সৃষ্টি করে। জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও কতিপয় দেশ বাংলাদেশের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেয়। সরকার ত্রাণ কর্মসূচীকে সমন্বয় করার জন্য রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পুনর্গঠন করে এবং দলীয় নেতা ও কর্মীদের তাতে সম্পৃক্ত করে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য গঠিত ত্রাণ কমিটিগুলো ছিলো আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের একচেটিয়া দখলে। এ কমিটির ক্ষমতা ও কার্যবিধি ছিলো অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এমন কি এর আইনগত ভিত্তিও ছিল না। হিসাব ও ইনভেন্টরীর ব্যাপারে কমিটিগুলোকে দায়ী করার কোন বিধানও ছিলো না। এসময় বিদেশ থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ১০০ কোটি ডলার (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা) মূল্যের সাহায্য পাওয়া যায়। সরকার গঠিত ত্রাণ কমিটিগুলোর মাধ্যমে সারা দেশে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতারা নিজ নিজ এলাকায় কমিটির মনোনয়ন নিয়ে সত্বর ব্যবসায়ে নেমে পড়েন এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে অর্ন্তদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পরেন। প্রত্যেকেই ছিলেন কমিটিতে নিজ নিজ লোক নিয়োগের পক্ষপাতী ফলে নিম্নতম পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বত্রই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে বিভেদের প্রাচীর এবং সাংগঠনিক ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায়। যেহেতু এ কমিটি ছিলো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব করায়ত্ত করার মাধ্যম বিশেষ। এতে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে এ কর্মকাণ্ডের পেছনে সুপ্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য উধাও হয়ে যায় এবং যথাযথ পরীক্ষণ ও তালিকা প্রণয়নের নিয়ম না থাকায় ত্রাণ সামগ্রীর এক বিরাটাংশ

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত ভোগে চলে যায়। কোন হিসাবযোগ্যতা না থাকায় এভাবে দুর্নীতি সমাজের নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া এই হয়ে দাঁড়ায় যে, যিনিই কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হন না কেন, নৈতিক দিকগুলো বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকেন। এভাবে সারাদেশের ত্রাণ কমিটিগুলো নিদারুণ কুখ্যাতি অর্জন করে।" (মওদূদ আহমদ, ১৯৯৪)।

খাদ্য সংকট

অবিভক্ত পাকিস্তান আমলে দেশের খাদ্য সমস্যা নিয়ে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে বিশেষ কোন উদ্বেগ ছিল না। কারণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিলো পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের। কখনো কখনো খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে বা মূল্য বেড়ে গেলে তার পুরো দায়-দায়িত্ব সহজেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়া হত। আওয়ামী লীগ '৬৯ সালের গণআন্দোলন ও '৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্রমবর্ধমান খাদ্যমূল্যকে 'সোনার বাংলার শ্মশান' হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করতো। 'এব্যাপারে তারা তখন জনসাধারণের ভাবাবেগকে কাজে লাগায় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, চালের দাম মণপ্রতি কমিয়ে ২০ টাকায় নামিয়ে আনা হবে। ১৯৭০-৭১ সালে চালের মণপ্রতি গড়মূল্য ছিলো ৪৮টাকার কাছাকাছি। দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর নিজের দেশের জনগণের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব প্রথমবারের মত আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে অর্পিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অতি প্রচলিত ধারার মুখে রাজনৈতিক নেতারা তখন সমস্যার গভীরতা ও বাস্তবতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা শুরু করেন।' (মওদূদ আহমদ, ১৯৯৪) বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই খাদ্য ঘাটতি ও উর্ধ্বমূল্য মোকাবেলায় সরকারের দক্ষতার উপর নির্ভর করে সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা। শেখ মুজিব ক্ষমতা দখলের পর যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন তার মধ্যে খাদ্য সংকট ছিলো সবচেয়ে গুরুতর। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালে ৫ লাখ টন থেকে ষাটের দশকের শেষ দিকে প্রায় ১৫ লাখ টনে বৃদ্ধি পায়। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়; অপরদিকে ১৯৬৮, '৬৯, '৭০ সালের ভয়াবহ বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য বিনষ্ট হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। এর ফলে তিন লক্ষ টন খাদ্য শস্য বিনষ্ট হয়। ঐবছরে খাদ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১১% হ্রাস পায়। যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারের জন্য খাদ্য সমস্যা সমাধান করা ছিলো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সে সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগের গবেষণা সেলের একটি সমীক্ষায় সম্ভাব্য খাদ্য সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছিলো

www.pathagar.com

যে, আগামভিত্তিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে বাংলাদেশ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবে এবং দেশ একটি সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে।

১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিলো ২০ লাখ টন। ১৯৭২-৭৩ সালে খাদ্যোৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৫% কম হয়; ফলে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লাখ টন। ১৯৭২ সালে এক ভয়াবহ খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৯৭৩ সালে দেশের তিনটি উপকূলীয় জেলা বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হলে কোটি কোটি টাকার ফসল বিনষ্ট হয়। ১৯৭৪ সালে দেশ উপর্যুপরি দু'বার বন্যার কবলে পড়ে। এতে প্রায় ১ কোটি টন ফসল বিনষ্ট হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসনে ১৯৭২ সালে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। ফলে সে সময় মাথাপিছু খাদ্য ভোগের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের চাইতে অনেক নীচে নেমে গেলেও তেমন ভয়াবহ দুর্বিপাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৭৩ এর মে মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ড হেইম বাংলাদেশকে সাহায্য দানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, ১৯৭৩ সালে শরৎকালীন ফসল ওঠার আগেই খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করতে না পারলে দুর্ভিক্ষের কবল হতে বাংলাদেশকে বাঁচানো যাবে না।

১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও দেশের প্রায় ১ কোটি ১৮ লাখ টনেরও বেশি খাদ্য উৎপাদিত হয়। তা সত্ত্বেও সরকার খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সফল করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। সংগ্রহ মূল্য ও খোলাবাজার দরের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান থাকায় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১০%ও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এসময় খাদ্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রা ২২ লাখ টন ধার্য করা হলেও সরকার আমদানী লক্ষ্যমাত্রার চাইতে প্রায় ৫ লাখ টন কম আমদানী করে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও বৈদেশিক আমদানী উভয় প্রকার খাদ্য সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় খাদ্য মওজুদ পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। এ সময় খাদ্যশস্যের চোরাচালান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশ এক মহাসংকটের কবলে পতিত হয়। ফলে 'খাদ্য বিভাগের হাতে যে সামান্য খাদ্য মওজুদ ছিলো প্রতিদিনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের জুন মাসের মধ্যে তলানীতে এসে ঠেকে।' এ অবস্থায় দেশের দুর্ভিক্ষ ছিলো অনিবার্য।

খাদ্য ঘাটতির ফলে চালের দাম লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১-৭২ সালে মধ্যম মানের এক মণ চালের দাম ছিলো ৫৭.১০ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে তা বৃদ্ধি পায় ২৮৮.৪০ টাকায়। একই সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর দাম হু হু করে বাড়তে থাকে যার একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

www.pathagar.com

পণ্য	১৯৭১-৭২	১৯৭৪-৭৫
মসুর ডাল (প্রতি সের)	১.৬২ টাকা	৪.৭৫ টাকা
মাছ	৪.১৯	১১.৭২
গরুর গোস্ত	৩.২৭	১০.৮৫
আলু	০.৯৫	২.৬২
সরিষার তেল	৬.৮৭	৩১.১৭
মরিচ	৫.২৩	৪৬.৬৬
পিঁয়াজ	০.২৭	২.৫৭
লবন	.৪৭	৩.৮৩
চিনি	২.৫২	৫.৮২
লাকড়ি (মণ প্রতি)	৫.১১	১৪.৭৪

তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপত্র,

১৯৭৪ সালে প্রায় সকল সামগ্রীর মুল্য ৩০০%-৪০০% এবং একই বছরে পণ্যমূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০০% বৃদ্ধি পায়। কোন কোন স্থানে চালের দাম সের প্রতি ১০ টাকা, শুকনো মরিচ সের প্রতি ১০০টাকা, ১ পাউন্ড গুঁড়ো দুধ ৮০ হতে ৯০ টাকায় বৃদ্ধি পায়।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি

১৯৭৪ সালে সারাদেশে দুর্ভিক্ষ ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে থাকে। দেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিল। রংপুর ও ময়মনসিংহের মতো এলাকাগুলোতে দুর্ভিক্ষ ছিলো মারাত্মক। মানুষের কর্মসংস্থান ছিলো না। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতাও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো। গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষ দলে দলে শহরাঞ্চলে এসে ভিড় জমাতে থাকে। এমতাবস্থায় খাদ্যমন্ত্রী সমগ্র জাতিকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন যে, সরকারের হাতে যথেষ্ট চালের মওজুদ রয়েছে। খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। সরকার এরূপ পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়ী, মজুদদার, কালোবাজারী ও চোরাচালানীদের দায়ী করে বললেন, তারাই

www.pathagar.com

খাদ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে খাদ্যমন্ত্রী বললেন যে, সংকট মোকাবেলার জন্য প্রতিমাসে দুই লক্ষ টন করে খাদ্য আমদানী করা হচ্ছে। কিন্তু পরিহাস! ঐ পরিমাণ খাদ্য আর দেশে এসে পৌছেনি। এসময় সরকারী গুদামে চালের মজুদ দ্রুত হ্রাস পেতে থাকলে অনেক জেলায় রেশন প্রথায় খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়। এসময় অসংখ্য মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মিষ্টি আলু, কচু, কলার থোর, চালের কুড়া, ভাতের মাড় ও নানা রকম লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। দেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তখন প্রায় সকল রাজনৈতিক দল সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল। ব্যাপকভাবে সীমান্ত চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতে চাল পাচারের অভিযোগও উত্থিত হয়েছিলো। সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিনিয়ত চোরাচালানের খবর ছাপা হচ্ছিল। সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হয়। ক্ষমতাসীন দলের বহু নেতা-কর্মী এতে ক্ষুব্ধ হন। শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই তাদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। 'দেশের ভুখা মানুষের দুর্দশা লাঘব'-এর দাবীতে মওলানা ভাসানী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট করার ঘোষণা দেন। তিনি অনশনরত অবস্থায় এক বিবৃতিতে বলেন,

"খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং সীমান্তে ব্যাপক চোরাচালানের ফলে দেশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার ও অন্যান্য গ্রামীণ পেশার প্রায় ৮৬% লোক গত দু'মাস যাবৎ তাদের জন্য পর্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করতে পারেনি।"

অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও দুর্ভিক্ষের আশংকায় সরকারকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায়নি। সরকারের তরফ থেকে দুর্ভিক্ষের জন্য বিভিন্ন কারণ যেমন—উপর্যুপরি কয়েক বছর পর্যন্ত বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ও চালের আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। তৎকালীন পরিস্থিতির উপর প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্য সংগ্রহের ব্যর্থতার পেছনে ঐসব কারণ কোন না কোনভাবে দায়ী ছিলো এতে সন্দেহ নেই। 'কিন্তু ঐগুলোই বাংলাদেশে অসংখ্য প্রাণ হরণকারী দুর্ভিক্ষের জন্য এককভাবে দায়ী ছিলো না।' বিভিন্ন মহল থেকে দাবী করা হয় যে, ঐ দুর্ভিক্ষ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। 'ক্ষমতাসীন সরকারের অযোগ্যতা, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি এবং সে সাথে ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণীর অবহেলা ও উদাসীনতা ছিলো দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানত দায়ী। চোরাচালানীর ব্যাপকতাও ছিলো দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।'

www.pathagar.com

পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন

১৯৭০ সালে নির্বাচনের সময় প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিশেষ কোন অর্থনৈতিক দিক দর্শনের উল্লেখ ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে মুজিব নগরের প্রবাসী সরকারও কোন রূপরেখা প্রণয়ন করেনি। ফলে জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করেই তড়িঘড়ি করে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ৩রা জানুয়ারী জারীকৃত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশের মাধ্যমে অবাংগালী মালিকানার কোটি কোটি টাকা মূল্যের অসংখ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকার ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও প্রশাসক নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে উক্ত আদেশ 'বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশ' (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়) ১৯৭২ এর সাথে সমন্বিত করে নেয়া হয়। এ আইনের বলে শুধু বাংগালীদের নয়, দেশের আইনগত নাগরিকদের সম্পত্তি দখলের জন্য সরকারকে অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়। এ আদেশটি রাষ্ট্রপতির ১৬ নম্বর আদেশ বলে পরিচিত। উক্ত আইন বাস্তবায়ন করতে যেয়ে সরকারী আমলাদের প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তা জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে মওদুদ আহমেদ তাঁর 'বাংলাদেশ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল' নামক গ্রন্থে বলেনঃ

> " আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার না থাকায় এর প্রায়োগিক বিধি ক্ষমতাসীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত এক শ্রেণীর লোকের জন্য লুটপাটের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এ আইন বেপরোয়াভাবে ব্যবহারের সুবিধা থাকায় যারা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলো শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তিই নয়, এমন কি যারা স্ব-শরীরে উপস্থিত ছিলেন এমন অনেক মালিকের সম্পত্তিও দখল করে নেয়া হয়। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের সাথে সাথে এ আইন এক ধরনের লোকদের জন্য সম্পত্তি অর্জনের উৎস হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। ------সরকারী আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা এবং উশৃঙ্খলতার সুযোগে রাজনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কার্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এ আইন অপরের সম্পত্তি আইনের আবরণে লুট করার সুযোগ এনে দিয়েছিলো। ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা-কর্মীরা সরকারের ভীতসন্ত্রস্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন

www.pathagar.com

এবং পক্ষান্তরে তাদেরই সাহায্য নিয়ে সরকারের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা তাদের লুটের অংশীদারে পরিণত হন। এমনও দেখা গেছে যে, নিছক সামাজিক ও রাজনৈতিক শত্রুতা বশে মালিক উপস্থিত জেনেও একজনের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে দখল করে নেয়া হয়েছে। যে সমস্ত অবাঙ্গালী ভারতীয় বা বিহারী দু'বছর আগে বাংলাদেশে মাইগ্রেশন করে বসতি স্থাপন করেছিলো এবং পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেনি, ভীতি প্রদর্শন করে এমন প্রায় সকল অবাঙ্গালীর সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে দখল করে নেয়া হয়। রাজনৈতিক প্রতারকেরা তাদের বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।"

তথাকথিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ঢালাওভাবে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর অর্পণ করা হয়। দলীয় লোকেরা ব্যবস্থাপক, প্রশাসক বা বোর্ড সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভ করে। অনেক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞানবিহীন অদক্ষ দলীয় নেতা-কর্মীদের ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ফলে পাকিস্তানী শিল্পপতি ও তাদের বিশ্বস্ত ও দক্ষ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য পাটকল, বস্ত্রকল ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ কতিপয় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও দুর্নীতিবাজ ব্যবস্থাপকদের করায়ত্ত হয়। এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, ঐসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশে চালান করে দেয়া হয়। পরিণতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পঙ্গু হয়ে পড়ে, উৎপাদন ক্ষেত্রে দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। অচিরেই এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সেগুলো বন্ধ বা বিক্রি করে দেয়া হয়। সম্ভবত এটা ছিলো এমনি একটা ক্ষেত্র, যেখানে মন্ত্রী, সরকারী কর্মকর্তা, ষোড়শ বাহিনীর সদস্য যাই হোক না কেন তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের ছিটেফোটা ছিলো কিনা সন্দেহ। তাদের আত্মীয়-স্বজন, সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তদের কথাতো বলাই বাহুল্য।'

ব্যাঙ্ক, বীমা ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবিচার দূর করে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা হবে। এতে আরো বলা হয়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, পাট ও তুলা বাণিজ্য, শিপিং তথা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হবে। এছাড়াও ঐ ইশতেহারে শিল্পোদ্যোগের ইক্যুইটি মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির

www.pathagar.com

খাজনা মওকুফ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় আরোহণ করে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে উল্লেখ করেন যে, অবিচার ও শোষণমুক্ত একটি সমাজ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয়করণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের জাতীয়করণ কর্মসূচীর অধীনে পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের মতো মৌলিক শিল্পখাতগুলোকে পৃথকভাবে তিনটি তফসীলে বিভক্ত করা হয়। প্রথম তফসীলে ৫৭টি পাটকল, ২য় তফসীলে ৬৪টি বস্ত্রকল, ৩য় তফসীলে ১৫টি চিনিকল নিয়ে যথাক্রমে বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা এবং বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থা নামক তিনটি পৃথক সেক্টর কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এছাড়াও পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশবলে দখলকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকারী সিদ্ধান্ত মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে আরও সাতটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে শিল্প জাতীয়করণ একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলেও দুর্নীতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে জাতির কল্যাণের পরিবর্তে তা অভিশাপ বয়ে আনে। এক পরিসংখ্যান মতে ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের রপ্তানী আয় ৩৬.৩৮ শতাংশ হ্রাস পায়। চিনির উৎপাদন ৭৯%, নিউজপ্রিন্ট ২৫%, ম্যাচ ৪%, সিগারেট ৬৫%, কাগজ ৭১% এবং পাটজাত দ্রব্যের উৎপদন ২৪% হ্রাস পায়। এছাড়া কাঁচা পাট রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা দুই-তৃতীয়াংশে হ্রাস পায়। ১৯৭২-৭৩ সালে কেবলমাত্র পাটকলগুলোই ২৫ কোটি টাকা লোকসান দেয়। মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৩৮৭ কোটি হতে বেড়ে ১৯৭২-৭৩ সালে ৬৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যার সঙ্গে উৎপাদনের কোন সামঞ্জস্য ছিলো না।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ ঘোষণা করে মোট ১২টি ব্যাংকের মালিকানা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলোকে সমন্বিত করে নতুন নামের ৬টি নতুন ব্যাংক গঠন করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের মত জাতীয়করণকৃত ব্যাংকগুলোতেও প্রশাসন ও কার্যপরিচালনায় চরম অরাজকতা দেখা দেয়। 'রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপে ব্যাংকের আইন এবং ঋণদান নীতি উপর্যুপরি লঙ্ঘন করা হতে থাকে। অভিযোগ রয়েছে যে, এসময় সত্যিকারের একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যাংকের সহায়তা লাভ করা ছিলো কঠিন; কারণ ব্যাংকগুলো মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। ব্যাংকগুলোতে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম এবং স্বজনপ্রীতির ফলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এসে ব্যাংক লুট দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। সংঘবদ্ধ দলগুলো ব্যাংকের কর্মচারীদের সহায়তায় ব্যাংকের সিন্দুক ভেঙ্গে নগদ টাকা লুট করতে থাকে। দুর্বল প্রশাসন ও ঘন ঘন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে এ ধরনের ব্যাংক ডাকাতির কারণ ও প্রেক্ষাপট সনাক্ত করা যায়নি এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়নি কোন উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের শাসনামলে অর্থনৈতিক কর্মসূচী

শেখ মুজিব ষাটের দশকে প্রধানত ৬দফা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ৬ দফা কর্মসূচী ছিলো মূলত পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সম্পদের বন্টন সংক্রান্ত এবং স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন বিষয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ যে মেনিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে দলটির অর্থনৈতিক কর্মসূচী তুলে ধরা হয়। এর প্রধান প্রধান দিক ছিলঃ (ক) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন; এবং এ লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, পাট শিল্প ও বস্ত্রকলসহ অন্যান্য বৃহৎ শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করা; (খ) ভূমি সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যে পুনঃবন্টনের উদ্দেশ্যে ভূমি মালিকানায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়ন; এবং (গ) কর ও রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন, বিশেষ করে লবণ কর এবং ৮ (আট) একরের জমি মালিকদের জমির খাজনা মওকুফ।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনে প্রদত্ত অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্র', 'গনতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র আদর্শ হবে এ সংবিধানের মূলনীতি। সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র'কে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এক ঘোষণায় বলেন, আমি আমাদের শ্রমিকদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সমাজতন্ত্রের মৌল উদ্দেশ্য অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও তাদের কল্যাণ নিশ্চয়তা করতে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে যাতে শিল্প-কারখানার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণসহ জাতীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। তবে শ্রমিকরা অবশ্যই শিল্প-কারখানার বর্ধিত উৎপাদনের সুফল পাবে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের আলোকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সরকার ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিকল্পনা কমিশন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করে। আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য পরিহার করে সরকার প্রধানত টেকনোক্র্যাট ও অর্থনীতিবিদদের পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হয়। এসব ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। কমিশনে আমলাতন্ত্রের প্রভাব খর্ব হওয়ায় প্রশাসন যন্ত্রের প্রভাবশালী আমলারা তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে কমিশন ও প্রশাসনের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাব দেখা দেয়।

পরিকল্পনা কমিশনের উপর দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রকল্পগুলোর জন্য বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ এবং এ সংক্রান্ত সমঝোতা প্রক্রিয়া সম্পাদনের দায়িত্ব কমিশনকে দেয়া হয়। এছাড়া সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও পরিকল্পনা কমিশনকে দেয়া হয়। ফলে এসংস্থার তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে আসা হয়। প্রকল্প পরীক্ষা ও অনুমোদন থেকে শুরু করে সকল দায়-দেনার বিষয়াদিও পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের জন্য পাঠানো হতে থাকে। কাজের পরিধি ব্যাপকতর হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন নিজেই একটি 'আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে' পরিণত হয়।

পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য শিল্প-কারখানা জাতীয়করণের জন্য সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন পেশ করে। কমিশনের মতে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে 'আয় বন্টনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির অবসান, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ এবং উৎপাদন সম্পর্কে প্রাক-পুঁজিবাদী মার্কেনটাইল ও সামন্তবাদী কাঠামোর বিলোপ সাধন'। কমিশনের মতে এ উদ্দেশ্যে সংস্কার কর্মসূচী হওয়া উচিৎ ঃ ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের জন্য সমবায় ব্যবস্থা, বৃহৎ ভারী ও মৌলিক শিল্প-কারখানা সরকারী খাতে আনয়ন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ও সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালনা এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও খুচরা ব্যবসা বেসরকারী মালিকানায় পরিচালনা। সার্বিকভাবে কমিশন অর্থনীতিতে একটি মিশ্র কৌশল অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করে। পরবর্তীতে এ উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সরকার কতগুলো মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন—শিল্প-কারখানা ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, দেশী ও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের উপর সীমা নির্ধারণ, ভূমি সংস্কার ও পল্লী প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১৭৫টি শাখা ছিলো। জাতীয়করণের ফলে শিল্প খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অংশ দাঁড়ায় শতকরা ৯২ ভাগ যা ১৯৭০ সালে ছিলো মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ। পক্ষান্তরে, বেসরকারী খাতের শিল্পায়ন শতকরা ৬৬ ভাগের স্থলে মাত্র ৮% এ নেমে আসে। নিম্নোক্ত সারণীতে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

www.pathagar.com

	১৯৬৯-৭০		১৯৭২ সালের পর	
মালিকানা	এসেট এর মূল্য (মিলিয়ন টাকা)	ফিক্সড এ্যাসেট এর শেয়ার (%)	এসেট এর মূল্য (মিলয়ন টাকা)	ফিক্সড এসেট-এর শেয়ার %
রাষ্ট্র	২,০৯৭.০	৩৪	৫,৬৩৭.৫	৯২
বেসরকারী	৪,০৪০.৫	৬৬	৫০০.০	৮

সূত্রঃ রেহমান সোবহান ও মুজাফফর আহমদ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ইন অ্যান ইন্টারমিডিয়েট রেজিম, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১৯৮০), পৃ. ১৯২.

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প-কারখানা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০টি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এ সকল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানদের নিয়োগ প্রদান করতেন প্রধানমন্ত্রী। ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক পুনর্গঠন করে যে ৬টি তফসিলী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় তার ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংককে। কৃষি, গৃহায়ন ও শিল্প খাতকে আর্থিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা গঠন করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। আমদানী বাণিজ্যকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) গঠন করা হয়। পাট ব্যবসা ব্যবস্থাপনার জন্য জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ও জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠন করা হয়।

বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ

ব্যাপক জাতীয়করণের ফলে বেসরকারী খাত সীমিত হয়ে পড়লেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী মালিকানায় রয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে এক আদেশবলে বেসরকারী বিনিয়োগের সিলিং ২.৫ মিলিয়ন (২৫লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করে। সরকার কর্তৃক এ সীমা নির্ধারণের ফলে বেসরকারী খাতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদের মাত্র ২৭টি প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট থেকে যায়। এছাড়া ৫ লক্ষ টাকার নীচে সম্পদ সম্বলিত পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার সংখ্যা রয়ে যায় ৩৩০,৪০০টি।

বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সমভাবে বিনিয়োগের সিলিং নির্ধারণ করা হয়। এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, বৈদেশিক বিনিয়োগ কেবলমাত্র বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে

www.pathagar.com

হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ইক্যুইটি মূলধনের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৫১% ভাগ। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র ইক্যুইটি অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থানীয় বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে লাইসেন্স ও পেটেন্টের অনুমতি দেয়া হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কর-উত্তর মুনাফা তাদের নিজ দেশে পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়, তবে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর প্রথম দশ বছরে অর্জিত মুনাফা একটি কিস্তিতে বিদেশে প্রেরণ করা যাবে না; বরং দশ বছরে বিভক্ত করে তা পাঠাতে হবে।

সরকার এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগে মারাত্মকভাবে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। ১৯৭৪ সাল নাগাদ খোদ আওয়ামী লীগেরই বহু নেতা-কর্মী অভিযোগ করতে থাকে যে, বেসরকারী বিনিয়োগের সিলিং অত্যন্ত কম হয়েছে এবং শিল্পায়নের স্বার্থে তা বাড়ানো প্রয়োজন। অবশেষে বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে আলোচিত হয়। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিনিয়োগ সিলিং বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, শিল্প যন্ত্রপাতির মূল্য শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে মাত্র ২৫ লক্ষ টাকায় কোন ভাল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। তিনি আরো বলেন যে, শিল্পোদ্যোক্তারা প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ গোপন করে সরকারের অনুমতি লাভের জন্য কম করে দেখাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, অভিজ্ঞ শিল্পপতিরা দেশের সম্পদ। সুতরাং দেশের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে তাদের অভিজ্ঞতাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর স্বার্থে সিলিংয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিনিয়োগের সিলিং তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছিলেন; কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রী এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। অবশেষে আপোষ ফর্মূলা হিসেবে বিনিয়োগ সিলিং ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। একইভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেও সরকার বেশ কিছু ছাড় দেয়।

কৃষি ও ভূমি সংস্কার

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ৮০% বিধায় এর গুরুত্বকে বিবেচনা করে পরিকল্পনা কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে যে, কৃষিখাতে সংস্কার ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই কমিশন উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ভূমি সংস্কারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

১৯৭২ সালের ১৪ আগস্ট The Estate Acquisition and Tenancy Order, 1972 জারি করা হয় এবং এর আওতায় কোন পরিবারের ২৫ বিঘা পর্যন্ত

www.pathagar.com

জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়া হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিংস (লিমিটেশন) অর্ডার, ১৯৭২ সালের ১৫ আগস্ট জারি করা হয়। এর আওতায় দেশে প্রতি পরিবারের জন্য ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যাদের ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি ছিলো তাদের এ আদেশ জারির ৯০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট বিবরণী প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। অতিরিক্ত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বলা হয়। এক হিসেব মতে সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ১০০ বিঘার অতিরিক্ত প্রায় ১২ লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া যেত যা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হত। কৃষি খাতের সংস্কারের জন্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচী অতীতের যে কোন কর্মসূচীর চেয়ে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈপ্লবিক ছিলো। কিন্তু বাস্তবে সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা নানা কারণে অর্জিত হয়নি।

পল্লী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ভুমিহীন কৃষকদের সহায়তা দানের জন্য সরকার দ্রুত পল্লী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে চার হাজার ইউনিয়নব্যাপী একটি ভোগ্যপণ্য সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংস্থার আওতায় উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে ভূমিহীন কৃষক ও ঘাটতি এলাকায় বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিলো মধ্যস্বত্বভোগীর শোষণ বন্ধ করা। কৃষকদের সঞ্চয় ও আয় পুনর্বন্টনের উদ্দেশ্যে পল্লী সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আইয়ুব খান প্রবর্তিত পল্লীপূর্ত কর্মসূচী সংশোধন করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি গ্রামে সর্বস্তরের লোকদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পল্লীর সমবায় সমিতিগুলোকে তত্ত্বাবধানের জন্য সমবায় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিলো তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে বলা হয় যে সার্বিকভাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেঃ (১) ১৯৭৩-৭৮সালের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং (২) জাতীয় বেতন ও চাকরী কমিশনের কতিপয় সুপারিশ বাস্তবায়ন। প্রথম

www.pathagar.com

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের আলোকে প্রণীত হলেও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তা অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কোনটাই হাসিল করতে পারেনি। ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি শেখ মুজিব ও তাঁর দলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও সরকারের অর্থনৈতিক তৎপরতা ছিলো অত্যন্ত দুর্বল ও অসন্তোষজনক। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার এবং উৎপাদনের মাত্রা ১৯৬৯-৭০ সালের স্তরে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সরকার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে শিল্প ও কৃষি খাতে মোট উৎপাদন ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় যথাক্রমে ২৫% ও ২৩% কম। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৯৮ লাখ টনের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ১৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। এটা প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রার ১ কোটি ২৫ লাখ টনের চেয়ে কম হলেও ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন ১ কোটি ১২ লাখ টনের চেয়ে বেশি ছিল। সার প্রযুক্তি প্রয়োগ ও খাদ্যশস্য সংগ্রহে তৎপরতার কারণে সে বছর সরকার ১৯৬৯-৭০ সালের স্তর অতিক্রম করতে পেরেছিল। কিন্তু শিল্পখাত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকে। বিদ্যুৎ, গৃহ নির্মাণ এবং সড়ক ও জনপথ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য সামাজিক খাতে অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশ পিছিয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক লেনদেনে ভারসাম্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমদানী ব্যয় প্রাক্কলিত হিসাবের চেয়ে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, রপ্তানী আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২২ কোটি টাকা পিছিয়ে থাকে। লেন দেনে ভারসাম্যের এ ঘাটতির মুখে আবার বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০ কোটি টাকা হতে ৩০৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। এমতাবস্থায় সরকারকে ২১ কোটি ৭০ লাখ ডলারের স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের দিকে হাত বাড়াতে হয়।

'জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী খাদ্যের মওজুদ স্বল্পতা এবং সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে বিশ্ববাজারে খাদ্য ও খাদ্যসামগ্রীর দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আমদানী ব্যয় প্রাক্কলিত ধারণার চাইতে বেশি হলেও আমদানির প্রকৃত পরিমাণ ছিলো অনেক কম।' এসময় এসকল কারণে বিশ্ববাজারে খাদ্য শস্যের মূল্য ৯১% এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্য ৭৫% বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হয় এবং তা লক্ষ্যমাত্রা হতে ১২.৬% পিছিয়ে থাকে। ঐবছরও খাদ্য ঘাটতি অব্যাহত থাকে এবং ২৬ লাখ ৪০ হাজার টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। ঘোড়াশাল সার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পায় ৭৭%।

www.pathagar.com

পাটের উৎপাদন আগের বছরের ৬০ লাখ বেল হতে কমে ৪০ লাখ বেলে হ্রাস পায়। সার্বিক শিল্পোৎপাদনও কমে যায়। পাট রপ্তানি ৮% হ্রাস পায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। কাঁচা পাট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৩৬ লাখ বেল নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবে ২৭ লাখ বেলের বেশি রপ্তানি হয়নি। পাটজাত সামগ্রীর লক্ষ্যমাত্রা ৪৪ লাখ টন নির্ধারণ করা হলেও রপ্তানি করা হয় মাত্র ৩৯ লাখ টন।

আমদানী কম হওয়ায় তা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০.১০কোটি টাকার চেয়ে ১৩০.৩০ টাকা কম ছিল। ফলে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ১৫৪কোটি ৭০ লাখ টাকা লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা ১৯ কোটি টাকায় নেমে আসে। খাদ্য ভর্তুকি বাবদ প্রচুর অর্থ অপ্রত্যাশিত খাত থেকে খরচ হয়ে যাওয়ায় রাজস্ব উদ্বৃত্ত শেষ পর্যন্ত ঘাটতিতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় দেশের সার্বিক অর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য বেড়ে গিয়ে তা ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায়ও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বছর জিনিস পত্রের গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪০% বৃদ্ধি পায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেনে ভারসাম্য পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়। আমদানী লক্ষ্যমাত্রা ৭৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হলেও প্রকৃত আমদানী হয় ৯৭১ কোটি টাকা। টাকার অংক বাড়লেও আমদানির প্রকৃত পরিমাণ ছিলো অপেক্ষাকৃত কম। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য ও সার আমদানী বেড়ে যাওয়ায় তা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়কে বাড়িয়ে দেয়। এসময় রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রাও ব্যর্থ হয়। রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৩৪৮ কোটি টাকা। কিন্তু অর্জিত হয় মাত্র ২৯৬ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা ব্যাপকভাবে কমানো হয়। এতে তৎকালে বিদ্যমান ৬২% ভাগ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা ১৯৭৭-৭৮ সালের তা ২৭% ভাগে কমিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এলক্ষ্যে অর্থনীতির বাস্তব ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা না করেই অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা হ্রাসের উপর জোর দেয়া হয়। সরকারের এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পাশ্চাত্যের সাহায্যদাতা দেশগুলো বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম গঠনে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতির বাস্তব পরিস্থিতি এটাই দাঁড়ায় যে, দু'

www.pathagar.com

এক বছরের ব্যবধানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য লেন-দেন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অবশেষে সরকার পাশ্চাত্যের সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৭৪-৭৫ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৮০ শতাংশের বেশি। এমন কি সরকার সাহায্য দাতা গোষ্ঠীর চাপে বাংলাদেশের বিদেশী বিনিয়োগের সিলিং প্রায় ১২ গুণ বৃদ্ধি করে ২৫ লাখ টাকা থেকে ৩কোটি টাকায় নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়। সরকার আরো ঘোষণা করে যে, যে সমস্ত শিল্পে উৎপাদন শুরুর পর বিনিয়োগ করা হবে সেগুলোকে ১৫ বছরের মধ্যে জাতীয়করণ করা হবে না এবং ঐ সময়ের পরেও যদি কোন শিল্প জাতীয়করণ করা হয় তবে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এভাবে সরকার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসতে থাকে। প্রথম পরিকল্পনাকালে বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল ৫.৫%। এতে করে বার্ষিক মাথাপিছু নীট প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫%। এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো ১৯৬৯-৭০ সালকে বেঞ্চমার্ক ধরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালকে বেঞ্চমার্ক ধরা হলে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা হয় ৮.৮% এবং মাথাপিছু আয় হয় ৫.৭%। বাস্তবিকপক্ষে এ লক্ষ্যমাত্রা ছিলো অসম্ভব ও উচ্চাভিলাষী। প্রায় প্রতিবছর বন্যা, তদুপরি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে এক দারিদ্রপূর্ণ অবস্থায় ১৯৭০-৭১ সালে মাথাপিছু আয় অবিভক্ত পাকিস্তানের ১৯৬৯-৭০ এর চাইতে ২২% কমে যায়। ১৯৭২ সালে এসে ধানের উৎপাদন ১৫%, শিল্পোৎপাদন ৩০%, পাট শিল্পোৎপাদন ২৮% হ্রাস পায়।

বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সরকারী বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি প্রশাসনিক ও চাকরী পুনর্বিন্যাস কমিটি এবং একটি বেতন কমিশন গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনিক ও চাকরী পুনর্বিন্যাস কমিটি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসহ সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্টের সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে প্রশাসন ও চাকরী কাঠমোতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হত। কিন্তু ঐসব সুপারিশমালা কায়েমী স্বার্থবাদী আমলাতন্ত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিলো বলে তারা ঐ রিপোর্টের সুপারিশকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। মুজিব সরকার শুরুতে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও দেশের অবনতিশীল অর্থনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে অবশেষে তাদের প্রতি নমনীয় হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে প্রশাসনিক ও চাকরী পুনর্বিন্যাস কমিটির প্রতিবেদন আর কোনদিন আলোর মুখ দেখতে পায়নি। তবে একই সময় যে বেতন পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠিত হয়েছিল সে কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করলে তা কার্যকর করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ রিপোর্টের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ ছিল সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীর জন্য পাকিস্তান আমল থেকে প্রচলিত ২২০০ টি বেতন স্তর সংকুচিত করে মাত্র ১০টি জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন করে। বেতন কাঠামো যৌক্তিকীকরণ এবং স্বল্প ও উচ্চ বেতনের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের ব্যবধান কমিয়ে আনা ছিলো এ সুপারিশের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত ১ঃ ১৪৩ থেকে কমিয়ে ১ঃ ১৫.৩৮ নামিয়ে আনা হয়। বিদ্যমান স্কেলের সর্বনিম্ন বেতন ৫৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩০ টাকা এবং সর্বোচ্চ বেতন ৪০০০ টাকা হতে কমিয়ে ২০০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়।

> "প্রাথমিক ভাবে এব্যবস্থা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করলেও বেতন সুবিধা যাই হোক না কেন, সরকারের এ উদ্যোগ একটি সাহসী পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার সকল কর্মচারীর জন্য একটি বেতন স্কেল প্রণয়নের কাজটি যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশও এত অল্প সময়ের ব্যবধানে তা করতে পারেনি।"

সমাজতন্ত্র ও আওয়ামী লীগ সরকার

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে যে অর্থনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা হয় তা বস্তুতপক্ষে আওয়ামী লীগের সমর্থক শ্রেণী অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বিশেষভাবে সুবিধা প্রদান করে। আওয়ামী লীগ ছিলো শহরকেন্দ্রিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি রাজনৈতিক দল। এ দলটির সমাজতন্ত্রের প্রতি কোন আদর্শিক অঙ্গীকার ছিলো না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় দলটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলো। স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্ষমতা লাভ করে আওয়ামী লীগ সরকার সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে নয়, বরং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় আওয়ামী লীগ তখন সমাজন্ত্রের কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে সমাজতন্ত্রের অর্থ ছিলো রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কয়েকটি খাতের জাতীয়করণ। কারো কারো মতে আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্রের ঘোষণা ছিলো তখনকার দিনে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

www.pathagar.com

রোমান্টিকতা। যদিও দলটি প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রের নীতির কথা বলত, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় তা তারা কোন দিনই পরিষ্কার করে বলেনি। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, আওয়ামী লীগ একদিকে সমাজতন্ত্রের নামে পঁচিশ বিঘার উর্ধ্বের জমি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার ঘোষণা দিলেও দলটি সর্বদাই পল্লীর উদ্বৃত্ত ভূমি মালিকদের উপর নির্ভরতা অব্যাহত রাখে। এছাড়া শহর এলাকার আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত পেশাজীবীরা ছিলো তাদের সমর্থনের ভিত্তি।

দৃশ্যত মনে হতে পারে যে, শিল্প-কারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ও আধিপত্যের উপর এবং ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বড় বড় ভূ-স্বামী ও জোতদারদের কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত হেনেছিলো। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এর ফলশ্রুতি ছিলো ভিন্ন রকম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে সকল বড় বড় শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করা হয়েছিলো তার প্রায় সবগুলোর মালিকই ছিলো অবাংগালী যারা স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলো। অপরদিকে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে নেয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছিলো তা কোনদিনই সফল হয়নি। কারণ উদ্বৃত্ত জমি মালিকদের প্রায় সকলেই ছিলো আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য, নেতা বা সমর্থক। এছাড়া বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর উপরেও সরকার তেমন খবরদারি করতে পারেনি; কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পাকিস্তানী অবাংগালী শিল্পপতিদের ছাড়া মাত্র ২০ টি শিল্প-কারখানা বিদেশী কোম্পানীর মালিকানাধীন ছিলো। এর মধ্যে ১৬ টিই ছিলো ঔষধ তৈরির কারখানা। এসব বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক শিল্প খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো শতকরা এক ভাগেরও কম। এছাড়া দু'টি বিদেশী কোম্পানীর শাখা ছিলো, তাদেরও প্রধান অফিস ছিলো করাচীতে। জাতীয়করণকালে এ দু'টি কোম্পানীর মোট ডিপোজিটের পরিমাণ ছিলো ৮.৪ ভাগ।

জাতীয়করণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর বিদেশী কোম্পানীগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায়নি। কারণ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা, দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো, স্থানীয় ক্ষুদ্র বাজার এবং নতুন রাষ্ট্রের অনিশ্চিত সম্ভাবনার কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিনিয়োগের জন্য আগমনের ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। ১৯৭৪ সালে শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের সিলিং বাড়ানো হলেও সরকারীভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়নি বললেই চলে।

www.pathagar.com

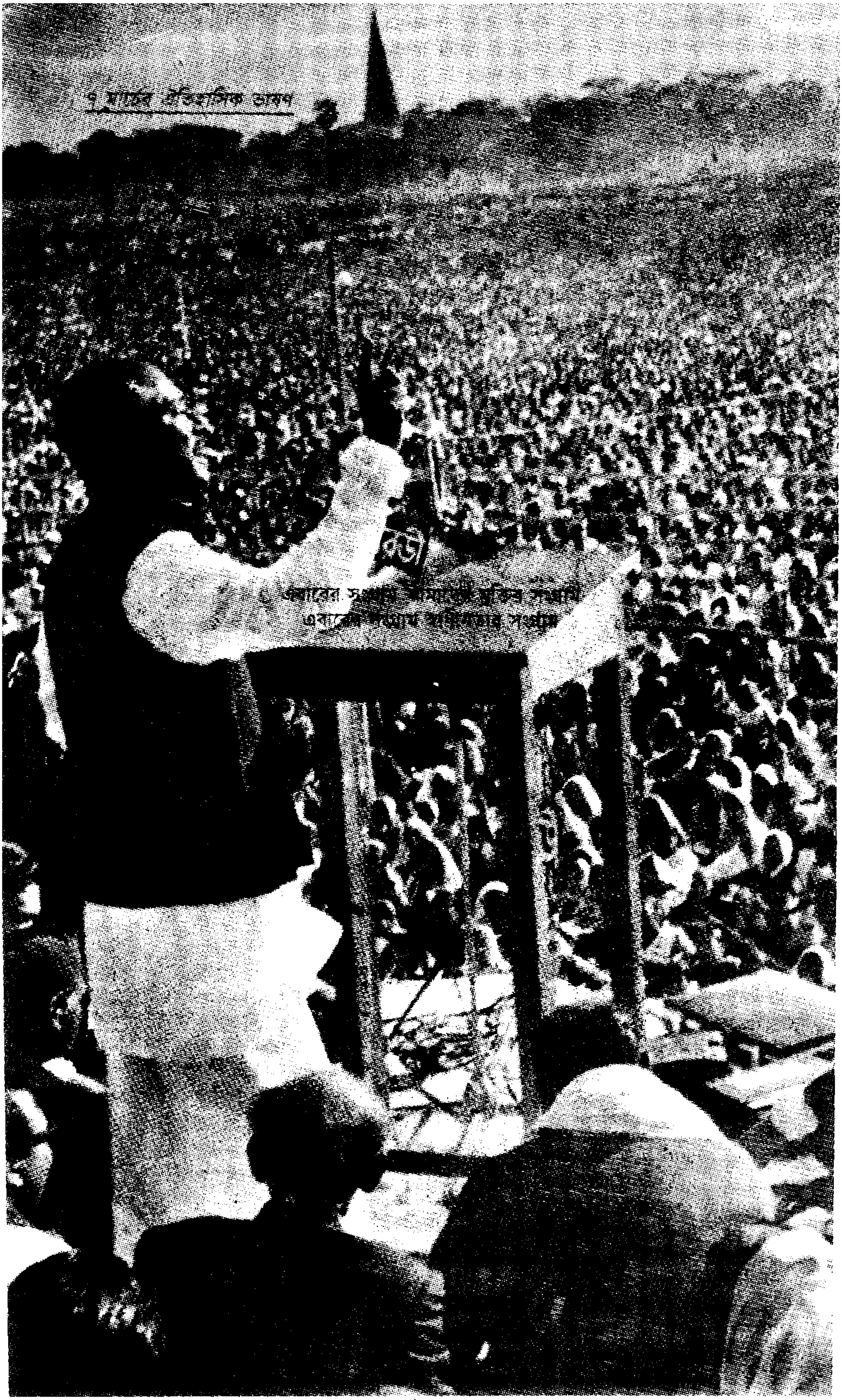

www.pathagar.com

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কর্তৃক বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে সরকার সিলিং আরোপ করায় কোন কোন মহল বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সরকারের ঐ উদ্যোগকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শোষণের হাত খর্ব করার একটি বড় কৃতিত্ব হিসেবে জাহির করলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা পরিহার করতে পারেনি। বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সরকার ১৯৭২-৭৩ সালে ৫৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৯০২.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

শিল্প-কারখানা জাতীয়করণের পর সেগুলো পরিচালনার জন্য যে ধরনের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সততা ও দেশপ্রেমমূলক অঙ্গীকার প্রয়োজন ছিলো সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটগুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তার মারাত্মক ঘাটতি ছিলো। আওয়ামী লীগ সরকার শিল্প-কারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে না পারলেও দলের বিপুল সংখ্যক সমর্থক, কর্মী ও নেতাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলো। এ সময় জাতীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটগুলোর প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়েছিলো আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্য হতে। এদের শিল্প কারখানা পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিলো না। এক হিসেবমতে ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানায় যে ১১৬৯ জন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র ৫০ জনের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং মাত্র ৮৬ জনের শিল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ ছিল। অবশিষ্টদের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন সংক্রান্ত আদৌ কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। বেশ কিছু কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার জন্য নয়; বরং ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে। আরেক হিসেবমতে ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শতকরা ২৫ ভাগ অদক্ষ কর্মচারীদের দক্ষ করণিক কর্মচারী হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। এছাড়া শতকরা ২৬ টি অফিসার পদে কেরানীদের মধ্য হতে পদোন্নতি দেয়া হয় এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনকে যে পদে পদোন্নতি দেয়া হয় সে পদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তাদের ছিল না। এ তথ্য হতে এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাকর্মীরা প্রভূত উপকৃত হয়েছিল। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগে সরকার এমন নীতি গ্রহণ করে যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে। সরকার শিল্পখাতের মধ্যে নৌ ও সড়ক পরিবহন, নির্মাণ ও বাণিজ্যখাতে বিনিয়োগের সিলিং শিথিল করলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা বিরাট সুবিধা লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ নৌপরিবহন খাতের জন্য বি.আই.ডব্লিউ.টি.সি নামক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থাকলেও শতকরা ৫০ ভাগ যন্ত্রচালিত

www.pathagar.com

কার্গো জাহাজ ছিলো ব্যক্তি মালিকানায়। এছাড়াও ছিলো যাত্রীবাহী লঞ্চ। অপরদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি সড়ক পরিবহন খাতে মাত্র ১৫ ভাগ পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করতো। নির্মাণ খাত সম্পূর্ণভাবেই বেসরকারী খাতে ছিলো। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যে বেসরকারীখাতে ব্যাপক প্রাধান্য ছিলো। সরকারী খাতের আমদানী বেসরকারী ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হত। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য, বেসরকারী ডিলারদের লাইসেন্স ও পারমিট দেয়া হত। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বেসরকারী লাইসেন্স পারমিট ও ডিলারশীপের অধিকাংশই দেয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগ কর্মীদের যার মাধ্যমে তারা বিপুল 'অনুপার্জিত আয়ের' মালিক হয়। এসময় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে উৎপাদিত শিল্পপণ্য কালোবাজারে বিক্রি হত। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাগুলো বিরাট লোকসানের সম্মুখীন হতে থাকে। তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইংরেজী জার্নাল The Weekly Wave নিম্নরূপ মন্তব্য করেঃ

"The mishandling of national economy was delibarately done with poitical motives. National economy has been plundered to help create the base of power for ruling politicians. Nationalization opened the gates to material prosperity to the new and old generation politicians. Nationalization of industrial sectors is a pre-condition for any phased plan to socialize the economy. But it turned out to be State Capitalism- all the evils of capitalism without corresponding efficiency of capitalist production. It brought no benefit either to the Government or to the people. Under the cover neo-capitalism operated and so it did not have a chance to prove beneficial to the people. The scheme was taken for the benefit of the politicians. They became rich overnight, opened accounts in Swiss banks, made frequent trips abroad, acquired all luxuries of life. Nationalization saw the introduction of collective ownership by a section of the society seeking political power base through illgoten money."

সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা

আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের তখনকার বক্তব্যে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছিল। তিনি তখন এক ভাষণে বলেন, "বাংলাদেশের কতিপয় নেতার বিদেশী

www.pathagar.com

ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে। তারা অনবরত দেশ থেকে মুদ্রা পাচার করে দিচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।" তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, "পুলিশ চোর-ডাকাত, হাইজ্যাকারদের ধরে আনে আর অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে কিংবা সরকারের উর্ধ্বতন মহল থেকে টেলিফোন আসে ছেড়ে দেয়ার জন্য। ফলে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।"

অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে আরেক ভাষণে বলেন, "তিন বছর মানুষ একাধারে দুর্ভোগ সহ্য করিতেছে। কিন্তু পাশাপাশি এত লোক কালো টাকার মালিক হইলো কিভাবে?" তিনি আরো বলেন, "বর্তমান জাতীয় দুর্যোগকালে উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজিয়া থাকিলে চলিবেনা। বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাইতে হইলে অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে সমস্যার বাস্তব সমাধানের পথে আগাইয়া আসিতে হইবে।" তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিলে দেশ টিকিবে কিভাবে।"

প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ডঃ মাজহারুল হক বলেন, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে বিপর্যস্ত। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, কর্মবিমুখতা, শ্রমিক অসন্তোষ, উৎপাদন হ্রাস, রাজস্ব হ্রাস, ব্যয় বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি দুরাবস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ও ব্যাহত করিয়াছে। এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্তমান অবস্থা আর কিছুদিন চলিলে আমাদের অবস্থাই বিপন্ন হইবে।"

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে শেখ মুজিবের পতনের পর এক শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত শ্বেতপত্রে দেশের অর্থনীতি মুজিব আমলে স্থবিরতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে উল্লেখ করে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয় যা নিম্নরূপঃ

"১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা শুরু করা হইলেও পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতি পূর্ণ অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয় নাই। ইহার ফলে, পরিকল্পনা মেয়াদের মাঝামাঝি আসিয়া ১৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরেও সামগ্রিক উৎপাদনমাত্রা ১৯৬৯-৭০ এর মাত্রার নীচে পড়িয়া থাকে এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় আরও কম থাকে। কৃষিক্ষেত্রে মোট খাদ্যোৎপাদন ১৯৬৯-৭০-এর ১১৯ দশমিক ১৯ লক্ষ টন হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৪-৭৫ সালে ১১৪ দশমিক ৮৩ লক্ষ টনে উপনীত হয়। সার, বীজ, পাম্প ও কীটনাশকের মত কৃষি উপকরণগুলির সরবরাহে ছিল ঘাটতি; এমনকি প্রাপ্ত উপকরণগুলোও অদক্ষ প্রশাসন ও ত্রুটিপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থার জন্য যথাসময়ে কৃষকদের হাতে পৌঁছিত না। উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের বীজের বন্টনে ঘাটতি দেখা দেয়- আমন ধানের মওসুমে ৮০,০০০ মণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ মণ,

www.pathagar.com

বোরো মওসুমে ৫০,০০০ মণের মধ্যে ২৬ হাজার মণ এবং আউশ মওসুমে ৫০,০০০ মণের মধ্যে ৩২,০০০ মণ বন্টন করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে ধার্যকৃত ৪০,০০০ পাম্প সরবরাহের লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র ৩৫,০০০-এর মত পাম্প জমিতে পৌছানো হয়, উহার অনেকগুলিই চালু করা হয় নাই এবং বহু মূল্যবান নগদ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে অতীব তাড়াহুড়া করিয়া সংগ্রহ করা হইলেও ৫০০০ পাম্প জমিতেই পাঠানো হয় নাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা সরকারকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিতে বাধ্য করে। গত বৎসর ৫৪ কোটি ডলার (৪৩২কোটি টাকা) মূল্যের ২৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়। চলতি বৎসর ৪০ কোটি ডলার (৫২০ কোটি টাকা) মূল্যে ২০ লক্ষ টনের মত খাদ্য আমদানী হইতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানী সত্ত্বেও দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল। উহাতে বহু সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং জনগণের ব্যাপক দুর্দশা সৃষ্টি হয়।

শিল্প খাতে স্বাধীনতার পর হইতে বেশ কয়েকটি শিল্পে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তথাপি সামগ্রিক শিল্প উৎপাদন এখনও ১৯৬৯-৭০-এর মাত্রার নীচে রহিয়া গিয়াছে। এই খাতটি শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনাগত ব্যুৎপত্তি, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নগদ অর্থের অসুবিধা, ঋণের অভাব ও শ্রমিক বিশৃংখলার মত বহুতর সমস্যার সম্মুখীন। দেশের মোট শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষমতার রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে বিদ্যমান ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার অন্যতম নৈরাশ্যজনক দিক। পাট শিল্পে ক্ষমতা ব্যবহার মাত্র ৬০ শতাংশ, বস্ত্রশিল্পে ৭৫-৮০ শতাংশ, চিনি কলে ৬০ শতাংশ, ইস্পাতে ৩০ শতাংশ, নিউজপ্রিন্টে ৬৬ শতাংশ, সিমেন্টে ৩৪ শতাংশ, টিএসপিতে ২১ শতাংশ, চামড়ায় ১৭ শতাংশ এবং সিগারেটে ২৪ শতাংশ। ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারের দরুন ১৯৭৪-৭৫ সালেই পাট, বস্ত্রকল, চিনি, ইস্পাত, কাগজ ও বোর্ড, সার ও রাসায়নিক শিল্পে মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫৫০ কোটি টাকা। ক্ষমতার এ অপূর্ণ ব্যবহার শুধু উৎপাদনই ব্যাহত করে নাই, অধিকন্তু অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগও নষ্ট হয়। ইহার ফলে দ্রব্য ও উপযোগিতামূলক ব্যবস্থাগুলোর সাধারণ দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় এবং দর পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

যে সব প্রতিবন্ধকতা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের কর্মদক্ষতাকে ব্যাহত করিয়াছিল তন্মধ্যে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শূন্যতা সর্বাধিক ক্ষতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক ক্ষেত্রে অদক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পদ পূরণ করা হইয়াছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় সাধারণভাবে শিল্পে-শান্তি ও বর্ধিত উৎপাদনে উৎসাহী ছিল। কিন্তু শাসকচক্রের কতিপয় সদস্য তাঁহাদের আপন আপন উচ্চাভিলাষ ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অনুপ্রবেশ ঘটান এবং এইভাবে শিল্পের

www.pathagar.com

প্রাণশক্তি ধ্বংস ও নূতন বিনিয়োগ অনুৎসাহিত করেন। এই স্বার্থান্বেষী চক্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে লুটতরাজ ও মূলধন অপব্যয় করেন।

পাট ও পাট শিল্প আমাদের জন্য শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অথচ এই শিল্পের পরিস্থিতিই হইয়া পড়ে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। ১৯৭৪-৭৫ বর্ষে ধানের চড়া দর ও পাটের ক্ষেত্রে অসঙ্গত মূল্যনীতির কারণে পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ পূর্ববর্তী মওসুমের ২২ লক্ষ একর হইতে হ্রাস পাইয়া প্রায় ১৪ লক্ষ একরে পৌছায় আর পাটের ফলন ৬১ লক্ষ গাঁইট হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৪ -৭৫ বর্ষে ৩১ লক্ষ গাঁইটে পৌছায়। এই বৎসরগুলিতে পাটের একরপ্রতি ফলন, মান ও পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাস পায়। পাট শিল্প বহু সমস্যায় জর্জরিত হইতেছে- যেমন, ব্যবস্থাপনার অসুবিধা, অদক্ষতা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যয় ও কৃত্রিম আঁশ বা সিনথেটিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। পাট শিল্প ১৯৬৯-৭০ বর্ষে উৎপাদন করিয়াছিল ৬ লক্ষ ২১ হাজার টন আর গত বৎসর উৎপাদন করিয়াছে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টন মাত্র।

পাট শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক বিশৃঙ্খলাই নিম্ন পর্যায় উৎপাদনের জন্য দায়ী। বিদেশে পাটের বাজার সৃষ্টিতে অক্ষমতার দরুন আমরা কেবল কৃত্রিম আঁশের কাছে মারই খাই নাই, বরং আমাদের পণ্যের জন্যে সর্বোচ্চ মূল্য আদায়েও ব্যর্থ হইয়াছি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে পীড়াদায়ক বৈশিষ্ট্য যাহা সাধারণ মানুষকে আঘাত হানিয়াছে, তাহা তীব্র মুদ্রাস্ফীতি। ঢাকায় ক্রেতা পর্যায়ে দর সূচক ১৯৬৯-৭০ ভিত্তি-বৎসরের ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে ৪৩০ বিন্দুতে পৌছায়। মূল্যস্তরে ইহা চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি। চাউলের মূল্য মণ প্রতি ৪০০ টাকার মত এক উচ্চতর পর্যায়ে পৌছায়। খাদ্য শস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় পল্লীর ভূমিহীন, বেকার এবং সীমিত আয়ের ব্যক্তিরা।

উল্লম্ফন গতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বেশ কতিপয় কার্যকারণের ফলে, যেমন—বিশ্ব রাজারে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা, সরবরাহের অপ্রতুলতা, বিধিবদ্ধ সংস্থাখাতের ঘাটতি পূরণে অর্থসংস্থান ও এই খাত কর্তৃক কর্জ গ্রহণ, যাহার দরুন অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, বন্টন ব্যবস্থা বিকৃতি, মজুদদারী এবং চোরাচালান। স্বাধীনতার পর হইতে সরকার ৩৮৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণে অর্থ সংস্থান করেন। ১৯৭৪-৭৫ বর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইলেও এই খাত ১৫১ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর্জ গ্রহণ করে।

অবিবেচনাপ্রসূত মূল্য নীতির দরুন মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ইহার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদি একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ব্যাংক ঋণ

www.pathagar.com

আটক রাখিয়া ও বাজারের পণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহের সংকট সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উৎপাদিত পণ্যাদির সঞ্চয়ন অব্যাহত রাখে। নির্দিষ্ট উদাহরণ সহযোগে বলা যায়, একমাত্র পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মওজুদই প্রায় ২১০কোটি টাকার আর ৫৩ কোটি টাকার বিক্রয়যোগ্য সূতী বস্ত্র মওজুদ পড়িয়া থাকে। সঞ্চিত মালামালের মোট মূল্য ৩৫৯ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

গোটা বিগত বৎসরই দায়শোধ পরিস্থিতি সংকটজনক থাকিয়া যায়। আমদানী খাতে যে ক্ষেত্রে ৯৭১ কোটি টাকার প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৬ কোটি টাকায়। বাজারের অস্বাভাবিকতা ও উচ্চ মুদ্রামানজনিত কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এফওবি দরের চাইতে শতকরা ২০ ভাগ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ভর্তূকি দিয়া সরকারকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যাদি চালাইতে হয়। বিনিময়ে সংস্কার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি অপ্রচলিত পণ্যাদি রপ্তানী বৃদ্ধিতে ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধিতে এমন কোন কঠোর প্রয়াস গৃহীত হয় নাই।--------- অর্থনীতি এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত। কম উৎপাদন ও আমদানীর উচ্চ ব্যয়, বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দারুণভাবে হ্রাস করিয়া দেয়। অর্থনৈতিক ও মুদ্রা ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন উহা খুবই বিরাট ও জটিল।" (মুনির উদ্দিন আহ্মদ, ১৯৮০)

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা ছিল আইন শৃংখলার মারাত্মক অবনতি। নতুন সরকারের জন্য এটি ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা ছিল এমন একটি সমাজ যেখানে আইনের শাসন এবং জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকবে। কিন্তু '৭১'এর ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পনের পর বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। মুক্তিবাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শত শত সংগঠন ও ব্যক্তি বেআইনী, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দেশব্যাপী স্ব-স্ব এলাকায় স্বেচ্ছচারিতা চালাতে থাকে। কথিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে বেআইনী অস্ত্রধারীরা সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জাতি পুনর্গঠনের কাজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত করে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিশাল বাজেট বরাদ্দের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করবে না। তার পরিবর্তে নিয়মিত সেনাবাহিনীকে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত মিলিশিয়াদের সাথে সমন্বয় করা হবে, যাতে করে

www.pathagar.com

জাতির উপর বাইরের যে কোন শক্রর আক্রমণের মুখে সমবেতভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান করে ১৯৭২ সালে ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তনের পর জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের কোন উৎসাহ দেখা যায়নি। শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার পদক্ষেপ নেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৭২ শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দেন যেন তারা দশ দিনের মধ্যে নিজ নিজ অস্ত্র জমা দেয়। তাঁর ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, যারা ঘোষিত দশদিনের পরে অস্ত্র রেখে দেবে তা বেআইনী ও অননুমোদিত অস্ত্র হিসাবে গণ্য হবে। শেখ মুজিব অবশ্য ঘোষণা করেন যে, সরকার জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক সংস্থায় চাকরী দেয়া হবে। শেখ মুজিবের এই ঘোষণা সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে হতাশ করে। তারা সন্দেহ করে যে সরকার চাকরীর লোভ দেখিয়ে তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র হাত করতে চাইছে। তারা দাবী করে যে, শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাদের পাশে অনুপস্থিত ছিলেন বলে তিনি তাদের দুঃখ বুঝতে পারছেন না। শেখ মুজিব মুক্তি বাহিনী, মুজিব বাহিনী ও অন্যান্য সশস্ত্র গ্রুপের নেতাদের সাথে বৈঠকে বসলে তখনও তারা প্রকাশ্যভাবে মুজিবের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশের সমালোচনা করতে থাকে। তারা সরকারের কাঠামোতে তাদের স্থায়ী কর্তৃত্ব দাবী করে। ১৯৭২ সালে ৩০ জানুয়ারী অস্ত্র সমর্পনের শেষ দিনে প্রত্যাশিত সংখ্যক অস্ত্র জমা পাওয়া যায় নি। বরং মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল অংশ শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। এ অবস্থায় বেআইনী অস্ত্রধারীরা নতুন সরকারের জন্য একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এসময় সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন স্থান থেকে সামান্য কিছু বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ব্যাপক সংখ্যক বেআইনী অস্ত্রধারীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিব অবশেষে ২৪ ফেব্রুয়ারী '৭২ তারিখে মুক্তিবাহিনী এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী মুজিব বাহিনীসহ সকল বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। 'প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে তারা সরকারের সমান্তরাল যেন একটি পৃথক সরকার পরিচালনা করছিল।"

বেআইনী অস্ত্রধারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরকারের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাছাড়া স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে তাদের সামাজিক দ্বন্দ্বও বিদ্যমান থাকে। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। বস্তুত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই নানা ধরনের বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও মতাদর্শগত পার্থক্যও ছিল। একটা গ্রুপ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে আবির্ভূত হয়। এরাই পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এ যোগদান করে। আরেকটি গ্রুপ শ্রেণী শক্তি নির্মূলের নামে তথাকথিত সর্বহারা পার্টি সংগঠিত করে।

www.pathagar.com

একটি অংশ সরাসরিভাবে সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। ডাকাতি, ছিনতাই, বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ, খুন, রাহাজানি, পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুট, গাড়ী হাইজ্যাক এবং যুবতী নারী অপহরণ, তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মতৎপরতায় পরিণত হয়।

১৯৭২-৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩ বছরে আইন শৃঙ্খলার যে কতটা অবনতি ঘটে তা তৎকালীন পুলিশ সূত্রের প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়। পুলিশের সূত্রানুসারে এ সময় দেশে প্রায় ১১ হাজার হত্যাকাণ্ডসহ ২ লাখ ৫০ হাজার অপরাধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ১৪,১০৮টি, লুট ১১,৬১০টি, সিঁধেল চুরি ৪,৫৫,৪০টি, চুরি ৩৯,৯৮১টি, খুন ১০,৮৫০টি, দাঙ্গা ২৬,১০৯টি এবং অন্যান্য অপরাধ ৭৭,৮৮০টি।

এসময় শিক্ষাঙ্গনে হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল ঘেরাও করে সাতজন ছাত্রকে গান পয়েন্টে বের করে নিয়ে মহসিন হলের করিডোরে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়। এ সময় শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস যে কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তা তৎকালীন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়ঃ

> "বাংলাদেশ জুড়িয়া প্রতিদিন প্রতি রাত্রি কত হত্যা, কত লুন্ঠন, কত অগ্নিসংযোগ, কত শ্বেত সন্ত্রাস, কত মর্মান্তিক ঘটনাই তো ঘটিতেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গত এক বছর সোয়া বছরের মধ্যে বারবার বেআইনী অস্ত্রের প্রকাশ্যে মহড়া হইয়াছে। সংঘটিত হইয়াছে সশস্ত্র আক্রমণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, হলের পর হল লন্ড-ভন্ড হইয়াছে এবং অস্ত্রের মুখে হইয়াছে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রশাসন দুষ্কৃতকারীদের খুঁজিয়া বাহির করার দৃঢ়সংকল্প বার বার প্রকাশ করিয়াছে।----- কিন্তু কি তার ফলাফল? নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে এতটুকু ফল অর্জিত হয় নাই। বরঞ্চ পরিস্থিতির দিন দিন অবনতিই ঘটিতেছে। ডক্টর মাজহারুল হকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা যাইতে পারে, 'আমরা প্রতিদিন তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছি রসাতলে।'

একই দিনে দৈনিক ইত্তেফাক আরো মন্তব্য করে যে,

> "দেশে প্রতিদিন গড়ে ১১টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হইতেছে। এই ক্ষতিয়ানে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় কিছু কম হইলেও কোন হত্যাকান্ডের ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট কাহারো পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। সরকারকে নূতন করিয়া নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের

www.pathagar.com

> ক্ষতিয়ান লইতে হইবে। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, সরকার অন্তত কিছু লোকেদের মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাইতে সক্ষম হইতেছে যে, খুন খারাবি করিয়াও রেহাই পাওয়া যায়।'

এ সময় খোদ প্রধানমন্ত্রীর ছেলেরও সন্ত্রাসী কাজে জড়িত থাকার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক গণকণ্ঠে খবর প্রকাশিত হয় যে,

> "গত শনিবার রাত সাড়ে এগারটায় ঢাকার কমলাপুরে স্পেশাল পুলিশের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রধানমন্ত্রী তনয় শেখ কামাল, তার ৫জন সাঙ্গপাঙ্গ ও একজন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। শেখ কামাল ও তার সঙ্গীদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নয়, দশ ও তেত্রিশ নম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পুলিশ সার্জেন্ট জনাব শামীম কিবরিয়াকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে।"

দুর্নীতির ব্যাপকতা

এ সময় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। দুর্নীতির বিস্তৃতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, যুবলীগ সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনি মন্তব্য করেন যে, "--- আওয়ামী যুব লীগ আওয়ামী সরকারের দুর্নীতির অংশীদার নয়।" আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আব্দুর রাজ্জাক এক শ্রেণীর আমলা, কতিপয় এমপি এবং টাউট শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ থেকে দুর্নীতিপরায়ন গণপরিষদ সদস্য ও কর্মীগণকে উচ্ছেদের অভিযান শুরুর কথা বলা হয়। প্রথম দফায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ২২.৯.৭২ তারিখে ১৯ জন এম পি কে দল থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। জাসদের সংসদ সদস্য জনাব আব্দুস সাত্তার ২.৭.৭৩ তারিখে জাতীয় সংসদে ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটের উপর আলোচনাকালে বলেন যে, "১৯৭০ সালে সংসদ সদস্যদের আর্থিক অবস্থা কি ছিল এবং বর্তমানে কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে সে সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। তিনি বলেন যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তিদের লাইসেন্স পারমিট বিতরণ করিয়া দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন উহার প্রেক্ষিতে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পরিয়াছে। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে নামে বেনামে যে টাকা জমা হইয়াছে উহার উৎস অনুসন্ধানে আহবান জানান।

১৯৭৪ সালে সরকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি প্রতিরোধের জন্য সমগ্র দেশে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করে। যৌথ বাহিনীর কম্বিং অপারেশনে দেশের বিভিন্ন স্থানে শত

www.pathagar.com

শত দুষ্কৃতকারী ধরা পরে। দেখা গেছে, দুষ্কৃতকারীদের প্রায় সকলেই ক্ষমতাসীন দল বা তদীয় অঙ্গ দলের নেতা বা কর্মী।

এসময় কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের দু'জন সংসদ সদস্যার পিত্রালয় ও নিজ বাসভবন থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। মৌলভী বাজারে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ও আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করে। মাওলানা ভাসানী এক জনসভায় বলেন, "সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান চলাকালে জনৈক সংসদ সদস্যার বাড়ী থেকে ১৪ বান টিন ও আড়াই হাজার রিলিফের কম্বল উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু তাকে গ্রেফতার করা হয়নি কেন?"

সশস্ত্র বাহিনী সমগ্র দেশে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে তাদের কার্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ ওঠে। জাসদ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন যে, সেনাবাহিনীর আহবান সরকারের ব্যর্থতার ফলশ্রুতি। অবাধে কাজ করতে না দিলে সেনাবাহিনীর খ্যাতি ও সুনাম বিপন্ন হবে।

দালাল নির্মূল অভিযান

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধ থেকে শুরু করে ছোটখাট স্বার্থ আদায়ের জন্য 'দালালরূপী' শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করেও এবং দালালদের শাস্তি প্রদানের নামে পুরানো শত্রু নির্মূলে প্রবৃত্ত হয়। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বহু নিরীহ লোক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, অনেককে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয় এবং অনেকের সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়।

'মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন ও সহায়তাদানকারী আলবদর, আলশামস, রেজাকার ও শান্তিকমিটির অনেক সদস্যই তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় ১৭ ডিসেম্বরের পর রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে যেতে সক্ষম হয়। এদের কেউ কেউ রাজনৈতিক আদর্শের তাড়নায়, কেউ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে, আবার কেউ কেউ আর্থ-সামাজিক কারণে পাকিস্তানী বাহিনীর সমর্থক ও সহযোগী হয়েছিল।'

'স্বাধীনতার পরে যখন পাক বাহিনীর দুঃসহ নির্যাতনের মর্মান্তিক স্মৃতি এদেশের জনগণের মনে টাটকা ক্ষতের মতো বিরাজ করছিল, সে সময় বেপারোয়া হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ ও লুটপাটে নিয়োজিত কিছুসংখ্যক দালালের ক্রিয়াকলাপও বিস্মৃত হবার কোন কারণ ছিলো না। সে কারণেই দালালদের বিরুদ্ধে জনগণের আবেগানুভূতিতে তাদের চরমতম প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণে উত্তেজিত করার ব্যাপারটি অবশ্যই

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের প্রতিহিংসাবোধ এক চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দালালদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায় থেকেও ঘন ঘন দাবী উত্থাপিত হতে থাকে।'

এ অবস্থায় সরকার ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ ১৯৭২ জারী করেন।

দালাল আইন জারী করা হলে জনগণের একটি অংশ উক্ত আইনকে স্বাগত জানায়। অপরদিকে আইনটি দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত বা চিহ্নিত লোকদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে। উত্তেজিত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা থেকে দালাল আইন তাদের রক্ষা করে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তান সমর্থকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য কোন প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা ছিলো না। ফলে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে সমগ্র দেশে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছিল। এমন অবস্থায় দালাল আইন তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তারা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে ঠাঁই পায় এবং আইনের আশ্রয় লাভ করে। তবে 'ইতোমধ্যেই সুনির্দিষ্ট কোন আইনের অনুপস্থিতিতে হত্যাসহ পাইকারী হারে প্রতিশোধের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং আইনের কোন আবরণ ছাড়াই অসংখ্য লোককে কারান্তরালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যেখানে প্রতিশোধ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি দমনে আইনের কোন বিধান ছিলো না, সেখানে এ ধরনের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ আইন যত নমনীয় কিংবা অনমনীয় হোক না কেন, আইনের মাধ্যমে সুবিচারের প্রক্রিয়া অবশ্যই ছিল আইনশূন্যতার চাইতে অনেক উত্তম। পরিস্থিতি মূল্যায়নে বলা যায়, এই আইন শত সহস্র লোকের জীবন রক্ষা করেছে যদিও এই আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একটি গভীর সামাজিক প্রতিক্রিয়া পরলক্ষিত হয়।'

'দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হিসেবে দালাল আইন অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করলেও এই আইন প্রণয়নের সময় খুব বেশি লোক এর সমালোচনা করেনি। ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা, প্রথম ৬ মাসের জন্য অন্তরীন রাখার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা, কঠোর শাস্তির বিধান, জামিন প্রদানে আইনের অস্বীকৃতি ইত্যাদি সবই নির্যাতনমূলক আইন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার মত ছিল এবং যে কোন সময় এগুলো ন্যায় বিচারের পথ অবরুদ্ধ করতে পারতো।'

উল্লেখ্য যে, এ আইনের কার্যকারিতা ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে লাগামহীনভাবে প্রতিপক্ষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও প্রতারনায় মেতে ওঠে। তাদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এবং শত্রুদের উপর প্রতিশোধ

www.pathagar.com

নেয়ার মওকা পেয়ে অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করানো হয়। দালাল আইনের সমালোচনা করে সেদিন আতাউর রহমান খান বলেছিলেন, "জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারাদেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত হয়েছেন। মনে হচ্ছে এটাই যেন সরকারের সবচাইতে প্রধান কর্তব্য।"

তিনি আরো বলেন, "যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের উপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না।' তিনি জাতির জন্য জরুরী এই মুহূর্তে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার এবং সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য সুপারিশ করেন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাক বাহিনীকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন।' তিনি আরো বলেন,'বহু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দালাল আইনের সুযোগ নিয়ে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি পারিবারিক শত্রুদের কারাবরণে বাধ্য করেছেন।' আতাউর রহমানের মতে, দালাল আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এ আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।"

দালাল আইন জারীর পূর্বে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কতজন 'দালাল' নিহত হয়েছিল তার কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এছাড়া এ আইনের আওতায় কতজনকে আটক করা হয়েছিল বা সাজা দেয়া হয়েছিল তারও সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়না। তবে ধারণা করা হয় যে, প্রায় ৬০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের দলীয় প্রভাবে এ আইন কার্যকর করার ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং তা জাতিকে মূলত দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন কোন ক্ষেত্রে দালালরাই মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়, অপরদিকে কোন কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আওয়ামী লীগারদের চোখে দালাল হিসাবে চিহ্নিত হয়। এমন কি ধর্মপ্রাণ মুসলমান হওয়াটা যেন দালালীর চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়। এভাবে রাজনৈতিক নেতারা খুব সহজেই ঘুষ ও দুর্নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এ পরিস্থিতি এমন এক স্তর পর্যন্ত উপনীত হয় যে ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানদের এ পরিস্থিতির খপ্পরে ফেলে শোষণ করা হয়। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, 'হিন্দু ভারতের' উস্কানিতেই এ ধরনের কাজ চালানো হচ্ছে। এতে করে সচেতন বা অবচেতনভাবে জনগণের মধ্যে একটি মুসলিম বাংলা গঠনের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশে সংগঠিত পুলিশ বাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মুক্তিযুদ্ধকালে পুলিশ বাহিনীর একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পুলিশের আরেকটি অংশ পাক বাহিনীর সহযোগিতা করে। স্বাধীনতার পরে তাদের অস্বিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিজয়ী মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রশাসনের সকল স্তরে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। সনাতন পুলিশ বাহিনী মান্দাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধাদের উচ্ছৃঙ্খল অংশটির মোকাবেলা করার মত উপযুক্ত ছিল না। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআর এর অবস্থাও ছিল নাজুক। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ এর পর বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত অবাধ মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। প্রকাশ্য চোরাচালান স্বাভাবিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়। ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থানকালে সীমান্ত কড়াকড়ি করার মত উদ্যোগ সরকারের ছিল না। সেনাবাহিনী সংগঠিত অবস্থায় ছিল না। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ সালে পাক বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা তাঁর প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। দেশের যে কোন অরাজক পরিস্থিতিতে সরকার সেনাবাহিনীকে ডাকতে পারতো। সশস্ত্র যুদ্ধের পর নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটিতে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত উপায়ে গড়ে তুলতে সময় ও অর্থের প্রয়োজন ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল সমস্যা ছিল অন্যত্র। আওয়ামী লীগ প্রাতিষ্ঠানিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল না। তারা মনে করতো, প্রাতিষ্ঠানিক কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই তারা দ্রুততর গতিতে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবে। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় হতো প্রতিরক্ষা খাতে। এ অভিজ্ঞতা থেকেই আওয়ামী লীগ মনে করতো বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশের পক্ষে এত বড় সেনাবাহিনী পালন করা উচিত নয়। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের বন্ধু ভারতও চাইতো না যে, বাংলাদেশ সুবৃহৎ আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলুক। ভারত ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, বাংলাদেশের উপর কোন আগ্রাসনের সময় ভারতের সক্রিয় সার্বক্ষনিক সাহায্য দিবে। আওয়ামী লীগের প্রতিরক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের নীতির মতোই ছিল। আওয়ামী লীগ চেয়েছিল একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে। তাজউদ্দিন আহমেদ প্রস্তাবিত এরূপ বাহিনী গঠন করা হলে নিয়মিত সেনাবাহিনীর কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব থাকতো না।

www.pathagar.com

রক্ষীবাহিনী গঠন

ভারত প্রায়ই বলতো যে, বাংলাদেশের গোটা সম্পদ জাতীয় পুনর্গঠন কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত। ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শমতো আওয়ামী লীগ সরকার রক্ষীবাহিনী নামে একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েই সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসাবে রক্ষীবাহিনীর মত একটি বিশেষ বাহিনী গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়। ভারতীয় উপদেষ্টা ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রক্ষীবাহিনী গঠনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ এবং ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার কথা ঘোষণা করা হয়।

সেনাবাহিনী বা পুলিশের মতো একটি নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার জন্য পুলিশের মত একটি নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার জন্য যে ধরণের আইনগত কাঠামো দরকার ছিল রক্ষীবাহিনীর ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। 'এই আইনটি ছিলো একটি খসড়া ধরণের এবং বাহিনীর বিস্তারিত কার্যধারা, জনগণের কাছে এর ভূমিকা, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, কিংবা আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন গভীর চিন্তার ছাপ ছিল না।' এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমেদ বলেন,

"..... সুনির্দিষ্ট নিয়ম জারী কিংবা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা পর্যন্ত এই বাহিনী অপেক্ষা করেনি। সরকার খুব শিগগীরই এই বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং আইন প্রণয়নের আগেই রক্ষীবাহিনী তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারীর মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত সমর্থন দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী প্রধানত যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তা হলো বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা, সীমান্তে চোরাচালান রোধ করা, অবৈধ গুদামজাত ও কালোবাজারী বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা। ঝটিকা বাহিনীর মত এবং বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিকভাবে এই বাহিনী তার কার্যধারা পরিচালনা করতে থাকে। সারা গ্রাম ঘেরাও করে এ বাহিনী অস্ত্র, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে 'ভুয়া রেশন কার্ড' উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে। এদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং নিরূপণের কোন বিধান ছিল না। অচিরেই এগুলো আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত বেসরকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেফতার করতে পরতো, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারতো। বাহিনীর প্রতিটি অপারেশনে প্রচুর সংখ্যক নির্দোষ মানুষকে বিপন্ন করা হতে থাকলে প্রতিটি অপারেশনের মাধ্যমে তারা

www.pathagar.com

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি জন্মাতে থাকে এবং এর ফলে জনমনে ক্রমশ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়। এভাবে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে। যে কোন আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিল দুঃসাধ্য। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, সেনাবাহিনী পুলিশ কিংবা এ ধরনের সংস্থার মত কঠিন নিয়মের নিগড়ে তারা বদ্ধ ছিল না। তাদেরও মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্য আইনের প্রক্রিয়া অনুসরণ, যে কোন গৃহ তল্লাশি বা সম্পত্তি সীজকরণ, কিংবা নিজেদের ব্যবহৃত গোলাবারুদের হিসাব রাখার কোন বালাই ছিল না। জনগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালনার ব্যাপারে তাদের জন্য কোন আচরণ বিধি কিংবা কাঠামোগত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিল না।

তখন রক্ষী বাহিনীর আচরণ ও ভূমিকা নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, তখন বিশ মাস কার্যধারা পরিচালনার ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার পর সরকার রক্ষীবাহিনীর কোন কোন তৎপরতাকে আইনসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারী করেন।------আইনের এ সংশোধনের মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত রক্ষীবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়। উপরন্তু এতে ১৬ ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের যে কোন কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, কোন অভিযোগ পেশ কিংবা কোন আইনগত পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।" (মওদুদ আহমদ, ১৯৯০)

"রক্ষীবাহিনীকে প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে এ বাহিনী পরিচালিত হত। এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে এরা কাজ কর্ম করতো।" বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ ও পত্র-পত্রিকাগুলো উপর্যুপরি দাবী সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী গঠন প্রণালী বা বাজেট সম্পর্কে সরকার কোন তথ্য প্রকাশ করেনি।

বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও প্রবাসী সরকার ভারতের মাটি থেকে বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করে ২০ডিসেম্বর। দেশে প্রত্যাবর্তন করেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ১ জানুয়ারী ১৯৭২ এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান ৬৬% হ্রাস করেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত

www.pathagar.com

এদেশের মুদ্রামান ভারতীয় মুদ্রামানের চেয়ে বেশি ছিল। তাজউদ্দিন দু'দেশের মুদ্রামানে সমতা আনতে চেয়েছিলেন বলেই মুদ্রামান হ্রাস করেছিলেন। কিন্তু পরিণতি হয় নেতিবাচক। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ৯০% ভাগ আসতো পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে ভারত ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে পাট বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারী সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এ দিকে অবাধ চোরাচালান ও অপরদিকে ভারতে পাট রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ বেল পাট অবাধে ভারতের পাটকলগুলোর চাহিদা মেটাতে শুরু করে। ভারতীয় পাটকলগুলো আগেকার এক শিফটের পরিবর্তে দু'তিন শিফটে কাজ করতে থাকে। এসময় বাংলাদেশের পাট লুটপাট করে ভারত নতুন করে বিদেশে পাট রপ্তানি বৃদ্ধি করে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলি আহাদ বলেন,

> "বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের বাজারে পরিনত হয়। বাংলাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ গাইট পাট অবাধে সীমান্ত পারের পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় পাটকলগুলির পূর্নোদ্যমে দুই-তিন শিফটে কাজ চালু হইয়া যায়। এমন কি বাংলাদেশের পাট-লোপাট করিয়া ভারত নূতন করিয়া বিদেশে কাঁচাপাট রফতানী শুরু করিয়া দেয়।" (জাতীয় রাজনীতি, ১৯৮৮)

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশের দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুযোগে এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালোবাজারী, চোরাচালানী ও মজুতদারী ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৬ ডিসেম্বর'৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশে চালের দাম ছিল ভারতের চেয়ে কম। কিন্তু চোরাচালানীর সুবাদে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্যশস্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং চামড়া ও মোটরকারসহ ভারতের চাহিদা রয়েছে এমন সব সামগ্রী দ্রুতগতিতে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যেতে থাকে। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বিদেশ থেকে প্রচুর রিলিফ সামগ্রী আসতে থাকে। এসব রিলিফ সামগ্রীও সীমান্ত পার হয়ে যেতে থাকে। কোলকাতার মার্কেটে রিলিফের কম্বল, ঔষধ, বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রি হতে থাকে।

১৬ ডিসেম্বরের ('৭১) পরে বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় মুদ্রার অবাধ প্রচলন শুরু হয়ে যায়। এ সুযোগে ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় ব্যবসায়ী ও নাগরিকরা বাংলাদেশের বাজার থেকে সস্তায় বহু দুর্লভ পণ্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে শত শত কোটি টাকার মেশিনপত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল ভারতীয় শিল্পপতিরা পাচার করে নিয়ে যায়। অলি আহাদ বলেন,

www.pathagar.com

"পৃথিবীর ইতিহাসে বহু রাষ্ট্র বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে; কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্র কর্তৃক স্থায়ী কাগজী নোটের বিনিময়ে অর্থাৎ বিনামূল্যে সংঘবদ্ধ প্রতারণার দ্বারা লুটপাট করিয়া সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রকে এইভাবে নিঃস্ব করিবার নির্মম নজীর আর কোথাও নাই। বাংলার মাটিরই সন্তান ছিলেন তাজউদ্দিন। অথচ তাহার সরকার ভারতীয় কাগজী মুদ্রা বেআইনীভাবে চালু হইতে বাধা দেয় নাই। দেশ বিক্রি আর কাহাকে বলে? পঞ্চমত ৯৩০০০ যুদ্ধবন্দী বাংলাদেশ হইতে যে দামী দ্রব্য লুট করিয়া আত্মসাৎ করিয়ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধবন্দীদের নিকট হইতে সেইগুলি ছিনাইয়া লইয়াছে; আত্মসাৎ করিয়াছে ও ভারতে স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। তদুপরি যুদ্ধবন্দীদের নয় মাসে (১৯৭১ মার্চ হইতে ডিসেম্বর) বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট হইতে যে বিপুল পরিমাণ পাকিস্তানী মুদ্রা বিভিন্নভাবে অর্জন করিয়ছিল; ভারতীয় সৈন্যরা সেই কাড়ি কাড়ি টাকা দ্বারা বাংলাদেশ হইতে মাল ক্রয়করতঃ ট্রাকে ভর্তি করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছে। একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বন্ধুত্বের নামাবলীর আড়ালে এইভাবে বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন সামরিক ছাউনি হইতে (Military Cantonment) ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রতিবাদে তাজউদ্দিন সরকার টু' শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই।" (জাতীয় রাজনীতি, ১৯৮৮)।

আওয়ামী লীগ সরকার ভারতীয় মুদ্রার পাশাপাশি ভারতীয় সিকিউরিটি প্রিন্টিং থেকে দেশের জন্য নতুন নোট চালু করে। ধারণা করা হয় যে, এ সময় সরকার ঘোষিত নোটের চাইতে বাজারে বাংলাদেশী নোটের সরবরাহ বেশী ছিল, এ ধারণা বদ্ধমূল হয় তখন যখন দেখা গেল পরবর্তীতে মুজিব সরকার ভারতের মুদ্রিত নোট বদলের জন্য দু'মাস সময় ঘোষণা করে।

ভারতীয় সৈন্যদের কাছে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারত সরকার শত শত রেলওয়ে ওয়াগন ও ট্রাক ভর্তি করে অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাচার করে। ১৯৭৪ সালের ১২ মে কোলকাতার দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ভারত সরকার দু'থেকে আড়াই শ' রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করেছে। প্রকৃত পরিমাণ যে এর বেশি হবে তা সহজেই অনুমেয়। এক হিসেব মতে, পাচারকৃত অস্ত্রের মুল্য তৎকালীন মুল্যে প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা। এছাড়া ভারতীয় সৈন্যরা জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী থেকেও অস্ত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি পাচার করে বলে অভিযোগ উত্থিত হয়।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ: কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮০।

২. -----, শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪।

৩. ড: কামাল হোসেন, বঙ্গবন্ধু এন্ড বাংলাদেশ, লন্ডন: রেডিক্যাল এশিয়া বুকস. ১৯৭৭।

৪. রওনক জাহান, বাংলাদেশ পলিটিক্স, প্রব্লেমস এন্ড ইস্যুজ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮০।

৫. ------, পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭২।

৬. -------, বাংলাদেশ ইন ১৯৭২: ন্যাশন বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ ইন এ নিউ স্টেট, এশিয়ান সার্ভে,ভল্যুম-১৩, নং ২ (ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩)।

৭. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৯।

৮. -----, ডেভেলমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অব বাংলাদেশ, অক্সফোর্ডঃ পারগ্রামার প্রেস।

৯. মহিউদ্দিন আলমগীর,ফেমিন ইন সাউথ এশিয়া, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসঃ অলগেশ্লাগিও, গুয়ান এন্ড হ্যানি, ১৯৮০।

১০. মেমোরেন্ডাম ফর দি বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম, ১৯৭৪-৭৫, ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার,১৯৭৫।

১১. অর্থনৈতিক জরিপ,১৯৭৪-৭৫, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৫।

১২. অর্থনৈতিক জরিপ,১৯৭৫-৭৬, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৬।

১৩. আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

১৪. কমরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

১৫. জি.ডব্লিউ চৌধুরী, অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি, ঢাকাঃ হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১।

১৬. বদরুদ্দীন ওমর, পলিটিকস এন্ড সোসাইটি ইন ইস্ট পাকিস্তান, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪।

১৭. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৮।

১৮. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

১৯. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ্ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবনতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা, ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র,১৯৮৭।

২০. লেনিন আজাদ, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,১৯৯৭।

২১. এমাজুদ্দিন আহমেদ, বুরোক্র্যাটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ: বাংলাদেশ এন্ড পাকিস্তান, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,১৯৮০।

২২. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আনোদালন ও তৎকালীন রাজনীতি, কোলকাতাঃ আনন্দধারা, ১৯৭১।

২৩. মারকাস এফ, ফ্রান্ডা, পপুলেশন পলিটিকস এন সাউথ এশিয়া: পপুলেশন প্রেসারস এন্ড দি বিগিনিং অব বাংলাদেশ, আমেরিকান ইউনিভার্সিটিজ ফিল্ড স্টাফ রিপোর্টস, সাউথ এশিয়া সিরিজ, ভল্যুম-১৬, নং ৪ (মে,১৯৭২)।

২৪. তালুকদার মনিরুজ্জামান, "ক্রাইসিস ইন পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড দি কলাপস অব দি আইয়ুব রেজিম," দি জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াস, ভল্যুম-৫, ১৯৭১।

২৫. -------, এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস এন্ড পলিটিকস উইদিন দি ব্যুরোক্রাসি ইন বাংলাদেশ, জার্নাল অব কমনওয়েলথ এন্ড কমপেরাটিভ পলিটিকস, ভল্যুম-১৬, নং১ (মার্চ, ১৯৭৯)।

২৬. ------, "বাংলাদেশ ইন ১৯৭৫: দি ফল অব মুজিব রেজিম, এন্ড ইটস আফটারম্যাথ", এশিয়ান সার্ভে, ভল্যুম-১৬, নং ২ (ফেব্রুয়ারী,১৯৭৬)।

২৭. ------, বাংলাদেশ ইন ১৯৭৪: ইকোনোমিক ক্রাইসিস এন্ড পলিটিক্যাল পোলারাইজেশন, এশিয়ান সার্ভে, ভল্যুম-১৫,(ফেব্রুয়ারী,১৯৭৫)।

২৮. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আখতার বানু, "দি ফল অব শেখ মুজিব রিজিম: এ্যান এনালিসিস", ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ, ভল্যুম-১৫, নং ১, (জানুয়ারী, ১৯৮১)।

২৯. জিল্লুর রহমান খান, "লীডারশীপ, পার্টিজ এন্ড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ", ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম-২৯ (মার্চ, ১৯৭৬)।

৩০. আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০।

৩১. মুনির উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০।

৩২. নূরুল ইসলাম, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং এন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৯।

৩৩. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, স্ট্র্যাটেজিস অব সিভিল সার্ভিস রিফরমস; এ কেস স্টাডি অব বাংলাদেশ,পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

জিয়াউর রহমান

"বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একটি শোষণমুক্ত সমাজ যা অত্যন্ত বাস্তব ও প্রগতিশীল একটি সমাজ যাতে থাকবে সমতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচার।"

- জিয়াউর রহমান

জন্ম ঃ ১৯ জানুয়ারী ১৯৩৬ ইং।

পিতা ঃ মনসুর রহমান।

মাতা ঃ জাহানারা খাতুন (রানী)।

জন্মস্থান ঃ বাগবাড়ি গ্রাম, বগুড়া।

শিক্ষা জীবন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা-হেয়ার স্কুল, কোলকাতা এবং পরবর্তীতে বগুড়ার গ্রামের স্কুল।

- ১৯৫২ সালে করাচী একাডেমী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস।

সৈনিক জীবন ঃ ১৯৫৩ সালে করাচীর ডি,জে কলেজে ভর্তি। একই বছরে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান।

- ১৯৬৩ সালে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে যোগদান।
- ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে খেমকারান সেক্টরে ইবিআর-এর একটি কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। আলফা কোম্পানীর নেতৃত্ব, বীরত্ব ও সাফল্যের জন্য পুরস্কার লাভ।
- ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান। একই বছর কোয়েটা স্টাফ কলেজে যোগদান।
- ১৯৬৯ সালে জয়দেবপুর সাব-ক্যান্টনমেন্টে ইবিআর-এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে যোগদান। একই বছরে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের জন্য পশ্চিম জার্মানীতে গমন।
- ১৯৭০ সালে ইবিআর-এর অষ্টম ব্যাটালিয়নে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে যোগদান।
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে চট্টগ্রামে সংঘটিত সেনা ও বিডিআর জোয়ানদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান।
- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাত ২.১৫ মিঃ চট্টগ্রাম ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।
- ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টরে জেড ফোর্সের নেতৃত্ব দান। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার নিযুক্ত।

www.pathagar.com

- ১৯৭২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত।
- ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত।

রাজনৈতিক জীবন : ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের ফলে বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ এবং উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত।

- ১৯৭৬ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ।
- ১৯৭৬ সালের জুন মাসে গণভোটে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আস্থা লাভ।
- ১৯৭৮ সালের জুন মাসে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

বিশেষ অবদান : সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী তথা শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা', সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার' এবং 'বাংগালীর' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' নাগরিক হিসেবে পরিবর্তন আনয়ন, বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ২০ স্কেলের বেতন কাঠামো, খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, শিল্প-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের সূচনা, গণশিক্ষা কর্মসূচী, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা ইত্যাদি।

মৃত্যু : ১৯৮১ সালের ২৯ মে দিবাগত রাতে (৩০ মে) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত।

মাজার : ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর পার্শ্বে ক্রিসেন্ট লেকের পাশে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের একজন তরুণ যুবক কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খেমকারান সেক্টরের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য সেদিন ভারতীয় সেনানায়কদেরও হতবাক করে দিয়েছিল। এ দুঃসাহসী সৈনিক ছিলেন জিয়াউর রহমান। সেদিন তিনি সংবাদপত্রের শিরোনামে আসেন। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেন। বেংগল রেজিমেন্টের সৈনিকদের কাছে তিনি বীর নায়কের মর্যাদা পান।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে জিয়াউর রহমান নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড নির্বাচিত হন। রেজিমেন্টটি এসময় চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলো। এর কম্যান্ডিং অফিসার ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রসিদ জানজুয়া। ১৯৭১ সালে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা প্রকাশ করলে দেশব্যাপী যে স্বাধীনতার আওয়াজ ওঠে জিয়াউর রহমান তার পক্ষাবলম্বন করেন এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিষয়টি জানজুয়ার কাছে পরিষ্কার ছিলো। তাই ১৯৭১

www.pathagar.com

সালের ২৫ মার্চ রাত ১১টায় মূলত তাঁকে হত্যার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত অস্ত্র বোঝাই জাহাজ 'সোয়াত' এর অধিনায়ক জেনারেল আনসারীর অধীনে ন্যস্ত করেন এবং সেখানে গিয়ে রিপোর্ট করতে বলেন। রাত এগারটায় সেখানে পৌঁছানোর জন্য তাঁকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাক দেয়া হয় যার ড্রাইভার ছিলো একজন পাকিস্তানী। ট্রাকে আরো ছিলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আটজন অফিসার। জিয়াউর রহমান জানজুয়ার চক্রান্ত বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি তাঁর নির্দেশ পালন করেন। ট্রাক পোর্টের দিকে ছুটে চলেছে। আর তিনি ভাবছিলেন কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন। আগ্রাবাদে গিয়ে ট্রাক বেরিকেডের সম্মুখীন হয়। জিয়াউর রহমান ট্রাক থামাতে বললেন। ট্রাক থামলে তিনি নীচে নেমে করণীয় চিন্তা করতে থাকেন। এমন সময় সেখানে মোটর সাইকেলে এসে পৌঁছলেন মেজর খালেকুজ্জামান। তিনি জিয়াউর রহমানকে ইশারায় দূরে সরিয়ে নিয়ে বললেন, "তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে।" মেজর জিয়াও সাথে সাথে বললেন, "আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমেদকে বলো, ব্যাটেলিয়ন তৈরি করতে, আমি আসছি।" এ বলে জিয়াউর রহমান গিয়ে ট্রাকে উঠলেন এবং ড্রাইভারকে বললেন, ফিরে যাবার নির্দেশ এসেছে, গাড়ী ঘুরাও। চালক নির্দেশ পালন করলেন। ট্রাক ষোল শহর বাজারে এসে পৌঁছলো এবং অপেক্ষমান একদল বাঙ্গালী সৈনিক পাশে দাঁড়ালো। ট্রাক থেকে নেমেই জিয়াউর রহমান অস্ত্র তাক করে চালকসহ গাড়ীর পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন। তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে আত্মসমর্পণ করলে জিয়াউর রহমান একদল সৈন্য নিয়ে জানজুয়ার বাসায় যান এবং তাঁকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর ফিরে এলেন ষোলশহর বাজারে আর্মি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঘাঁটিতে। দেখলেন ষোল শহর হানাদার মুক্ত। সকল পাকিস্তানী সৈন্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনিসহ বিপ্লবী বাঙ্গালী সৈনিক অফিসারদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। সকলেই জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের প্রভিশনাল রাষ্ট্রপ্রধান ও লিবারেশন আর্মি চীফ মনোনীত করলেন। দায়িত্ব লাভের পর জিয়াউর রহমান যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করেন। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে দূত পাঠান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করতে। ফোনে জানালেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের কথা। পরিশেষে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের ফাইলিং অবস্থায় দাঁড় করিয়ে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। সময় তখন ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ২টা ১৫ মিনিট অর্থাৎ ২৬ মার্চ'৭১। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণায় মেজর জিয়া বলেন, "--------- আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

www.pathagar.com

আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে।" এ ভাষণের পর জিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে পটিয়ার পাহাড়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি পটিয়া থেকেই হানাদার বাহিনী তাড়াতে শুরু করেন মুক্তিযুদ্ধ। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি পুনরায় শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে জিয়াউর রহমানকে জেড ফোর্স-এর প্রধান নিয়োগ করা হয়। এর হেড কোয়ার্টার্স ছিলো আসামে। মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়া ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী বীরত্ব ও অসীম সাহস প্রদর্শন করে। দেশ স্বাধীন হবার পর জিয়াউর রহমান কুমিল্লায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৭২ সালে তাঁকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়।

১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে দেশের রাজনীতিতে এক নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। এবছর ২৫ জানুয়ারী জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি এবং বহুদলীয় পদ্ধতির পরিবর্তে একদলীয় (বাকশাল) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ঐ বছরই ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। শেখ মুজিবর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন। এবছর ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আরেকটি Counter Coup সংঘটিত হয়। এর ফলে খন্দকার মোশতাক আহমদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। দেশে সামরিক আইন জারী এবং সংবিধান স্থগিত করা হয়। খালেদ মোশাররফ জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন এবং তাঁর কাছ থেকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেন। তাঁর বাড়ীর চার পাশে মিলিটারী পাহারা বসানো হয়। এ খবর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। ৭ নভেম্বর সাধারণ সৈনিকরা জিয়াউর রহমানকে উদ্ধারের জন্য তাঁর বাড়ীর চারপাশে এসে জড়ো হয় এবং তারা তাঁকে জোর করে ঘর থেকে বের করে এনে মাথায় নিয়ে মিছিল করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। জেনারেল জিয়া এমন এক সময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যখন সেনাবাহিনীতে পুরো বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াকে উপ-প্রধান সামরিক আইন

www.pathagar.com

প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এসময় জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সামরিক আইনের অধীনে দেশ পরিচালনা করতে থাকেন।

৩ নভেম্বর থেকেই সেনাবাহিনীর মধ্যে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। সিপাহীরা অফিসারদের প্রকাশ্যে হত্যা করে। হত্যার হাত থেকে অফিসারদের স্ত্রীরাও রেহাই পায়নি। কর্নেল (অবঃ) তাহের-এর নেতৃত্বে বামপন্থী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে তাদের বিপ্লবী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তৎপর হয়। জিয়াউর রহমানের হস্তক্ষেপে সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে থাকে। সামরিক আইন ট্রাইবুন্যালে কর্নেল তাহেরসহ উশৃঙ্খল সৈনিকদের বিচার করা হয়। এসময় কয়েকশ' সৈন্যকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় বলে শোনা যায়। জাসদ নেতাদের মতে এসময় প্রায় ১৫০০ সৈন্যকে চাকরী থেকে বরখাস্ত বা সামরিক ট্রাইবুন্যালে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার-টিভি ভাষণে রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য পরোক্ষভাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-কে দায়ী করেন। কর্নেল তাহেরকে ২১ জুলাই, ১৯৭৬ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। জাসদ নেতাদের মধ্যে মেজর এম এ জলিল, এ এস এম আবদুর রব, হাসানুল হক ইনু ও সিরাজুল আলম খানসহ ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। অপরদিকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এমজি তোয়াবকে ইসলামপন্থীদের সহায়তায় প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করার চেষ্টার অভিযোগে ১৯৭৬ সালের ২০ এপ্রিল পদত্যাগ এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এভাবে জেনারেল জিয়া একদিকে বামপন্থী জাসদ এবং অপরদিকে ডানপন্থী এমজি তোয়াব-এর উদ্যোগকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম হন। এছাড়া তখনও ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের গ্রুপ এবং শেখ মুজিব ভক্তরাও সেনাবাহিনীতে ছিল। জিয়া এরূপ সকল গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীর জন্য পাঁচটি নতুন ব্রিগেড গঠন করেন। সিনিয়র মেজর জেনারেলদেরকে ঢাকার বাইরে যেমন, মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে যশোর, মেজর জেনারেল মনজুরকে চট্টগ্রাম এবং মেজর জেনারেল এম নুরুদ্দিনকে কুমিল্লায় বদলী করে দেন। জিয়ার বিশ্বস্ত মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদকে ঢাকায় রেখে দেয়া হয়। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং তৎকালীন ব্যাটসম্যান পদ্ধতি বাতিল করে দেয়া হয়। এর ফলে সৈনিকদের মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। সামরিক বাহিনীর মর্যাদা ও

www.pathagar.com

অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সামরিক ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। মুজিব সরকার ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের মাত্র ৭% (৭৫০ মিলিয়ন টাকা) বরাদ্দ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া উক্ত বরাদ্দ ২০%-এ (১১০৯.৩৪ মিলিয়ন টাকা) বৃদ্ধি করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে এ বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি পায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বৃদ্ধি ছাড়াও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা স্বাধীনতা পূর্বকালের মত পুনঃপ্রবর্তন করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণের দু'বছরের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক প্রশাসনের ব্যয় ২০০ কোটি টাকারও বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। ১৯৭৬-৭৭ সালে তা ৯০ হাজারে বৃদ্ধি করা হয়। তিনি নবম ডিভিশন নামে একটি নতুন ডিভিশন গঠন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন ও কর্মরত অফিসারদের নিয়োগ দান করেন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে অন্যান্য সামরিক শাসকদের ন্যায় তিনিও মনে করতেন যে, দুর্বল অর্থনীতি ও গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থায় একমাত্র সামরিক বাহিনীই সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান বিধায় জাতি গঠন ও উন্নয়নে তাদের অনেক কিছু করার আছে। জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে সামরিক শাসনের সময় দেশকে চারটি জোনে এবং জোনগুলোকে কতগুলো সাব-জোনে বিভক্ত করে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও উপ-আঞ্চলিক আইন প্রশাসকদের নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও জেলা পর্যায়ে জেলা সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। বিচার কাজ সমাধা করার জন্য সামরিক সরকার বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যাল, বিশেষ সামরিক আইন আদালত গঠন করে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পক্ষে ZMLA, Sub-ZMLA, DMLA- গণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতি দমন ও ত্রান কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক প্রশাসনের সাথে সম্মিলিতভাবে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর সামরিক কর্মকর্তারা জেনারেল জিয়াকে প্রধান সামরিক প্রশাসকের পদে বসানোর উদ্যোগ নেন। অপরদিকে পুলিশের সংখ্যা ৪০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ হাজারে উন্নীত করা হয়। ঢাকা মহানগরীর জন্য রিজার্ভ আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান ও মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়।

১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। এ প্রসংগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এএসএম সায়েম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেনঃ

www.pathagar.com

> "Again under the third Martial Law Proclamation made by me on the 29th November, 1976, I had parted with the office of the CMLA in favour of the then DCMLA, Major General Ziaur Rahman. I had thus no authority to amend either the Constitution or the Proclamation. I was considering how to pull myself out of the office of the President without causing any constitutional crisis..".

চার মাস পরে জেনারেল জিয়া দেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে যে বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান ৪৩ বছর বয়সে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিচারপতি সায়েম তাঁর ভাষণে বলেনঃ

> "আমি, আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েম, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম। আমি এতদ্বারা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করে তাঁর কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করছি।"

জেনারেল জিয়া একই সংগে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধানের পদটিও বহাল রাখেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর নেতৃত্বকে সংহত করার উদ্যোগ নেন।

জিয়ার আমলে রাষ্ট্র ও প্রশাসন

সংবিধান সংশোধন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হয়েই পূর্ববর্তী সরকার হতে ভিন্নতর আদর্শ নিয়ে দেশ পরিচালনা শুরু করেন। ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে তিনি এক অধ্যাদেশ জারী করে সংবিধান সংশোধন করেন। তিনি সংবিধানের শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংযোজন করেন। সংবিধানে উল্লেখিত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস এবং আস্থা' এবং 'সমাজতন্ত্রে'র পরিবর্তে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারার্থে সমাজতন্ত্র'কে ঘোষণা করেন। একই সংগে দেশের নাগরিকদের জাতীয়তা 'বাংগালী'-র পরিবর্তে

www.pathagar.com

'বাংলাদেশী' বলে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের নাগরিকরা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের পরিবর্তে ভৌগলিক ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা দ্বারা পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুসংহত ও শক্তিশালী করার নীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তি জাতীয়করণের বিনিময়ে 'ক্ষতিপূরণসহ বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত' এর স্থলে 'শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণসহ' বিধান করা হয়। সংবিধানের এরূপ সংশোধনীকে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো অভিনন্দন জানায়। তিনি বাকশাল বিলোপ করে বহু দলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রচলন করেন।

প্রশাসনিক কাঠামো

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা পারস্পারিক সংযোগের (Civil-Millitary Coalition) মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের অবস্থান সুসংহত করে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৯ বাতিল করা হয়। কারণ উক্ত আদেশে কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন কারণ না দর্শিয়ে চাকরী হতে বরখাস্ত করা যেত। উক্ত আদেশের আওতায় মুজিব আমলে যে সকল কর্মকর্তা চাকরী হারিয়েছিলেন তাদের আপীল করার অনুমতি দেয়া হয়। এর ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু কর্মকর্তা চাকুরীতে পূনঃর্বহাল হন। অবশ্য এসময় শেখ মুজিবপন্থী কিছু কর্মকর্তা চাকরীচ্যুত হন। বেসামরিক প্রশাসনকে পুনর্গঠন ও সংস্কারের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়া সাবেক আমলা এম. এ রশিদের নেতৃত্বে একটি বেতন ও চাকরী কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন ২০ টি গ্রেডের বেতন স্কেল (ন্যূনতম ৩০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা) এবং বিভিন্ন ভাতা প্রদানের সুপারিশ করে। জিয়ার সরকার কিছুটা সংশোধিত আকারে তা বাস্তবায়ন করে। উক্ত কমিশন প্রশাসনিক সংস্কারের যে সুপারিশ করে তার ফলশ্রুতি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) নামে ক্যাডার সার্ভিস ও সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) গঠন করা হয়।

জেনারেল জিয়া ১০ সদস্য বিশিষ্ট যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন তাতে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এতে তিন বাহিনী প্রধান ছাড়াও ১ জন সাবেক আইসিএস অফিসার, ২ জন সিএসপি, ১ জন সাবেক আইপিএস অফিসার, ১ জন আর্মি মেডিক্যাল কোরের অফিসার ও ১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী। পরবর্তীকালে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৪-এ বৃদ্ধি করা হয়। এতেও একইভাবে আমলাদের প্রাধান্য থাকে। এদের মধ্যে ১০ জন ছিল বেসামরিক আমলা, ৩ জন সামরিক অফিসার ও অন্যান্যরা ছিল টেকনোক্র্যাট।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলের শেষ দিকে এসেও মন্ত্রিপরিষদে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অবস্থান সুদৃঢ় থাকে। ১৯৮১ সালে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদে ৬ জন ছিল সামরিক কর্মকর্তা, ৫ জন বেসামরিক আমলা, ৬ জন টেকনোক্রাট, ৪ জন ব্যবসায়ী, ১ জন ভূস্বামী ও ২ জন আইনজীবী।

বেসামরিক আমলাদের যে শ্রেণীটির সাথে জিয়া সরকারের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল তারা ছিল প্রধানত সাবেক সিএসপি অফিসার। শেখ মুজিবর রহমান ৬১টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরের যে স্কীম হাতে নিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান তা বাতিল করে দেন। ফলে ১৯ টি সাবেক জেলায় যাদের ডিপুটি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তাদের মধ্যে ১২ জনই ছিলেন সিএসপি অফিসার। চারজন বিভাগীয় কমিশনারও ছিলেন সিএসপি।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা শুধুমাত্র মন্ত্রিসভা, সচিবালয়, বিভাগ ও জেলাতেই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা-ই নয়; তারা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও পরিকল্পনা কমিশনের মত নীতি প্রণয়নকারী সংস্থাতেও তাদের প্রভাব বজায় রেখেছিল। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি সামরিক ও বেসামরিক আমলাদেরও করায়ত্ব ছিল। ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান উভয়ই ছিলেন আমলা। অপরদিকে ৩৮টি পাবলিক কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মধ্যে ১১ জন ছিলেন সিএসপি অফিসার, ২ পুলিশ অফিসার, ১০ জন সামরিক অফিসার, ৬ জন ইপিসিএস অফিসার এবং অন্যান্যরাও ছিলেন বিভিন্ন সার্ভিসের কর্মকর্তা।

গণভোট অনুষ্ঠান

প্রেসিডেন্ট জিয়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল ১৯ দফা কর্মসুচী ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচীর মধ্যে ছিল কৃষি সংস্কার, গণশিক্ষা বিপ্লব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা সংস্কার, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি। ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর জেনারেল জিয়া সারাদেশে চার সপ্তাহের সফরে বের হন। তিনি কমপক্ষে ৬০ টি জনসভা ও পথসভায় বক্তৃতা দেন এবং তাঁর ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন।

জেনারেল জিয়া ২২ এপ্রিল ১৯৭৭ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষনে তাঁর নেতৃত্ব, নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ১ মে ১৯৭৭ দেশে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তিনি আরো ঘোষনা দেন যে ১৯৭৮

www.pathagar.com

সালের ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্ধারিত সময় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং জিয়াউর রহমান শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ ভোট লাভ করেন।

রাজনৈতিক দল গঠন

রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর জেনারেল জিয়া রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর সারাদেশে বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী তাঁর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জিয়ার সমর্থকরা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার এ দলের সভাপতি হন। মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্য এতে যোগদান করে। এ দল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। জেনারেল জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় জাগদল গঠিত হলেও তিনি এতে যোগদান করেন নি এবং দলটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। সম্ভবত তিনি জনগণের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষন করছিলেন। পরবর্তীতে জিয়া সমর্থকরা 'জাগদল' বাতিল করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করলে জেনারেল জিয়া তাতে যোগ দেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৮ সালের ৩ জুন দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। মোট দশজন প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে জেনারেল ওসমানী ও জেনারেল জিয়াউর রহমান অন্যতম। এ নির্বাচনে ন্যাপ (ভাসানী), মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, লেবার পার্টি, তফসিলী জাতীয় ফেডারেশন সম্মিলিত হয়ে 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠন করে এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দেয়। সাবেক জামায়াতে ইসলামী ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং জেনারেল জিয়াকে সমর্থন দেয়। সাম্যবাদী দল ও পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও আলেম সমাজ জিয়াকে সমর্থন করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মুজাফফর), গণ আজাদী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি (ওসমানী) এবং পিপলস লীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট' গঠন করে এবং জোটের প্রার্থী হিসাবে জেনারেল এমএজি ওসমানীকে সমর্থন দেয়। জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ৭৬.৬৭% ভাগ

www.pathagar.com

ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। জেনারেল ওসমানী পান ২১.৭০% ভাগ ভোট। রাষ্ট্রপতি জিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক বৈধতা লাভ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বিভিন্ন মত ও পথের রাজনীতিকদের সমর্থনে নির্বাচনে জয়লাভ করে তাদের সমন্বয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু স্বল্প দিনের মধ্যেই তাদের মতপার্থক্য প্রকাশিত হতে থাকে। জিয়া তাঁর সমর্থকদের নিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। অতঃপর তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামের রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসার পর জেনারেল জিয়া ১৯৭৮ সালে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য সামরিক আইন প্রত্যাহার, ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি দাবী জানায়। সরকার কিছু কিছু দাবী মেনে নেয় এবং আশ্বাস দেয় যে, নবগঠিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। নির্বাচনের তারিখ তিন বার মুলতবী করার পর অবশেষে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদ নির্বাচন অনষ্ঠিত হয়। বিএনপি এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বিএনপি প্রদত্ত ভোটের ৪১.২% ভাগ পেয়ে ২০৬টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি, মুসলিম লীগ-আইডিএল ১৯টি, জাসদ ৯টি আসন পায়। এ নির্বাচনের পর জিয়াউর রহমান দেশ থেকে সামরিক আইন ও জরুরী অবস্থা তুলে নেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন

শেখ মুজিবর রহমান বাংগালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে অবিসংবাদিত নেতারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে মুজিবের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। ঐ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সন্নিবেশিত হয়। এছাড়া দেশের নাগরিকদের 'বাংগালী' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক 'বাংগালী' জাতীয়তাবাদের বিপরীতে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। তিনি সংবিধানে দেশের নাগরিকদের পরিচয় 'বাংলাদেশী' হিসেবে সন্নিবেশিত করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একটি শোষণমুক্ত সমাজ যা অত্যন্ত বাস্তব ও

www.pathagar.com

প্রগতিশীল একটি সমাজ—যাতে থাকবে সমতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার। ------- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে মোটামুটি সাতটি মৌলিক বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যা হচ্ছেঃ "(১) বাংলাদেশের ভূমি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যবর্তী আমাদের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক এলাকা; (২) ধর্মগোত্র নির্বিশেষে দেশের জনগন; (৩) আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা; (৪) আমাদের সংস্কৃতি-জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার ধারক ও বাহক আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি; (৫) দু'শ' বছর উপনিবেশ থাকার প্রেক্ষাপটে বিশেষ অর্থনৈতিক বিবেচনার বৈপ্লবিক দিক; (৬) আমাদের ধর্ম—প্রতিটি নারী ও পুরুষের অবাধে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতি পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা; (৭) সর্বোপরি আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ যার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন বাস্তব ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।" জিয়াউর রহমান তাঁর জাতীয়তাবাদী দর্শনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরো বলেন, " আমরা ধর্মে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান এটা সত্য। আমরা ভাষা ও কৃষ্টির ব্যাপক অর্থেও বাংগালী সে কথাও সত্য; কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা সংগ্রাম, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চূড়ান্তভাবে একটি বিশিষ্ট জাতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। সীমান্তের বাইরে যারা ভাষা সংগ্রাম করেনি, মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়নি, তাদের কেমন করে আত্মত্যাগের অংশীদার করবো? তাদের কেমন করে আমাদের পতাকার এবং মানচিত্রের অংশীদার করবো? এই হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূলকথা। ভাষা যদি একটি ফুল হয়, ধর্ম আরেকটি ফুল। ভাষা-ধর্মের কোন ফুলকে অস্বীকার করবো না, কিন্তু ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, ভাষা বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন ফুল নিয়ে যে তোড়া বেঁধেছি-এতে সব ফুল আছে-এটা সমগ্র জাতীয়তাবাদ-এটাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বাংগালী জাতীয়তাবাদের সংগে এর কোন বিরোধ নেই; এটা শুধু আংশিক সংজ্ঞা। তাই আমরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমগ্র সংজ্ঞায় পরিচিত হতে চাই, একটি ফুল নয়, এবার একটি ফুলের তোড়া চাই।" জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করেন।

জিয়ার শাসনামলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কর্মসূচী

প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর আওতায় পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তিনি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে চারটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানীর সাথে জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া

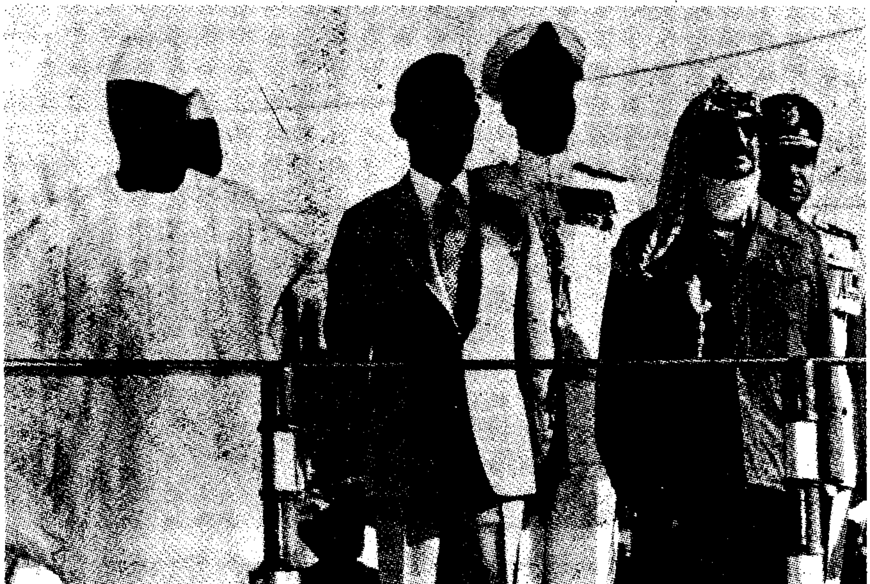

পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের সাথে জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন। প্রথম পদক্ষেপ ছিলো খাল খনন কর্মসূচী। যশোর জেলার উলসী প্রকল্পে খাল খননের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচী শুরু হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় জিয়ার আমলে ১ম পর্যায়ে ১৯৩টি খালের ৬৭৫ মাইল খনন বা পুনঃখনন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮০০ মাইল খাল খনন করে অতিরিক্ত ভূমি সেচ সুবিধার আওতায় এনে এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৬ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রত্যাশা করা হয়েছিল। তবে কিছু কারিগরি ও প্রকৌশলগত সীমাবদ্ধতার কারণে উক্ত প্রত্যাশা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। তবে শুধু খাল খননই নয়, এ কর্মসূচীর কারনে শত শত মাইল রাস্তা নির্মিত হয় এবং ৪৫ কোটি জনঘন্টা (Man hour) কাজ হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এ বিশাল কর্মকান্ডের সিংহভাগই সম্পাদিত হয়েছিল স্বেচ্ছাশ্রমে। মোট মজুরীর মাত্র ১৫% গরীব ভূমিহীন চাষীদের প্রদান করা হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া গণশিক্ষা কর্মসূচীকে তাঁর শান্তিপূর্ণ বিপ্লবী কর্মসূচীর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক দিনে একটি ব্ল্যাকবোর্ড ও একখণ্ড চক দিয়ে গণশিক্ষা কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এর লক্ষ্য ছিল ৫ বছরের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার শতকরা ২৪% হতে ৮০% এ উন্নীত করা। এ কর্মসূচীকে সফল করার জন্য ১ কোটি নতুন বই ছাপানো হয়। গ্রামে-গঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াড গঠন করা হয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, ভিডিপি, যুব কমপ্লেক্স ও মহিলা সংগঠনগুলোকে গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, সংবাদপত্র ও পোস্টারের মাধ্যমে জনগণকে গণশিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। মায়ানমার, চীন প্রভৃতি দেশের মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণশিক্ষা প্রদানের জন্য ৫০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। সেনাবাহিনীকেও এ কাজে লাগানো হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে গণশিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ফলে ২৭ লক্ষ নিরক্ষর লোক লিখতে ও পড়তে শিখে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের তৃতীয় কর্মসূচী ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% হতে ১% এ কমিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এটা করতে হবে। তিনি বিলম্ব বিবাহ এবং দু' সন্তানের ছোট পরিবার গড়ে তোলার আহবান জানান। এ লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগকে সম্প্রসারণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ৪০ হাজার পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সক্রিয় করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ১৯৮০ সাল নাগাদ

www.pathagar.com

৯৫০ টি মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ ক্লিনিক, ৪০টি মহিলা বৃত্তিমূলক কেন্দ্র এবং ৮টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং প্রায় ২১ হাজার স্বনির্ভর কর্মীকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনার উপর ১৬টি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে তা জনগণের মধ্যে প্রদর্শন করে। এ সকল কর্মকান্ডের ফলে জনসংখ্যা কর্মসূচী উল্লেখযোগ্যভাবে সফল না হলেও তিন বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% হতে ২.৪%এ নেমে আসে।

গ্রাম সরকার গঠন

প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৬ সালে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে নাম পরিবর্তন করে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের লক্ষ্যে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ম্যানুয়েলের মুখবন্ধে বলা হয়ঃ "সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব যখন জেগে উঠবে বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রাম এবং তার সংগে সংগঠিত হবে গ্রাম বাংলার সাড়ে ৮ কোটি মানুষ। তারা উদ্বুদ্ধ হবেন উৎপাদন ও সুষম বন্টনের রাজনীতিতে।" ১৯৮০ সালে ৩০ এপ্রিল সাভারের নিকট প্রথম জিরাবো গ্রাম সরকার গঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে ৬৫ হাজার গ্রামে গ্রাম সরকার গঠন করা হয়। গ্রামের মানুষের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চারটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রাম সরকারকে দেয়া হয়। কাজগুলো হলোঃ (১) খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা; (২) গণশিক্ষা বিপ্লবে অংশগ্রহণ; (৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; এবং (৪) গ্রামে গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এছাড়া অসামাজিক কর্মকাণ্ড, চোরাচালানী প্রতিরোধ করার দায়িত্বও তাদের দেয়া হয়।

গ্রাম সরকার গঠনের বিষয়টি বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখোমুখি হয়। তাদের যুক্তি ছিল গ্রাম সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়নি। এর কার্যপরিধিও সুনির্দিষ্ট ছিল না। তাছাড়া নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম সরকারের কী সম্পর্ক হবে তাও স্পষ্ট ছিলো না। গ্রাম সরকারের আয়ের উৎস কি হবে তারও উল্লেখ ছিলো না। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে শুরুতেই এ নতুন সংস্থার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। সমালোচকরা আরো বলে থাকেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়া গ্রাম পর্যায়ে নিজ ক্ষমতার ভিত্ মজবুত করার জন্য গ্রাম সরকার গঠন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গ্রামের মানুষদের নিয়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (V. D. P) গঠন করেন। প্রতি গ্রামের ৫০ থেকে ১০০ জন সদস্য নিয়ে

www.pathagar.com

ভি.ডি.পি গঠন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী তদারক, পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সড়ক নির্মান কর্মসূচী এবং অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন ভি.ডি.পি কে। গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভি.ডি.পি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখে, তবে গ্রাম সরকারের মত ভি.ডি পিও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলো না। ভিডিপি গঠনকেও সমালোচকরা প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমর্থনের ভিত্তি পল্লী অঞ্চলে শক্তিশালী করার জন্যই সৃষ্ট বলে মন্তব্য করেন।

যুব উন্নয়ন কমপ্লেক্স

প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতায় আরোহণের পরই যে ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭৭ সালের ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী শেরে বাংলা নগরে জাতীয় যুব কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া এতে জাতি গঠন কর্মকান্ডে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান। উক্ত কনভেনশনের ফলশ্রুতিতে সরকার 'জাতীয় যুব সার্ভিস প্রকল্প' নামে একটি পাইলট স্কীম চালু করে। প্রেসিডেন্ট জিয়া যুব সমাজকে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য যুব সমবায় কমপ্লেক্স গঠন করেন। যুব কমপ্লেক্সের সদস্যদের গ্রাম সরকার ও ভিডিপি-তে জড়িত করা হয়। তাদেরকে দুর্নীতি দমন, কালোবাজারী প্রতিরোধ, স্থানীয় ট্যাক্স আদায়, স্থানীয় বিচার সালিসী ইত্যাদির দায়িত্ব দেয়া হয়। গবেষকরা মনে করেন প্রেসিডেন্ট জিয়া পল্লী অঞ্চলের যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে গ্রাম সরকার, ভিডিপি ও যুব কমপ্লেক্স গঠনের যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা তত্ত্বগতভাবে আকর্ষণীয় মনে হলেও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব থাকায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অর্থনৈতিক কৌশল

১৯৭১-৭৫ সময়কালে শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকালে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে উৎপাদন কর্মকান্ডে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭৫ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর পূর্ববর্তী সরকার হতে ভিন্নতর উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করেন। এ নতুন নীতির লক্ষ্য ছিল বেসরকারী খাতের উৎসাহ প্রদান, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে অধিকতর প্রবৃদ্ধি।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭০-৭৮) প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রথম পরিকল্পনাকে সার্বিকভাবে বাতিল না করে পরবর্তী তিন বছরের (১৭৫-৭৮) জন্য Three-Year Hard Core Plan- প্রণয়ন করেন। এতে বেসরকারী খাতে বিশেষ করে বেসরকারী পর্যায় শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিকতর সম্পদ বরাদ্দ ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে শিল্প খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ৮৭.৪ মিলিয়ন টাকা, সেখানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৭-৭৮ সালে ২০৯১.৪ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) স্বল্প সময় উচ্চমাত্রায় অর্থনৈতিক লক্ষ্যে অর্জনের জন্যই প্রণয়ন করা হয়।

বেসরকারী খাতের উন্নয়ন

প্রেসিডেন্ট জিয়া বেসরকারী খাতের উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিল্প-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৭৬ সালে দরপত্র আহ্বান করে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত যে সকল শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করা হয়েছিল, সেগুলো বেসরকারী খাতে বিক্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশী মালিকদের যে সব শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল সে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান মূল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭৯ সাল নাগাদ জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানাসমূহের শতকরা ৪০ ভাগ বেসরকারী শিল্পপতিদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। মোট ৭৮৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৭৯টি মূল মালিকদের নিকট ফেরত দেয়া হয় এবং ২০০টি বেসরকারী দরদাতাদের কাছে বিক্রি করা হয়। অবশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্প মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে রেখে দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে বেসরকারী বিনিয়োগের সিলিং সংশোধন করে ৩০ মিলিয়ন টাকা হতে ১০০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৭৮ সালে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের সিলিং সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়। সরকার কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে বিদেশী ইক্যুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করে বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ করে। এসময় সরকার ঘোষণা করে যে, কোন বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। এ উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ করা হয়। এতে বলা হয়—(১) সরকার বিদেশী বিনিয়োগ

www.pathagar.com

দখল বা জাতীয়করন করবে না; (২) জনস্বার্থে যদি কোন বিদেশী শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করা হয় তাহলে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে সরকার একটি বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করে এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (I.A.C.B) পুনর্গঠন করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে অবলুপ্ত করা হয়েছিল, ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি সেটিকে পুনরায় চালু করা হয়। পরবর্তীতে এ সংস্থার কার্য পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়। রপ্তানীমুখী শিল্প-কারখানার সম্প্রসারণ এবং রপ্তানীকারকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার চট্টগ্রামের নিকটে রপ্তানী প্রক্রিয়া অঞ্চল স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এতে বেসরকারী খাতে শিল্পোন্নয়নের বহুবিধ ব্যবস্থা রাখা হয়। সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করলে বেসরকারী শিল্পোদ্যাক্তারা তাতে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। ১৯৭৫-৮০ সময়কালে ৩৫০০ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে। প্রায় ৪৪০৭.৪ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১০১২৪.৯ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ সাপেক্ষ এসব শিল্প-কারখানার মধ্যে ছিল ডেইরী ফার্ম ও দুগ্ধজাত পণ্য, গভীর সমুদ্রে মৎস আহরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, তৈরি পোষাক ও ঔষধ তৈরির কারখানা। এসময় ৩৮টি প্রকল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে যার পরিমাণ ছিলো ১৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ৩৮টি কোম্পানীতে যৌথ বিনিয়োগ করে। এদের মধ্যে ১৪টিতে বৃটিশ কোম্পানীগুলো ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩টিতে আমেরিকান কোম্পানীগুলো ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকার শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি অনুসরণ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-পূর্বকালে বাংলাদেশে অবস্থিত বৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলোর মালিকানা ছিলো প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কতিপয় বড় ব্যবসায়ীদের বিকাশ ঘটতে শুরু করলেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মুজিব সরকার তাদেরকে কোন প্রকার সুবিধা প্রদান করেনি। প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতায় আসার পর যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাতে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদেরই প্রাধান্য ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে কৃষক ও পেশাজীবীদের সন্তানরাই নিয়োগ লাভ করেছিল। সুতরাং প্রেসিডেন্ট জিয়া শিল্পপতিদের স্বার্থে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারন নেই।

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর লোকসান দিচ্ছিল সেগুলোকেই বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। অপরদিকে যে সকল

www.pathagar.com

শিল্প-কারখানা লাভজনক ছিল সেগুলোকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার অধীনে ১৫টি চিনিকল ছিলো। এ চিনিকলগুলো ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত লাভজনক ছিলো বিধায় সেগুলোর কোনটিকেই তার পূর্ব মালিকদের কাছে অথবা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে, পাট কলগুলো ক্রমান্বয়ে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছিল। এর প্রেক্ষিতে ৭৭টি পাটকলের মধ্যে ৭টি পাটকল থেকে সরকারী বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়া মুজিব শাসনামলে সকল চামড়া শিল্প-কারখানা মারাত্মক লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিলো বলে এখাতের সকল শিল্প ইউনিট বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

জিয়ার আমলে বেসরকারী খাতের অনুকূলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। কর মওকুফপ্রাপ্ত (Tax moliday) শিল্পপতিদের এ মর্মে অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করতে হয় যে, তারা তাদের অর্জিত মুনাফার শতকরা ৩০ ভাগ শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠায় অথবা রাষ্ট্রীয় বন্ড ক্রয়ে পুনঃবিনিয়োগ করবে। দ্বিতীয়ত সরকার একটি আমদানী তালিকা প্রণয়ন করে ঘোষণা করে দেয় যে, কোন বেসরকারী আমদানীকারক সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন আমদানী করতে পারবে না। তৃতীয়ত বৈদেশিক মুদ্রার উপর সরকার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সরকার আমলাদের নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক মুদ্রা কমিটি বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। সুতরাং দেখা যায় যে, এসময় বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতি কৌশল প্রণয়নে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের তেমন কোন প্রভাব বা ভূমিকা ছিলো না, বরং সামরিক বা বেসামরিক আমলারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাধান্য বিস্তার করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরকার হতে সরকার পর্যায়ে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ দেখা যায় না। কারণ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত বিধায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় খাত খুঁজে পায় না। মুজিব সরকার যে সকল শিল্পখাত সংরক্ষিত তালিকার (Reserved List) অন্তর্ভুক্ত করেছিল তার মধ্যে পাট ও গ্যাস খাত অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দুটো খাতে বিনিয়োগে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর কিছু আগ্রহ থাকলেও তা সংরক্ষিত তালিকার অর্ন্তভুক্ত থাকায় তাদের সে সুযোগ ছিলো না। অপরদিকে সিগারেট, সাবান, গুড়া সাবান ও অক্সিজেন উৎপাদনে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সীমিত অংশগ্রহণ ছিলো। প্রেসিডেন্ট জিয়া বিদেশী বিনিয়োগের জন্য অভ্যন্তরীণ শিল্পনীতির মতো

www.pathagar.com

খাল খননের উদ্দেশ্যে মাটি কাটছেন জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া

www.pathagar.com

বৈদেশিক বিনিয়োগের বিষয়কে দু'টি ভাগে অর্থাৎ 'হাই কন্ট্রোল' এবং 'লো কন্ট্রোলে' বিভক্তি করেন। এ বিভক্তির মাধ্যমে মৌল শিল্প-কারখানার উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে সেগুলোর উপর সর্বাধিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে তেল অনুসন্ধান ও গ্যাস তরলীকরণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রো-বাংলা উপকূলীয় অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের জন্য ৬টি বিদেশী কোম্পানীকে আহ্বান জানানো হয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

প্রেসিডেন্ট জিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা। তাঁর আমলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। যেখানে ১৯৭৩-৭৪ সময়কালে মোট জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিলো মাত্র ০.৫০%, সেখানে ১৯৭৫-৭৮ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৪০% এ পৌছায়। ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশে মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন; ১৯৭৯-৮০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন-এ এসে দাঁড়ায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে। গম উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালের ১.৬ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ৮.১০ মিলিয়ন টনে পৌছে। শিল্পোৎপাদনের ইনডেক্স যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে ৮১ ছিলো (বেইজঃ ১৯৬৯-৭০ = ১০০); ১৯৭৬-৭৭ সালে তা স্বাধীনতার পূর্ব অবস্থায় অর্থাৎ ১০০ তে পৌঁছায় এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮-এ উন্নীত হয়।

পাট উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন; ১৯৭৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ২২ হাজার টনে উন্নীত হয়। সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন; ১৯৭৯-৮০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টনে। ইস্পাত উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ৪৯ হাজার টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টনে পৌঁছে। এভাবে কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন মোট বর্ধিত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিচয় বহন করে। যেখানে জিডিপির মাত্রা ১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাদ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসেনি সেখানে তা ১৯৭৬-৭৭ সালে অতিক্রম করে যায় এবং তা ১৯৭৯-৮০ সালে ৬৫ হাজার ৪ শত ২৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার ১৯৭৪-৭৫ সালের ২% থেকে ১৯৭৯-৮০ সালে ৬% এ বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

সারণী ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (১৯৭৩-৭৮)

	আইটেম	প্রথম দু'বছর (১৯৭৩–৭৫)	শেষ তিন বছর (১৯৭৫–৭৮)
ক	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	০·৫০	৬·৪০
খ	বছর শেষে অগ্রগতিঃ ১. বাজার মূল্যে জিডিপিতে মোট বিনিয়োগের হার (%)	৫·৮৫	১২·৬২
	২. চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে নীট মূলধনের প্রবাহ (%)	৬·২৭	৮·৭৪
	৩. চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে জিডিপিতে নীট মোট আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (%)	-----	৩·৮৮
	৪. চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে মোটকর রাজস্ব (%)	৪·২৫	৭·৯৫
	৫. চলতি রাজস্ব উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়)	১১৮·২৪	৩৫৬·৭০
	৬. খাদ্যশস্য উৎপাদন (লাখ টন)	১১২·২৪	১৩১·০০

সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

সারণী : মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (১৯৭৪-৭৫) থেকে ১৯৭৯-৮০

আইটেম	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯	১০৭৯-৮০
কৃষি	২৯,৭০১	৩২,১৬১	৩৪,৫৪২	৩৫,১৯৮	৩৫,৮০৩
শিল্প	৩,৭৩৫	৪,৬৫০	৫,১৩০	৫,৩৫৬	৫,৩৫৬
নির্মাণ	১,৭৫৬	২,৩০৬	২,৬৮৪	৩,১৫০	৩,৭২৭
বিদ্যুৎ ও গ্যাস	২৬৫	২৬০	৪১৩	৪৭৫	৫১৭
পরিবহন	২,৬১৫	৩,০২৩	৩,২৩৫	৩,৪০৩	৩,৫৩৬
বাণিজ্য	৩,৯২৪	৪,২০৩	৪,৭৯৭	৪,৭৩১	৪,৮৬৯
গৃহায়ন	২,৪৯৪	২,৬৯৮	২,৮০৬	২,৯১৮	৩,০৩৫
জনপ্রশাসন	২,৪৬২	৩,০৩৩	৩,৩৬১	৩,৬৬৩	৩,৯৪৩
ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স	৩৪৯	৪৩১	৪৭০	৫০৮	৫২২
অন্যান্য	৩,২৯৭	৩,৫৭৩	৩,৫৭২	৩,৯৪০	৪,২০৮
মোট	৫০,৫৯৮	৫৬,৪৩৮	৬০,৮৯০	৬৩,৩৪০	৬৫,৫২৫

সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জরিপ, ১৯৮০-৮১ (ঢাকাঃ ১৯৮১) পৃ.১-৩; ১৯৭৫-৭৬ এর তথ্য পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।-১৯৭৩-৭৫ সময়কালে জিডিপিতে গড় সঞ্চয়ের হার ছিল ০.৩১% (২২ কোটি টাকা। ১৯৭৮-৮০ সময়কালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৩৬৫-এ অর্থাৎ ৬ শত ২২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এসময় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে রপ্তানীও বৃদ্ধি পায়। ৯৭৪-৭৫ সালে রপ্তানী আয় ছিল ৩৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৭৯-৮০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছে। পাট রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৮৫.৮৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬০৬.৬৭ মিলিয়ন টাকায়, চা রপ্তানী ১৬.২৬ মিলিয়ন টাকা হতে ৫১ মিলিয়ন টাকায় এবং কাঁচা চামড়া ১৯.০২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০১.৪৭ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। জিডিপিতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ১৯৭৯-৮০ সালে ৬.০৯%-এ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমানও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৩৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৭৯ সালে তা ৩৭৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী মুজিব আমলের চেয়ে জিয়ার শাসনামলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হওয়ার ফলে জিয়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা মন্তব্য করে যে, "By and large, President Ziaur Rahman has led the country away from false hopes and pointless quarrels." ১৯৭৯ সালে লন্ডনের Financial Times উল্লেখ করেঃ

> General Zia's achievements since winning power in a bloody coup in 1975 have been considerable. He has not only brought relative stability but has lived by all of his political promises. He has won international respect for himself and his country; it would no longer be fair to describe Bangladesh as the "basket case" of the developing world, as Dr. Kissinger did a few years ago-----. To the credit of the present regime, economic growth since 1975 has improved.

জিয়ার পররাষ্ট্র নীতি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক আসনে সমাসীন করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি লন্ডন ও লুসাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের আঞ্চলিক সম্মেলন, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন ও মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। এছাড়া দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে বিশ্বের ৩০টিরও বেশী দেশ সফর করেন। ১৯৮০ সালে

www.pathagar.com

তিনি জাতিসংঘের বিশেষ সাধারন অধিবেশনে ভাষণ দেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে তিনি তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে তিন সদস্য বিশিষ্ট "আল কুদস কমিটি"র সদস্য নির্বাচিত হন। ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসানের উদ্দেশ্যে ওআইসি কর্তৃক গঠিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী শান্তি মিশনে জিয়াউর রহমান ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

১৯৮০ সালের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা কারো মুখে উচ্চারিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি ১৯৭৯-৮০ সালে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান ও শ্রীলংকায় রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করেন। এছাড়া ব্যক্তিগত চিঠি ও দূত পাঠিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাকে বাস্তবে রূপদানের কাজ এগিয়ে নেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতার জন্য একটি সুসমন্বিত কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) গঠিত হয়।

ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান

প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমানকে তাঁর শাসনামলে অনেকগুলো সামরিক অভ্যুত্থান মোকাবেলা করতে হয়েছে। যতদূর জানা যায় তিনি ছোট-বড়, কম-বেশী ১৭টি সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হন।। এর মধ্যে ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ২ অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩০ সেপ্টেম্বর বগুড়ায় সেনা বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ২ অক্টোবর তা ঢাকা সেনানিবাস পর্যন্ত ছড়ায়। তারা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেয় এবং তার মাধ্যমে বিদ্রোহীরা তাদের বিদ্রোহকে 'শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতার' বিপ্লব বলে ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ ছিলো মূলত সেনাবাহিনীর বামপন্থী সৈন্যদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এ বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, মনি সিংহের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানেই জিয়াউর রহমান মারা যান।

১৯৮১ সালের কথা। এবছর ২৯ তারিখে তিনি গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসনের জন্য। ওঠেন সার্কিট হাউজে। গভীর রাত পর্যন্ত দলীয় নেতাদের নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। বৈঠকশেষে সবাই যে যার স্থানে চলে গেলে জিয়াউর রহমান সার্কিট হাউজেই অবস্থান করেন রাত্রি যাপনের জন্য। ৩০ মে সোবহে সাদেকের পূর্বে একদল বিভ্রান্ত সৈনিক এসে সার্কিট হাউজ আক্রমণ করে এবং জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে । ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত তাঁর

www.pathagar.com

নামাজে জানাজায় লাখ লাখ লোক হাজির হয়। এতে করে বোঝা যায় যে তাঁর মৃত্যুতে জাতি কতটা শোকাহত হয়ে পড়ে। এসময় সাপ্তাহিক রোববার সম্পাদকীয়তে লিখেঃ

"রাষ্ট্রপতি জিয়ার সুনাম ছিলো একজন ধীর স্থির প্রশাসক হিসেবে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর আমলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। বাকশাল না জিয়া—এই প্রশ্নে জিয়ার দিকেই ছিল জনপ্রিয়তার পাল্লা। ... ব্যক্তি হিসেবে জিয়াউর রহমানের সততার সুনাম লোকের মুখে মুখে ফিরতো।... জিয়াউর রহমানের স্মৃতি বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে সহজে মুছবার নয়। এক কর্মচঞ্চল জেনারেল পায়ে হেঁটে, হেলিকপ্টারে করে, ট্রেনে চেপে বাংলাদেশের গ্রাম-বাংলার দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছেন, মানুষকে বলছেন খাল কাটার কর্মসূচিতে অংশ নিতে, খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের ফেরাতে-এই স্মৃতি মানুষের মনে বহুদিন জাগরুক থাকবে।"

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. মারকাস এফ, ফ্রান্ডা, পপুলেশন পলিটিকস এন সাউথ এশিয়া: পপুলেশন প্রেসারস এন্ড দি বিগিনিং অব বাংলাদেশ, আমেরিকান ইউনিভার্সিটিজ ফিল্ড স্টাফ রিপোর্টস, সাউথ এশিয়া সিরিজ, ভল্যুম-১৬, নং ৪ (মে,১৯৭২)।

২. -------, "দি বাংলাদেশ ক্যু", আমেরিকান ইউনিভার্সিটিজ ফিল্ড স্টাফ রিপোর্টস, সাউথ এশিয়া সিরিজ, ভল্যুম-১৯, নং ১৫ (মে,১৯৭৫)।

৩. ------, "জিয়াউর রহমান এন্ড বাংলাদেশ ন্যাশনালিজম", ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম-১৬, (মার্চ,১৯৮১)।

৪. রওনক জাহান, বাংলাদেশ পলিটিকস, প্রব্লেমস এন্ড ইস্যুজ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮০।

৫. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৯।

৬. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকা ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

৭. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবনতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা, ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭।

৮. এমাজউদ্দিন আহমেদ, বুরোক্র্যাটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনোমিক গ্রোথ: বাংলাদেশ এন্ড পাকিস্তান, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮০।

৯. তালুকদার মনিরুজ্জামান, এডমিনিসট্রেটিভ রিফরমস এন্ড পলিটিকস উইদিন দি ব্যুরোক্র্যাসি ইন বাংলাদেশ, জার্নাল অব কমনওয়েলথ এন্ড কমপারেটিভ পলিটিকস, ভল্যুম-১৬, নং১ (মার্চ, ১৯৭৯)।

www.pathagar.com

১০. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আখতার বানু, "দি ফল অব শেখ মুজিব রিজিম: এন এনালিসিস", ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ, ভল্যুম-১৫, নং ১, (জানুয়ারী, ১৯৮১)।

১১. জিল্লুর রহমান খান, "লীডারশীপ, পার্টিজ এন্ড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ", ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম-২৯ (মার্চ, ১৯৭৬)।

১২. রেহমান সোবহান এন্ড মুজাফফর আহমদ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ইন অ্যান ইন্টারমিডিয়েট রেজিম: এ স্টাডি ইন দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনসস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১৯৮০।

১৩. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্টেট এন্ড ইকোনোমিক স্ট্র্যাটেজি, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮।

১৪. বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮০-৮৫, ঢাকা ঃ বিজি প্রেস, ১৯৮০।

১৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৮০।

১৬. মেমোরেন্ডাম ফর দি বাংলাদেশ এইড গ্রুপ, ১৯৮১-৮২, পরিকল্পনা কমিশন ও বহিঃসম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৮১।

১৭. গোলাম হোসাইন, সিভিল-মিলিটারী রিলেশনস ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১।

১৮. মোঃ আবদুল লতিফ, রোল অব দি মিলিটারী ইন বাংলাদেশ ঃ এ স্টাডি অব জিয়া রেজিম (১৯৭৫-৮১), পি এইচ ডি ডিগ্রীর জন্য ভারতের জয়দেবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত থিসিস, ১৯৯০।

১৯. জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, চতুর্থ বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৫।

২০. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আরেকটি জিয়াউর রহমান চাই, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, চতুর্থ বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৫।

২১. এমাজউদ্দীন আহমেদ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, চতুর্থ বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৫।

২২. আহমেদ হুমায়ুন, জিয়া দরিদ্র সর্বসাধারণের মুক্তি চেয়েছিলেন, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২৩. ডঃ মোহাম্মদ মাহবুবুল্লাহ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২৪. ননী গোপাল চক্রবর্তী, অগ্রগতি ও উন্নয়নে শহীদ জিয়ার ভূমিকা, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪।

২৫. মাহী বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২৬. সফিকুর রহমান সফিক, বিএনপি'র ১৬ বছর, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

www.pathagar.com

হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ

"অনিবার্য কারণেই দেশে সামরিক আইন জারী করতে হয়েছিল। দায়িত্ব গ্রহণকালে আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী কয়েকটি সংস্কার সাধন, অর্থনীতিকে পুনর্বাসন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রত্যাবর্তন- এ তিনটি বিষয়কে আমাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম।"

-এইচ.এম. এরশাদ

জন্ম	ঃ	১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।
পিতা	ঃ	মোঃ মকবুল হোসেন ।
মাতা	ঃ	মোসাম্মাৎ মজিদা বেগম।
জন্মস্থান	ঃ	রংপুর।
শিক্ষা	ঃ	রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বি.এ. প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ।
সৈনিক জীবন	ঃ	১৯৫২ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ।
	❑	পাকিস্তান স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি এবং ভারত থেকে এনডিসি কোর্সে সনদ লাভ।
	❑	১৯৭৮ সালে ১ ডিসেম্বর লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত।
রাজনৈতিক জীবন	ঃ	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দান এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ।
	❑	১৯৮৪ সালের ২৭ মে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ।
	❑	১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ 'হ্যাঁ' / 'না' গণভোটে আস্থা লাভ।
	❑	১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।
	❑	১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী জাতীয় পার্টি গঠন।
	❑	১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
	❑	১৯৮৬ সালের ৩১ আগস্ট সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ।
	❑	১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাতীয় পার্টিতে যোগদান।
	❑	১৯৮৬ সালের ১ম সপ্তাহে কৃষক সম্মেলনে "পল্লীবন্ধু" খেতাব লাভ।
	❑	১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ।
	❑	১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
	❑	১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।
	❑	১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা।

www.pathagar.com

বিশেষ অবদান ঃ প্রশাসনিক সংস্কার, উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন, রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, যমুনা সেতু নির্মাণ কাজে উদ্যোগ গ্রহণ, ৯টি টিভি উপকেন্দ্র নির্মাণ, সিলেট ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ঢাকায় শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, পথকলি ট্রাস্ট গঠন, পারিবারিক আদালত ও যৌতুক বিরোধী আইন পাস, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মীরপুর স্টেডিয়াম নির্মাণ, স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধকরণ, গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি ইত্যাদি।

১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ শপথ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ ও কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিশ্রাম নিতে বাসভবনে চলে যান। রাত সাড়ে ১২টায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদসহ তিনবাহিনী প্রধান বঙ্গভবনে উপস্থিত হন। তাদের নির্দেশে রাষ্ট্রপতিকে ঘুম থেকে জাগানো হয়। হঠাৎ করে গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগানোতে রাষ্ট্রপতি কিছুটা বিরক্ত ও বিস্মিত হন। তাঁকে জানানো হয় যে, তিন বাহিনীর প্রধানগণ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি তাদের সাথে কথা বলেন। জনাব এরশাদ রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি বলেন ঃ

"দেশের অবস্থা খুবই বিশৃঙ্খল। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী দেশের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। সশস্ত্রবাহিনী এই মুহূর্তে ক্ষমতা দখল না করলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমতা আমার কাছে হস্তান্তর করতে হবে।"

রাগে ও ক্ষোভে বিচারপতি সাত্তার গর্জে উঠেন। "নো, তোমরা পেয়েছোটা কি? আমি জনগণের পবিত্র আমানত ক্ষমতা ছাড়ব না, জনগণ পবিত্র ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদ আমার কাছে আমানত রেখেছে। আমি এ আমানতের খেয়ানত করতে পারি না, কক্ষণো না।" জেনারেল এরশাদ অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বলেন ঃ

"ক্ষমতা আপনাকে দিতেই হবে। আমরা ক্ষমতা নেয়ার জন্য এসেছি। ফিরে যাওয়া আমাদের স্বভাবের বাইরে। ঠিক আছে, আপনাকে দু'ঘন্টা সময় দিলাম। আপনি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করুন। ক্ষমতা ছাড়বেন না মরবেন। আমার সামান্য ইশারাতেই আপনার শরীর মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে। বৃদ্ধ বয়সে কি দরকার এসব হাঙ্গামা বাঁধিয়ে!"

'প্রায় দু'ঘন্টার বেশী বাকবিতন্ডা চলে। বিচারপতি সাত্তার অনড়, তিনি ক্ষমতা ছাড়বেন না। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী রেডিও, টেলিভিশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। অবশেষে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার রক্তপাত

www.pathagar.com

এড়াতে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হন। ২৪ মার্চ রেডিও, টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয় যে, সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে; বিচারপতি সাত্তার স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। এদিকে সামরিক জান্তার বন্দুকের সামনে বিচারপতি সাত্তার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন মর্মে বক্তব্য প্রদান করেন এবং রেডিও, টিভি বঙ্গভবনে এনে রেকর্ডিং করে তা জাতির সামনে প্রচার করা হয়। এরপর জেনারেল এরশাদ রেডিও-টিভিতে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন যে, দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী বসে থাকতে পারে না, তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিচারপতি সাত্তার তাঁর হাতে দেশের দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন।'

সামরিক আইন জারীর ঘোষণাপত্রে জেনারেল এরশাদ বলেন, বিপন্ন জাতীয় অর্থনীতি, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হয়, দায়িত্ব পালনে বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জনগণ চরম হতাশা ও নৈরাজ্যে নিমজ্জিত। তাই দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্বের অংশ হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশে সামরিক আইন জারী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সামরিক আইন জারীর ঘোষণাপত্রে বলা হয় ঃ

> "যেহেতু দেশে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেসামরিক প্রশাসন আইন কার্যকর করার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, সকল স্তরের সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে ওঠায় জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, সম্মানজনক জীবন-যাপন, শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে, যেহেতু দেশের জনগণ চরম দিশেহারা অবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত, যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর দায়িত্ব বর্তেছে, আমি লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৮২ বুধবার হতে গণতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল

www.pathagar.com

ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করছি এবং এ মুহূর্ত থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলে ঘোষণা করছি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছি।"

জেনারেল এরশাদ তাঁর সামরিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা, জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য সংকট দূর করা, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাগুলোকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি কৃচ্ছ্রতা সাধন ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অপরাধসমূহ সামাজিক আইনের আওতায় কঠোর হস্তে দমন করা হবে। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিল্পায়ন ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করে বিরামহীন উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে এ বিপুল উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সফলভাবে নিয়োগ করা যায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখার জন্য সশস্ত্র বাহিনী জনগণের সাথে এ নয়া উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নবদিগন্ত সূচনা করবে।

জেনারেল এরশাদ দুর্নীতিকে 'জাতীয় শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি জাতিকে আশ্বাস দেন যে, জাতীয় শত্রু দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামরিক আইনের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সকল শ্রেণীর দুর্নীতিবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, এ দুর্নীতির শিকড় অত্যন্ত গভীরে এবং কায়েমী স্বার্থের মতো দুর্নীতির চক্র অত্যন্ত শক্তিশালী। রাজনীতি ও অর্থনীতির উঁচুস্তরে পরাক্রমশালী কায়েমী স্বার্থবাদীরাই এ দুর্নীতির দুর্গ গড়ে তুলেছে বলে এ ঘৃণ্য ব্যাধির ব্যাপকতা এত গভীর। তিনি ঘোষণা করেন যে, এ মারাত্মক সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে একে সমাজ থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

সংস্কার কর্মসূচী

জেনারেল এরশাদ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির অন্যতম বাহন হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে সামরিক সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর হাত দেয়। সরকার ঘোষণা করে যে, থানাগুলোকে প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জেনারেল এরশাদ দু'টি সামরিক কমিটি গঠন করেন। এর একটিকে দায়িত্ব দেয়া হয় মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা করে পুনবির্ন্যাসের সুপারিশ করা এবং অপরটি ছিল প্রশাসনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত। এছাড়া একটি জাতীয় বেতন কমিটিও গঠন করা হয়। সামরিক কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ৩২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে হ্রাস করে ১৭টিতে নামিয়ে আনা হয়। সামরিক আইন কমিটি সরকারী দপ্তরগুলোতে জনশক্তির পরিমাণ ৯৪৪০ থেকে কমিয়ে ৬১১৮ জনে নির্ধারণ এবং ৩৩২২জন কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত কর্মচারী ঘোষণা করে। উক্ত কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ঘোষণা ছিল ৪৪টি মন্ত্রনালয় থেকে হ্রাস করে ১০টিতে এবং ৬০টি বিভাগকে হ্রাস করে কমিয়ে ৪২টিতে নির্ধারণ করা হয়।

সামরিক সরকার প্রথমদিকে মন্ত্রণালয় হ্রাস করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেও পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে পুনরায় মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশের সকল থানাগুলোকে প্রথম পর্যায়ে মানোন্নীত থানা এবং পর্যায়ক্রমে উপজেলা নামকরণ করে থানা পর্যায়ে উপজেলা পদ্ধতি চালু করা হয়। মহকুমার প্রশাসন বিলোপ করে সেগুলোকে জেলায় উন্নীত করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে পরিষদের সদস্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় দুই ডজনেরও বেশি দপ্তর উপজেলায় স্থাপন করে সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। সরকার সংরক্ষিত ও স্থানান্তরিত এ দু'ভাগে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে বিভক্ত করে স্থানান্তরিত বিষয়গুলোকে উপজেলায় ন্যস্ত করেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে নীতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদকে রাজস্ব আদায়ের কয়েকটি উৎস

www.pathagar.com

নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও মুন্সেফ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপজেলা পদ্ধতি চালু হবার পর স্থানীয় পর্যায়ে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রাতারাতি বেশ কিছু নতুন ভবন, বাসা বাড়ী, অফিস-আদালত গড়ে ওঠে। পুরাতন অফিস-আদালত সংস্কার করা হয়।

জেনারেল এরশাদের বৈধতার প্রশ্ন ও রাজনৈতিক আন্দোলন

জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্তত এক বছরের জন্য কোন রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে তাদের কোন তৎপরতা শুরু করতে পারেনি। ১৯৮১ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল বের করে । এতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং ৫ জন ছাত্র নিহত হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সরকার তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্ফ্যু জারি করে। ছাত্রদের এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাতের মধ্যদিয়ে এরশাদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোতে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, বি এন পি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, বামপন্থী দলগুলোর ৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী সম্মিলিত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করে। এসব দল ও জোটগুলোর অভিন্ন দাবী-দাওয়ার মধ্যে ছিল—অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল, জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য নির্বাচন অনুষ্ঠান, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। বিরোধী দলগুলোর এ দাবী দাওয়ার মুখে সামরিক সরকার ১৯৮৩ সালের এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়। ঐ বছরই নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হয়। জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৪ সালের ২৪ মে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং একই বছরে ২৫ নভেম্বর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিরোধী দল এতে সন্তুষ্ট হয়নি; বরং তারা সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বেই সংসদ নির্বাচন দাবী করে। এ অবস্থায় জেনারেল এরশাদ দু'বার নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৮৪ সালের ২৭ মে একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। এ সময় জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন সংশোধন করে নিজেই রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একই সাথে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটিও বহাল রাখেন।

www.pathagar.com

জেনারেল এরশাদ তার সরকারের চরিত্রকে বেসামরিক অবয়ব প্রদানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপে শুরু করেন। এ সংলাপ ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়ঃ (১) জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ, (২) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী নির্ধারণ, (৩) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং তাদেরকে প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত রাখার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার মুখে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণের ঘোষণা দেন। কিন্তু বিরোধী দল এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, সামরিক আইনের অধীনে কোন নির্বাচন হবে না। এরূপ চাপের মুখে জেনারেল এরশাদ ৫ দফা আপোস ফর্মূলা পেশ করেন। এগুলো হচ্ছে (১) জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ৩১ ডিসেম্বর '৮৪ থেকে এবং আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ৩১ জানুয়ারী, ১৯৮৫ থেকে বিলোপ করা হবে; (২) একই তারিখে সামরিক আইন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহ বিলুপ্ত করা হবে; (৩) ১৫ জানুয়ারী, ৮৫ থেকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও হাইকোর্টে এখতিয়ার সংক্রান্ত কতিপয় ধারা পুনর্বহাল করা হবে; (৪) নতুন সংসদ যেদিন থেকে অধিবেশনে বসবে সেদিন থেকে সংবিধান পুনর্বহাল ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে; এবং (৫) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে মন্ত্রিপরিষদে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবে না এবং মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

অবশেষে এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে, ৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিরোধী দল পুনরায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অস্বীকার করে। এরশাদ এতে ক্ষুব্ধ হন এবং পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করেন এবং সংসদ নির্বাচনের তারিখ বাতিল করেন। তিনি কড়া ভাষায় রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্তব্য পালন না করে জনগণকে একটি নির্বাচিত সংসদ ও সরকার থেকে বঞ্চিত করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। একই সময় তিনি ১৬ মে এবং ২০ মে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণের কথা বলেন।

ইতোমধ্যে জেনারেল এরশাদ বেসরকারী খাতের উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কৃষি উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ ১৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য জনগণের কাছে একটি মাত্র প্রশ্ন ছিল, "আপনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের নীতির সমর্থন করেন কিনা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বেসামরিক সরকার গঠিত না হওয়া

www.pathagar.com

পর্যন্ত প্রশাসন পরিচালনা তিনি অব্যাহত রাখবেন কিনা সে সম্পর্কে 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর প্রদান।" নির্বাচনে সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, শতকরা ৭২% ভোটার গণভোটে অংশ নেয়। ৯৪.১৪% হ্যাঁ বোধক ভোট এরশাদর পক্ষে পড়ে। জেনারেল এরশাদ এরূপ গণভোটের মধ্য দিয়ে তার সরকারের বৈধতা অর্জনের প্রয়াস পান এবং জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে বিরোধীদল এ গণভোটকে অর্থহীন বলে প্রত্যাখ্যান করে।

নির্ধারিত সময় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে ২টি ব্যতীত অন্য সকল উপজেলায় ২৩০০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ নির্বাচনে শতকরা ৪০ ভাগ ভোটার অংশ নেয় এবং নির্বাচনের দিন হিংসাত্মক কার্যকলাপ, বোমাবাজি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদেরকে সরকারের উপসচিবের মর্যাদা দেয়া হয়। নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার হিসেবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব লাভ করে।

রাষ্ট্রপতি পদের গণভোট ও উপজেলা চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের পর জেনারেল এরশাদ সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ লক্ষ্যে তিনি একটি রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। জেনারেল এরশাদ মুসলিম লীগ ও বি এনপি'র অনেক নেতার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তিনি নতুন কোন দল গঠন করলে তাঁরা তাতে যোগদান করবেন। এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলছুট রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে 'জনদল' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। জেনারেল এরশাদ উপলব্ধি করেন যে, যে সকল লোকদের নিয়ে জনদল গঠিত হয়েছে তার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হবে না। তিনি আরো বৃহত্তর জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক ফোরাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি শাহ আজিজের নেতৃত্বাধীন বিএনপি-র একটি উপদল, মুসলিম লীগের একটি অংশ, কাজী জাফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ও গণতান্ত্রিক পার্টির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক ফ্রন্টকে নতুন রাজনৈতিক দলে রূপান্তরের উদ্যোগ নেন। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী তিনি জাতীয় পার্টি (জাপা) নামক নতুন দলের সূচনা করেন। এ দলের মূলনীতি হিসেবে বলা হয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জনগণতন্ত্র, বেসরকারী খাতের উন্নয়ন, উৎপাদনমুখী রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার ও ভূমি সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হলে প্রথম দিনেই ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামী ব্যাপক বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠান করে। বিরোধী দলগুলো সমন্বিতভাবে সামরিক সরকারকে উৎখাত

www.pathagar.com

করে বেসামরিক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে কর্মসূচী গ্রহণ করে। আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন ২৬ এপ্রিল '৮৬ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে। কিন্তু বিরোধী দল আগের মতই সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচন না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং হরতাল, বিক্ষোভ ও অন্যান্য কর্মসূচী ঘোষণা করে। তারা ঘোষণা করেন যে, ২২ মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন তারা দেশব্যাপী হরতাল করবে। বিরোধী দলগুলো ১৮ মার্চ এক সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা কেউ সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচন করবে না এবং কেউ অংশ নিলে তাদের প্রতিহত করা হবে। কিন্তু ২১ মার্চ রাতে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। ঐ রাতে আওয়ামী লীগ জেনারেল এরশাদের সাথে সমঝোতায় উপনীত হয় এবং নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা ঘোষণা করে। অপরদিকে বি এন পির নেতৃত্বাধীন সাত দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তিনটি পূর্বশর্ত দেয়। শর্ত তিনটি ছিলঃ মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল, সকল রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সামরিক আইনের অধীনে দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনীতিকদের দণ্ড মওকুফ। বি এন পি উল্লেখ করে যে, নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগ ও স্বৈরাচারের মধ্যকার পাতানো খেলা। সরকার নির্বাচনের তফসিল পরিবর্তন করে ৭ মে নির্ধারণ করে। নির্বাচনে ২৮ টি রাজনৈতিক দলের ১০৭৪ জন প্রার্থী ও ৪৫৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ১৫২৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নবগঠিত জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে। নির্বাচনের দিন সহিংসতা, বোমাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, ব্যালট বাক্স ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে এবং ফলশ্রুতিতে বহু লোক হতাহত হয়।

শেখ হাসিনা নির্বাচনের পর পরই সরকারকে ভোট ডাকাতির দায়ে অভিযোগ করেন এবং ৭ দফা দাবী উত্থাপন করেন। এসব দাবির মধ্যে ছিল কতিপয় কেন্দ্রে পুনঃ ভোট গ্রহণ, কোন কোন ক্ষেত্রে পুনঃ ভোট গণনা, নির্বাচনী ফলাফল স্থগিত রাখা ইত্যাদি। জেনারেল এরশাদ বলেন, শেখ হাসিনা নির্বাচন শেষ হওয়ার পূর্বেই বিবৃতি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং তিনি পরাজয় নিশ্চিত দেখে একটি বাহানা বের করেছেন। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় জাতীয় পার্টি ১৫৩, আওয়ামী লীগ ৭৫, জামায়াতে ইসলামী ১০, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৫, কম্যুনিস্ট ৫, মুসলিম লীগ ৫, জাসদ ৪, বাকশাল ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি ৩, ন্যাপ (মো) ২ ও স্বতন্ত্র পার্টি ৩২ জন জয়লাভ করে। নির্বাচনের পর ৩২ জন স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে ২৩ জন জাতীয় পার্টিতে যোগ দিলে জাতীয় পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৮। অপরদিকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনও তারা লাভ করে। পরবর্তীতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে আরো দু'টি আসন জাতীয় পার্টির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জেনারেল

www.pathagar.com

এরশাদ বৈধতা লাভের সুযোগ পান। ১০ জুলাই সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। আওয়ামী লীগ ঐদিন সংসদ ভবনের বাইরে 'অধিবেশনের মহড়া' দেয়। বিএনপি সংসদ বাতিলের দাবি জানায়।

জেনারেল এরশাদ ৩১ আগস্ট '৮৬ সেনাবাহিনী পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ পদে তিনি আট বছর বহাল ছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে যে, ১৫ আগস্ট '৮৬ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণের দু'দিন পরে এরশাদ জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। নির্বাচনের ৫/৭ দিন আগে এক কৃষক সম্মেলনে জেনারেল এরশাদকে "পল্লী বন্ধু" খেতাব দেয়া হয়।

নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে। তন্মধ্যে চারজন পরে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে। বিশিষ্ট প্রার্থিদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল এরশাদ, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর),ও ১৫ আগস্ট '৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত নির্বাচন বয়কোটের ঘোষণা দেয়। নির্বাচনে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। সরকারী হিসেব মতে ৫৪% ভোটার ভোট দেয়। তন্মধ্যে জেনারেল এরশাদ ৮৩.৫৭% ভাগ, হাফেজ্জী হুজুর ৫.৬৯% ভাগ এবং কর্নেল ফারুক ৪.৫১% ভাগ ভোট পান। অন্যান্যরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট পান নি। বিরোধী দলগুলো দাবী করে যে, শতকরা ৩% ভাগ ভোটারও ভোটকেন্দ্রে যায় নি। তাদের ভাষায় ঐ নির্বাচন ছিল আরেকটি প্রহসন। ২৩ অক্টোবর জেনারেল এরশাদ পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সৈনিক থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হন। বিরোধী দলগুলো ঐদিনটিকে 'কালো দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করার পর জেনারেল এরশাদ দাবী করেন যে, জাতির প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার তিনি পূরণ করেছেন। জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয় ১০ নভেম্বর '৮৬। এ অধিবেশনে সরকারী দলের পক্ষ থেকে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল আনা হয়। এ বিলের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ এবং বিগত সাড়ে চার বছরের সামরিক আইনের আওতায় তাঁর সরকারের গৃহীত সকল ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয়। এ বিল পাশের জন্য ৩৩০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২২০ জনের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। বিলটি পাশের ব্যাপারে সরকার ক্ষুদ্র দলগুলোর সমর্থন লাভ করে। জাতীয় পার্টির ২০৮ জন, জাসদ (রব)-এর ৪ জন, জাসদ (সিরাজ)-এর ৩ জন, বাকশালের ২ জন, মুসলিম লীগের ৪ জন ও স্বতন্ত্র ২ জন সদস্য ইনডেমনিটি বিলটির

www.pathagar.com

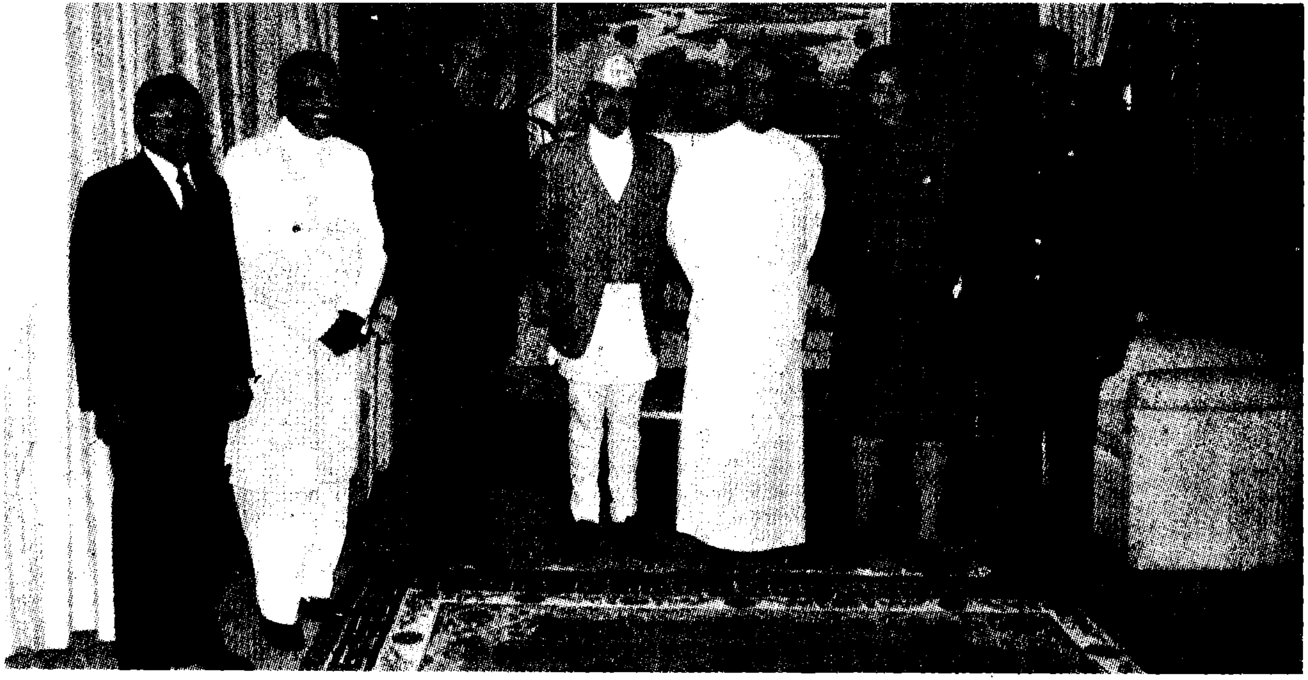

প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে.সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সাথে প্রেসিডেন্ট এরশাদ

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা পরিদর্শনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ

www.pathagar.com

পক্ষে ভোট দেয়। জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সংবিধান পুনর্বহালের ঘোষণা দেন।

আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের প্রথম দু'টি অধিবেশনে যোগ না দিলেও তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দেয়। তারা সংসদের ভেতরে ও বাইরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করে। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ ও সংসদ বাতিলের দাবি জানাতে থাকে। ৬ দলীয় বামপন্থী জোট ও জামায়াতে ইসলামী ৭ দলীয় জোটের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট সংসদ বাতিলের পক্ষে ছিল না। ফলে অন্যান্য আন্দোলনরত জোট ও দলের সাথে ঐক্য সম্ভব হচ্ছিল না। এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করলে আওয়ামী লীগ সম্মিলিতভাবে আন্দোলনের কথা পুনর্ব্যক্ত করে। এসময় ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেট সংসদে পেশ করা হয়। একে ইস্যু করে বিরোধী দলগুলো দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। একই সময়ে সংসদে জেলা পরিষদ বিলও উত্থাপন করা হয়। এতে সামরিক সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জেলা পরিষদে 'নন-ভোটিং' সদস্য রাখার কথা বলা হয়। এর প্রতিবাদে সকল বিরোধী দল, ছাত্র সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনগুলো একযোগে ৫৪ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয়। এর ফলে সংসদে বাজেট পাশ হলেও প্রেসিডেন্ট জেলা পরিষদ বিলটি সংসদে পর্যালোচনার জন্য ফেরত পাঠান। কিন্তু সংসদে তা আর কোনদিন উত্থাপিত হয়নি।

বিরোধী জোট ও দলগুলো জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে সম্মিলিত কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দেয়। সরকার একে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এ সময় এরশাদের জন্য তিনটি পথ খোলা ছিলঃ (১) বিরোধী দলগুলোর সাথে আপোষ আলোচনা করা, (২) সংসদ বাতিল করে মধ্যবর্তী নির্বাচন দেয়া; (৩) জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা। বেগম জিয়া 'অবৈধ' এরশাদ সরকারের সাথে যে কোন আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষে ছিল না। এমতাবস্থায় সংকট আরো গভীর হয়।

বিরোধী দল নভেম্বর ১২, ১৯৮৬ ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। বহু রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ঐদিন ঢাকায় ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণ, অগ্নি-সংযোগ, গাড়ী ভাংচুর হয়। জনতা আমেরিকার বাইসেন্টেনিয়াল হলে অগ্নি-সংযোগ করে। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয়। এদিন ৬ জন নিহত ও প্রায় একশ' লোক আহত হয়। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার ও গৃহবন্দী করা হয়। বিরোধী দল ১৪ ও ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত হরতালের সময় বৃদ্ধি করে। ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত হরতাল অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। ২৯ নভেম্বর থেকে আবার ৭১ ঘন্টার হরতালের ডাক

www.pathagar.com

দেয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করলে ২৭ নভেম্বর '৮৬ সংবিধানের ১৪১ (এ) (১) অনুচ্ছেদের অধীনে সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এর ফলে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ স্থগিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, বিরোধী দলগুলো 'পরিকল্পিত নৈরাজ্য' ও 'পরিকল্পিত সন্ত্রাস' শুরু করেছে এবং তিনি 'অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক চাপের' কাছে নতি স্বীকার করবেন না। এ সময় প্রেসিডেন্ট চারটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেনঃ (ক) সরকার বিরোধী দলগুলোর সাথে পৃথকভাবে বা সামষ্টিকভাবে সকল যুক্তিসংগত বিষয় আলোচনা করার প্রস্তাব; (খ) যদি নতুন নির্বাচনের ব্যাপারে সকল একমত হয়, তবে তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে, প্রয়োজনে তা এগিয়েও আনা যেতে পারে; (গ) নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনার জন্য আলোচনার ব্যাপারে ঐকমত্য ও সে অনুযায়ী সুপারিশ করা হলে তা বাস্তবায়নের জন্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে; (ঘ) যদি কোন দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তারা সংবিধান সংশোধন করতে চায় তাহলে তার দিক থেকে কোন বিরোধিতা করা হবে না।

প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর পরই রাজনীতিকদের অনেককেই কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। অবশ্য বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা তখনও গৃহবন্দী ছিলেন। ইতোমধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং স্বতন্ত্র সদস্যরাও। এ অবস্থায় এরশাদ তড়িঘড়ি করে সংসদ ভেঙ্গে দেন। এর চারদিন পরে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়া হয়। সরকার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেন। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। বিরোধী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, তারা কোন অবস্থাতেই এরশাদ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ নেবেন না। তারা নিরপেক্ষ 'কেয়ারটেকার' সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দল, বামপন্থী ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামী সম্মিলিতভাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের দাবী জানায় এবং একের পর এক হরতাল আহ্বান করে।

এরূপ রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে সরকার ঘোষণা করে যে, ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য পরবর্তীতে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে মার্চ মাসের ৩ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিরোধী দল একে 'ষড়যন্ত্র ও নোংরামি' বলে অভিহিত করে। নির্বাচনে ৮ টি রাজনৈতিক দলের ৭৬৫ জন প্রার্থী ও স্বতন্ত্র ২১৭ জন প্রার্থীসহ মোট ৯৯২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে। একমাত্র জাতীয় পার্টি মোট

www.pathagar.com

৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়। তম্মধ্যে ১৬ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। ৭৬টি ছোট ছোট দল ও উপদলের সমন্বয়ে জাসদ নেতা আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল ২৭০টি আসনে মনোনয়ন দেয়। এছাড়া ফ্রিডম পার্টি ১১০টি, ২৩ দলীয় জোট ৩৩টি, জাসদ (সিরাজ) ২৩টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৩টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী এ নির্বাচন থেকে বিরত থাকে। এ নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই ৭ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়। সরকারী বিবরণ মতে ৫০% ভোটার ভোট দেয়। জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯ টি, ফ্রিডম পার্টি ২ টি, জাসদ (সিরাজ) ৩টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫টি আসন পায়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় এ নির্বাচনও সমস্যা সমাধানে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি।

'৯০ এর গণঅভ্যুত্থান

১৯৯০ সালের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বিশেষ করে ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ সারাদেশে গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, অগ্নি সংযোগ, গাড়ী ভাংচুর ইত্যাদি ঘটে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ঐ দিন ৫ জন নিহত ও শত শত আহত হয়। ঐদিন সাত দলীয় জোটের ৫ জন নিহত ও শত শত আহত হয়। উল্লেখ্য, ঐদিন বিরোধী দলের সচিবালয়ের নিকটে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী ছিল। সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৩ অক্টোবর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, ১৪ অক্টোবর দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোক দিবস পালিত হবে।

১৫ অক্টোবর রাজধানীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৬ অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলোর ডাকে সারাদেশে ৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল চলাকালে বিভিন্ন স্থানে গুলি, লাঠিচার্জ ও জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলে। ১৭ অক্টোবর রাজশাহী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারী আদেশের এ বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯ অক্টোবর সুপ্রীম কোর্টে রীট আবেদন করা হয়। ১৯ অক্টোবর বিরোধী ও জোটগুলো সারাদেশে শোকদিবস পালন করে। ২১ অক্টোবর তারা সারাদেশে বিক্ষোভ দিবস পালন করে। ২৩ অক্টোবর দেশব্যাপী জেলা উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে সারাদেশে সংঘর্ষ ও বোমাবাজি হয়। ২৭ অক্টোবর সারাদেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে জনজীবন অচল, ভাংচুর ও বোমাবাজি চলে। ৬ নভেম্বর সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বিরোধী জোট ও দলগুলো বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ৮ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ ভাংচুর ও বোমাবজি হয়। ১০ নভেম্বর সরকার অপসারণ, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সংসদ বাতিলের দাবিতে বিরোধী জোট ও দলগুলোর ডাকে দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ১১ নভেম্বর সরকারী ঘোষণা লঙ্ঘন করে ছাত্র-শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। ১৪ নভেম্বর রাজশাহী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাত্র শিক্ষকরা খুলে দেয়। ঐদিন আদমজীতে শ্রমিক সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হয়। একই দিনে সিলেট ওসমানী কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৫ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস পালন করে এবং তারা মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। এতে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ১১ নভেম্বর ৮ দল, ৭দল ও ৫ দলীয় জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। ২০ নভেম্বর বিরোধী দল ও জোটগুলো দেশব্যাপী ২৪ ঘন্টার হরতাল পালন করে। তারা ২১ নভেম্বর ঘোষণা করে যে, ১০, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচী পালিত হবে। এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, হরতাল ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটতে থাকে। ২২ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিলেও সরকার সমর্থকরা গুলিবর্ষণ করে। ২৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থকদের সশস্ত্র তৎপরতা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সমর্থকদের সাথে গোলাগুলি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চলে ও অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়। ২৭ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষিতে সারাদেশে সংবাদ প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কয়েকদিন যাবৎ ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। ২৭ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সার দেশে বলতে গেলে গণঅভ্যুত্থান ঘটে।

এসময় ঢাকাসহ সারাদেশে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ এরশাদ সরকারের পতন ত্বরান্বিত করে। ২৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জরুরী অবস্থার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে বিশাল লাঠি মিছিল বের করে। বিক্ষুব্ধ জনতা ধানমন্ডির জাতীয় পার্টি অফিসে হামলা চালায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্ফ্যু জারী করা হয় এবং গুলিবর্ষণে বহু লোক নিহত হয়। ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সকল শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সংবাদ প্রকাশের বিধি-নিষেধের প্রতিবাদে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ রাখা হয়। কার্ফ্যু লঙ্ঘন করে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মিছিল বের হতে থাকে। জাতীয় পার্টির কর্মীদের সাথে বিভিন্ন স্থানে খন্ড লড়াই সংঘটিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার পক্ষের নেতাদের বাড়িতে হামলা চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার পুলিশ ও বিডিআর এর পাশপাশি সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করে। ১ ডিসেম্বর মিরপুরে হরতালের সমর্থনে জনতার বিশাল মিছিলে বিডিআরের গুলিবর্ষণে ঘটনাস্থলেই ৫ জন নিহত হয়। এ সময় জরুরী অবস্থা জারীর পরিপ্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটেন ও ভারত কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে যে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার নিষ্পত্তি করা না হলে সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হতে পারে। ২ ডিসেম্বর আইনজীবীগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য আদালত বর্জনের ঘোষণা দেন। এরশাদ সরকারের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ডাঃ অধ্যাপক আব্দুল মতিন ও অপর ৩ জন মন্ত্রীসহ জাতীয় পার্টির ১৯ জন সংসদ সদস্য একদিনে পদত্যাগ করে এবং স্পীকারের নিকট পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করে। চিকিৎসকরা সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসে। সচিবালয় বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২০ জন কর্মকর্তা পদত্যাগপত্র পেশ করে। এ সময় চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি এডাবভুক্ত ৫৮টি এন জি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। ক্রমান্বয়ে যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে তখন ঢাকায় জাতিসংঘের সকল সংস্থার কার্যক্রম ও দপ্তর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতির অবনতি প্রত্যক্ষ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন আগে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাঁর এ ঘোষণা বিরোধী দল ও জোটগুলো কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এমতাবস্থায় তিনি তিন জোট মনোনীত কোন ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হওয়ার পর তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে উল্লেখ করেন। বিরোধী দল ও জোটগুলো তার সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের নয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবীতে ৪ ডিসেম্বর রাজপথে লাখ জনতার মিছিল হয়। প্রেসক্লাবের সামনে বিভিন্ন সংস্থা অবিরাম অবস্থান করে। এরশাদের কুশপুত্তলিকা ও ছবিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিসিএস সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে সচিবালয় থেকে অফিসার ও কর্মচারীরা রাজপথে নেমে আসে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শতাধিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন। বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতি উপরাষ্ট্রপতি মওদূদ আহমদের সাংবাদিক সম্মেলন বর্জন করে। মতিঝিল অফিস পাড়া থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মিছিলে এসে যোগ দেয়। নানা ধরনের প্রতিবাদী প্রকাশনায় আন্দোলনের সর্বশেষ তথ্য জনগণের হাতে দ্রুত পৌঁছে যেতে থাকে। বিকালে ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশ থেকে অভিন্ন ঘোষণায় এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। ঘোষণা করা হয় নতুন কর্মসূচী। ৩ ডিসেম্বর সাড়ে দশটায় নাটকীয়ভাবে রেডিও-টেলিভিশনে এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা দেয়া হয়। 'রাতের অন্ধকার ছিন্ন করে রাজপথে লাখো জনতার বিজয় ও আনন্দ মিছিল শুরু হয়। রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষুব্ধ নারী-পুরুষের পায়ের তলায় এরশাদ ও তাঁর তাঁবেদারের প্রতিকৃতি পিষ্ট হয়-----উত্তাল বিজয় মিছিল, রকমারী শ্লোগান ও গণসংগীতে রাজপথ মুখরিত হয়। ৪ ডিসেম্বর সকালে লাখো মানুষের ঢেউ মহাপ্লাবনের মত মহানগরীর প্রধান সড়কগুলোতে

www.pathagar.com

নেমে আসে। নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী সম্মিলিতভাবে অবিলম্বে পদত্যাগের দাবীতে অনড় ভূমিকা পালন করে। এরশাদ তাঁর প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবেন এবং তিনি তিন জোটের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে পদত্যাগ করে তিনি ও তাঁর দল নির্বাচন করবেন। বিরোধী জোটগুলো রাজী হবার পর মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল করা হবে। ১৬ ডিসেম্বর নাগাদ জরুরী আইন তুলে নেয়া হবে। রেডিও টিভিতে সকল জোট ও দলকে প্রচারের সুযোগ দেয়া হবে। সেই সঙ্গে নির্বাচনের সময় জিমি কার্টারসহ বিদেশী পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। নির্বাচন কমিশন ঢেলে সাজানো হবে। নব নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতিকে বর্তমান সংসদ কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের এ নতি স্বীকার তাৎক্ষণিকভাবে আন্দোলনরত শক্তিগুলোকে আরো সাহসী ও তীব্র করে তোলে। জনতা অবিলম্বে এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে মুখর হয়ে ওঠে। ঐদিন রাতে বেগম জিয়া বিবিসিকে বলেন, "তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে, এক্ষুণি করতে হবে।" অবশেষে ৪ ডিসেম্বর রাত ১০.২১ মি. প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পরদিন ৫ ডিসেম্বর বিরোধী তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে মনোনয়ন দেন।

এরশাদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

এরশাদ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ৪৬০ টি থানাকে উপজেলায় পরিণত করে পশ্চাৎপদ থানাগুলোকে দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্প ব্যয়ে আইনের সুবিধা ত্বরিৎ গ্রহণ করতে পারে এবং মামলা-মোকাদ্দমা যাতে স্তূপীকৃত হয়ে না পড়ে সেই লক্ষ্যে তিনি ৪৬০টি উপজেলায় উপজেলা আদালত স্থাপন করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে থানা/উপজেলা পর্যায়ে অফিস আদালত ও সরকারী আবাসিক ভবন নির্মানের জন্য ৩.১৯ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে একই কাজের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে ৬.৯৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ ছাড়া বিচার ব্যবস্থা যাতে জনগণের সহজলভ্য হয় তার জন্য দেশের ৬টি স্থানে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন; এর ফলে উচ্চতর আদালতে প্রচুর ঝুলন্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির পথ সুগম হয় এবং জনসাধারণের অপেক্ষাকৃত কম খরচে হাইকোর্টের সেবা পাওয়ার পথ নিশ্চিত হয়। অবশ্য পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের এক রুলিং-এর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ বাতিল করা হয়। মহকুমাগুলোকে জেলায়

www.pathagar.com

পরিণত করে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনকে তিন স্তরে রূপান্তরিত করা হয়। মোট ৬৪টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। সরকারী অর্থের অপচয় রোধকল্পে ৪২টি মন্ত্রণালয়কে কমিয়ে ২৬টি মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। ১৫৫টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে কমিয়ে ১০৯টিতে আনা হয়। রাজধানী ঢাকাসহ চট্টগ্রাম পৌরসভা ও রাজশাহী পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এরশাদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ-যুগের পুরানো সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করে একটির স্থলে ৩টি স্বশাসিত পার্বত্য জেলা গঠন করেন।

পররাষ্ট্র নীতি

এরশাদ ইসলামী বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্ধে এবং ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রামে এরশাদ সরকার বলিষ্ঠ সমর্থন দান করেন। ইরাকের কুয়েত আগ্রাসনের সময়ে এরশাদ সৌদি আরবে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। এরশাদ সার্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৫ সালে প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়।

এরশাদের আমলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

জেনারেল এরশাদ শাসনকাল প্রায় ন'বছর স্থায়ী হয়। এ সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) মোট সম্পদ বরাদ্দ করা হয় ১৭২ হাজার মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে সরকারী খাতের বরাদ্দ ছিল ৬৪.৫% এবং বেসরকারী খাতে ৩৫.৫%। এ পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় যে, উন্নয়ন বরাদ্দের ৬৩.৫% ছিলো বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। এ সময় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পায়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুকূলে ছিলো না। এ সকল কারণে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪% এর বিপরীতে মাত্র ৩.৮% অর্জিত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৩৮৬ হাজার মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে সরকারী খাতে ৬৪.৮% ও বেসরকারী খাতে ৩৫.২% বরাদ্দ ছিলো। এ পরিকল্পনাকালেও জিডিপির প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম ছিলো। এসময় পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালের মতই জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার ৫.৪% এর বিপরীতে মাত্র ৩.৮% অর্জিত হয়।

www.pathagar.com

আমদানী-রপ্তানি

১৯৭৯-৮০ সালে দেশের মোট রপ্তানি আয় ছিলো ১১১৮৭ মিলিয়ন টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে তা ৩০২৮২ মিলিয়ন টাকায় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ৬২৬৮৩ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৯-৮০ সালে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিলো জিডিপির ৫.৫৮%। ১৯৮৫ সালে তা বৃদ্ধি পায় ৭.৪৪% এ, এবং ১৯৯০-এ ৮.৩৫%-এ। আমদানী ক্ষেত্রে ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ৩৬৮৭১ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হয়। ১৯৮৫ সালে তা ৭৪৬২৫ মিলিয়ন টাকায় এবং ১৯৯০ সালে ১৩৬৮৭৫ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। মোট আমদানীর পরিমাণ ১৯৮০ সালে ছিলো জিডিপির ১৮.৪০%। ১৯৫৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.৩৪% এ। দাঁড়ায়। ১৯৮০ সালে দেশে মোট বিনিয়োগ ঘটে ২৯২১০ মিলিয়ন টাকা ১৯৮৫ সালে তা ৫২৩১২ মিলিয়ন টাকায় এবং ১৯৯০ সালে ৯৪৪২৭ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। লক্ষণীয় যে, জেনারেল এরশাদের শাসনকালে মোট জিডিপির তুলনায় বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮০ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো জিডিপির ১৪.৫৭%। কিন্তু তা দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ১২.৭৮% এ এবং তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ১২.৫৮% এ নেমে আসে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২৭.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় ১৫.৮ মিলিয়ন। বন্যা,খরা, অপর্যাপ্ত সেচ সুবিধা এবং সার বিতরণে ঘাটতির কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এসময় ৭২১ মিলিয়ন একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও অর্জিত হয় মাত্র ৬.১২ মিলিয়ন একর। ১.৬ মিলিয়ন টন সার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১.২৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন সার বিতরণ সম্ভব হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ও পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং মোট উন্নয়ন পরিকল্পনার ৩০% সম্পদ এ পরিকল্পনায় নির্ধারণ করা হয়। এ সময় ২০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮.৭৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে মারাত্মক বন্যার কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ সময় সার বিতরন বেসরকারী খাতে দেয়া হয় এবং যন্ত্রপাতি আমদানি নীতি উদার করা হয়। কিন্তু কৃষিখাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির শতকরা ৪% লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ২.৫% অর্জন করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

শিল্পোন্নয়ন

জটিলতা পরিহার করে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে এরশাদ ১ জানুয়ারী ১৯৮৮ সালে বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করেন। উদার নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। চট্টগ্রামে গড়ে ওঠে রফতানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলে নানা শিল্প-কারখানা। এরশাদের আমলে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং লক্ষাধিক নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এ শিল্পে। এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে বিরোধী দলের হরতালের কারণে বাংলাদেশের তিন হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৯৮৭ ও ৮৮ সালে পৌনঃপৌনিক ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির পরও ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জিএনপি (GNP) ২.৪% আর রফতানী ছিল ১.৩ মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কৃষিখাতে সমর্থন যোগান, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (দায় পরিশোধ) অবস্থা সংহতকরণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মৌলিক শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সম্পদ উন্নয়নের সুষম শিল্প-কাঠমো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং সুষ্ঠু দেশীয় প্রযুক্তির ভিত্তি উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। এছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনায় অপচয় বন্ধ ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন ও শ্রমক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০.১%। কিন্তু অর্জিত হয় মাত্র ৪.২২%। সরকার ১৯৮২ সালে নতুন শিল্পনীতি ও ১৯৮৬ সালে সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এতে শিল্পখাতে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয় ও কাঠামোগত উৎসাহ প্রদান করা হয়। এর ফলে অপ্রচলিত রপ্তানি শিল্প যেমন-তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালে মেন্যুফ্যাকচারিং খাত থেকে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৬১৭.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৮৯-৯০সালে তা ১২০০.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এ খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৪.২১%। রপ্তানি ক্ষেত্রে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির হার ছিল ১৯৮৪.৮৫ সালে ৩৫.৮%। ১৯৮৯-৯০ সালে তা ৬৭.৭৪-এ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, এপরিকল্পনাকালে রপ্তানির সার্বিক পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১২.১% হ্রাস পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৩৯টি সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা হয় এবং তা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু বেসরকারী খাতের ক্রেতারা কিস্তি অনুযায়ী যে মূল্য পরিশোধ করেছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

www.pathagar.com

পরিবহন ও যোগাযোগ

এরশাদের নেতৃত্বে দেশে অসংখ্য রাস্তা ও কালভার্ট তৈরি করা হয়। তাঁর আমলে ৭৪৪ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ১১০২৪৯ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সড়ক নির্মাণসহ এসময় মোট ১২৪৫ কিঃ মিঃ সড়ক নতুন নির্মাণ করা হয়। মেঘনা সেতু, টেকের হাট সেতু, ফরিদপুরে গড়াই সেতু, ঢাকার রামপুরা সেতু, কালিজিঁরা সেতু, কর্ণফুলি সেতুসহ এরশাদের সরকার ছোট বড় ৫০৮টি সেতু নির্মাণ করে। এ সময়কালে সড়ক উন্নয়ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় খুলনা-মংলা সড়ক নির্মাণ করা হয় এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-আরিচা সড়কের মানোন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ১৯টি সেতুর মধ্যে ১১টি পুনঃস্থাপন করা হয়। থানা কেন্দ্রগুলোকে নিকটস্থ পাকা সড়কের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ সময় ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জের সেতুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এরশাদ মহানন্দা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে চীনের সাথে চুক্তি করেন এবং গোমতি সেতু নির্মাণের ব্যাপারে জাপানের সাথে সমঝোতায় পৌছেন। যমুনা ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে এরশাদ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিশেষ উদ্যোগের ফলেই বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি যমুনা ব্রীজ পরিকল্পনা অনুমোদন করে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যমুনা বহুমূখী সেতুর জন্য ২.৪০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়। যমুনা ব্রীজের নির্মাণ কাজ ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু হবার কথা ছিল। এরশাদের পদত্যাগের কারণে যমুনা ব্রীজ নির্মাণের কাজ তখন শুরু হয়নি। এরশাদ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং দ্রুত চলাচল নিশ্চিত ও আরামদায়ক করার জন্য ৪৬টি আন্তঃনগর ট্রেন চালু করেন। দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় রেল ব্যবস্থা অবহেলিত ছিল বলে তিনি রাজশাহীতে রেলের কার্যালয় স্থানান্তর করেন । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রেল লাইনের পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি পায়নি। রেলওয়ে খাতে লোকসান পূর্বের মতোই থাকে। এরশাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দরের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করেন । এছাড়া তিনি বরিশাল বিমান বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই দেশে ৯টি টিভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয় এবং ঢাকার আগারগাঁয়ে বাংলাদেশ রেডিও'র শক্তিশালী ও অধিকতর আধুনিক রেডিও কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে এরশাদের সময় ৬২ হাজার নতুন টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়। এর মধ্যে ১৬ হাজার সংযোগ গ্রামে চালু করা হয়েছে। সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতির মাধ্যমে রাজধানীর সাথে বিভিন্ন জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ২৮টি থানা সদরে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। বিশ্বের ১২০টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি ডায়ালিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ডাক সার্ভিসের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৫৮টি নতুন ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস এবং ৫ টি সাব পোস্ট অফিস চালু করা হয়। এরশাদের সময়ে পোস্ট কোড চালু করা হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষা

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। কিন্তু তা তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ১৩ মিলিয়ন নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিপরীতে অর্জিত হয় ৮.৯২ মিলিয়ন। পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোর অভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। গণশিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়নও সন্তোষজনক ছিলো না। পরিকল্পনাকালে ১০-৪৫ বছর বয়সের ৪০ মিলিয়ন লোককে গণশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও মাত্র ০.৭ মিলিয়ন লোক এ কর্মসূচীর আওতায় আসে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪.৯ মিলিয়ন। তার বিপরীতে ১২ মিলিয়ন অর্জন করা সম্ভব হয়। এ পরিকল্পনাকালে ১০০০ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬৮৮১-তে। ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুটি প্রকল্পের আওতায় ১৪৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনঃ নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৫ সালে তা ১০৪৪০টিতে উন্নীত হয়। এসময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি নতুন বিভাগ খোলা হয়। ফলে ভর্তির জন্য ২২৫৩টি আসন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সিলেট ও খুলনায় ২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে সারা দেশে এরশাদের নয় বছরে ৯১টি কলেজ ও ১৪৪টি স্কুল জাতীয়করণ করা হয়েছে। এরশাদ গ্রামের মেয়েদের জন্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল স্কুল ২৪৩.৯৬ লক্ষ সেট পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এরশাদের আমলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেন। তিনি সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ তাঁর সময়ে এগিয়ে যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হল এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল নামে দু'টি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। জগন্নাথ হলের বহুতল ভবনের নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। জগন্নাথ কলেজের ডঃ মিলন হল নির্মাণ করেন। তিনি বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্যে সরকারী অনুদান শতকরা ৩০ থেকে ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করেন এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষদের বেতন সরকার থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এসময়ে সরকার দীনিয়াত শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেন। এরশাদ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষাকে প্রথম শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করেন।

www.pathagar.com

সমাজকল্যাণ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে 'রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' বাস্তবায়ন করা হয় এবং এর আওতায় ১০৮টি থানায় ৩৯১ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং এ লক্ষ্যে ১৯৬টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৬৩০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১৮০০০ প্রতিবন্ধী ও ১২০০০ এতিম শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করা হয়। এরশাদ ঢাকায় শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকায় নতুন হোস্টেল নির্মাণ করেন। মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য গুলশানে মাদক নিরাময় চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাস্তায় ছিন্নমূল ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণে তিনি 'পথকলি ট্রাস্ট' গঠন করেন। পথকলি ট্রাস্টের মাধ্যমে পথকলি বিদ্যালয় স্থাপন করে দুঃস্থ শিশুদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। এরশাদ এতিমখানাগুলোর উন্নতি সাধন করেন এবং এতিমখানার বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন। তিনি শিশুদের জন্য ঢাকায় ধাঙ্গর বহুতলা কলোনী নির্মাণ করেন এবং ধাঙ্গরদের ছেলে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। টঙ্গী এরশাদ নগরে ঢাকার হাজার হাজার বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করেন। এরশাদ তাদের প্রত্যেক পরিবারকে তৈরি ঘর প্রদান করেন। বাসাবোর ওহাব কলোনীর বস্তিবাসীরা জমির মালিকানা লাভ করে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩১০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নারী ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এসময় সরকারী কর্মসূচিতে ১৫% কোটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং সরকারী চাকরীতে মহিলাদের বয়স ৩০ বছরে নির্ধারণ করা হয়। এ সময় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৬০০০০ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২ লক্ষ মহিলাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ২০০০০ মহিলাকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়।

জেনারেল এরশাদ পারিবারিক আদালত গঠন ও যৌতুক বিরোধী আইন পাশ করেন। তাঁর সরকার নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারি করে এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের সংশোধন করে। এসময় সরকার চাকুরীতে মহিলাদের কোটা গেজেটেড পদে ১০% ও নন গেজেটেড পদে ১৫% সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন। এরশাদ সরকার এসিড দ্বারা নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা বন্ধের জন্য এসিড নিক্ষেপের সাজা মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। ফলে এসিড নিক্ষেপের ব্যাপকতা কমে যায়।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম

এরশাদ সাংবিধানিকভাবে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে মর্যাদা দেন। পাশপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দু-খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করেন। এরশাদের আমলে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার রাষ্ট্রের টাকায় সম্পন্ন হয়। তিনি মসজিদ-মন্দির-বৌদ্ধবিহারের বিদ্যুতের বিল স্থায়ীভাবে মওকুফ করেন। এরশাদ রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি প্রবর্তন করেন। একমাত্র ঢাকা নগরে নিউমার্কেট মসজিদ, পিডব্লিউডি ভবনের নতুন মসজিদ, ওসমানী উদ্যানের মসজিদ, বেলী রোডের অফিসার্স ক্লাবের মসজিদ, গুলশান মসজিদ, গাওসুল আযম কমপ্লেক্স এরশাদের সময়ে নির্মিত হয় এবং তাঁর প্রচেষ্টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করে জাতীয় মসজিদের মর্যাদা দেয়া হয়। তাঁর আমলে সারা দেশে বহু মসজিদের সংস্কার কাজ করা হয়। ঢাকার হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। নামাযের সময়ে রেডিও-টিভিতে আজান প্রচারের ব্যবস্থা এরশাদের উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়। এরশাদ যাকাত বোর্ড সংগঠিত করেন। এরশাদের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়।

শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণে এরশাদ

এরশাদ সরকারী কর্মচারী ও শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন । দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে নয়া বেতন স্কেলের প্রবর্তন করেন। এরশাদ পদত্যাগের কয়েকমাস আগে আরো বাড়তি বেতন-ভাতার সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নতুন পে-কমিশন ও মজুরী কমিশন গঠন করেন। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ-৬৯ বাতিল এবং শ্রমিক কল্যাণধর্মী শ্রম আইন প্রবর্তন এরশাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি শ্রমিকদের জন্য প্রতি বছর দুই মাসের বেতন অবসর গ্রহণের সময় গ্রাচুয়িটি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন, পূর্বে তা ছিল প্রতি বছর ১৫ দিনের সমান। তিনি বেতনের শতকরা ৮০% ভাগ পেনশন নির্ধারণ করেন, দুই ঈদে একমাসের বেতন করে উৎসব বোনাস হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি দু'টি ওয়েজ বোর্ড প্রদানের মাধ্যমে সংবাদপত্রসেবীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন।

যুব উন্নয়ন

১৯৮০-৮৫ সময়কালে ২৫৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৬৩০৭০ জন যুবককে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন-পশুপালন ও হাঁস-মুরগী ফার্ম, টেলিযোগাযোগ, কৃষি, মৎস্য,

www.pathagar.com

ড্রাইভিং, অটোরিকশা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০০০ যুবক আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৪২৯৩৭. জন যুবককে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ১৭৭৩৯ জন যুবক আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খেলাধূলা উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও কোচিং সেন্টার, স্টেডিয়াম, টেনিস কমপ্লেক্স, গলফ্ কোর্স নির্মাণ করা হয়। জেলা সদরে জিমনেসিয়াম/ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩৩টি স্টেডিয়ামকে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। জাতীয় পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) ক্রীড়া কলেজ হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করে। বিকেএসপি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে খেলাধূলার মান উন্নয়নে এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। খেলাধূলায় বিকেএসপি'র সাফল্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এরশাদ সরকার খেলাধূলার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য মিরপুর ২ নং জাতীয় স্টেডিয়াম নির্মাণ করে। এসময় সেনাবাহিনী খেলাধূলার মানোন্নয়নে বনানীতে আর্মি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়। এরশাদ ১নং জাতীয় স্টেডিয়ামের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করেন এবং ঢাকায় পৃথক হকি স্টেডিয়াম নির্মাণ করেন। তিনি মহিলাদের খেলাধূলার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। এসময় ঢাকার টেনিস কমপ্লেক্স আরো উন্নত হয় এবং মিরপুর সুইমিংপুল নির্মিত হয়।

স্বাস্থ্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' শীর্ষক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। সরকার ১৯৮২ সালে জাতীয় ঔষধ নীতি ঘোষণা করেন। এ নীতির আওতায় বাজারে ৪০০০ ব্রান্ডের চালু ওষুধের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় প্রায় ১৭০৭ প্রকার ঔষধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের WHO সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক এরশাদের গণমুখী ওষুধ নীতি ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এরশাদের আমলে ৪৬০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করার বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। এরশাদ ঢাকায় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পিজি হাসপাতালের কিডনী ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 'স্মল পক্স' বা গুটি বসন্ত নির্মূল হয় এবং কলেরা রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। তৃতীয়

www.pathagar.com

হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু উদ্বোধন করছেন প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ

www.pathagar.com

পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্যখাতের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে ৩৯০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে সার্বিকভাবে সচল হয়। এসময় হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শয্যা প্রতি জনসংখ্যার অনুপাত দাঁড়ায় ১ ঃ ৩২০০। এসময় টিকাদান কর্মসূচি বিসিজি-র ক্ষেত্রে ৭৫%, ডিপিটি-র ক্ষেত্রে ৮%, হামের ক্ষেত্রে ৫০%, পোলিওর ক্ষেত্রে ৬৮% ও গর্ভকালীন টিটি প্রদানের ক্ষেত্রে ৪৫% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। তিনি মাদকদ্রব্য ও ধূমপানের বিরুদ্ধে নতুন প্রচারব্যবস্থা জোরদার করেন। টিভিতে ধূমপান সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করেন। বঙ্গভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন। তিনি মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে নতুন করে ড্রাগ ও নারকোটিকস বোর্ড গঠন করেন। হিরোইন রাখার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। পরিকল্পনায় ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ জন্ম হার ১.৮% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তা ২.৪৫%-এর নীচে নামেনি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪%-এর নীচে নামেনি। এরশাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৮ ভাগ থেকে কাঙ্ক্ষিত ২.২ ভাগে নিয়ে আসেন বলে দাবী করেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ এরশাদকে জনসংখ্যা পুরস্কারে ভূষিত করে।

ভূমি সংস্কার ও কৃষকদের উন্নয়ন

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করে খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি করে গ্রামীণ আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ৪৬৪টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ৫টি করে গুচ্ছগ্রাম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১২ হাজার পরিবারকে জমি ও বাড়ি প্রদান করা হয়। ক্ষেতমজুররা যাতে অবাধ শোষণের শিকার না হয় তার জন্যে আইন করে তিনি সর্বনিম্ন মজুরী সাড়ে তিন কেজি চাল বা তার সমমূল্যে নির্ধারণ করেন। এরশাদ বর্গাচাষে তেভাগা নীতি প্রবর্তন করেন। বর্গাচাষীদের জন্যে জমিচাষ সর্বনিম্ন ৫ বছর নির্ধারণ করে বর্গাচাষীদের স্বার্থে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৃষকদেরকে তফসিলী ব্যাংক ও মহাজনী ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে তিনি ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করেন যা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে ইতিহাসে বিবেচিত হবে। 'জাল যার জলমহাল তার' নীতি বাস্তবায়ন করে এরশাদ প্রকৃত জেলেদের স্বার্থে কাজ করেন। তিনি জেলেদের জন্যে ঋণের ব্যবস্থা করেন। তিনি দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করেন যার পরিমাণ ছিল

www.pathagar.com

৬০ কোটি টাকা। এরশাদ সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির উপর কর মওকুফ করেন। কৃষি উপকরণ তথা সার ও বীজ কৃষদের কাছে সহজলভ্য করার জন্যে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তা প্রতিযোগিতাভিত্তিক করে তোলেন।

বন্যা সমস্যা

এরশাদের সময় বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা একটা মানবিক সমস্যা হিসাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরশার্দের প্রচেষ্টা ও তৎপরতার ফলে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় "বাংলাদেশের বন্যা ঃ আঞ্চলিক ও ভূমণ্ডলীয় পরিবেশগত প্রেক্ষাপট" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিদেশ থেকে আগত ৩৫জন বিজ্ঞানীসহ ১৮২ জন বিজ্ঞানী অংশ নেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা মহানগরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অধিকাংশ কাজ এরশাদের সময়ে সমাপ্ত হয়। তিনি ১৯৮৭ সালের ভয়াবহ বন্যার ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেন। এরশাদ ৪০ বছরের অসমাপ্ত তিস্তা ব্যারেজ সমাপ্ত করেন। তিনি ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাবনা সেচ প্রকল্পের কাজও সমাপ্ত করেন। ।

ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণ

এরশাদ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইন কার্যকর করেন। এরশাদের সময়ে ব্যবহারিকভাবে বাংলা ভাষা প্রকৃত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। তিনি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের অসহায় পরিবারদের বাসগৃহ প্রদান করেন এবং ভাতা বৃদ্ধি করেন। এরশাদ মুজিব নগর স্মৃতিসৌধ, পূর্ব নক্সা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মূল নক্সা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। বঙ্গবীর ওসমানীর মাজারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। সিলেটের মেডিকেল কলেজের নাম এবং বিমান বন্দরের নাম ওসমানীর নাম অনুযায়ী রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে সবসময় জাগরুক রেখে সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে টিভিতে জাতীয় সংবাদ পরিবেশনের পূর্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি প্রদর্শন ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে প্রতিবছর এক কোটি টাকা অনুদান দেবার ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের

www.pathagar.com

কাছে ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তর করেন। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজকে যাদুঘর ঘোষণা করেন।

অর্থনৈতিক স্থবিরতা

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারীর সময় জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল এরশাদ বলেছিলেন, "বিদেশী সাহায্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে ক্রমশঃ সরকারের প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করে।" মজার বিষয় হলো এরশাদেরই শাসনকালে শেষভাগে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দাতাদেশ, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত সাহায্যদাতা সংস্থা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এরশাদের আমলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা ও সংকট দেখা দেয় সে সম্পর্কে মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর 'স্বৈরাচারের নয় বছর' গ্রন্থে নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ

বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার কথা থাকলেও এ ৯ বছরে বরং সাহায্য নির্ভরতা বেড়েছে অস্বাভাবিক গতিতে। ১৯৮০-৮১তে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৬৫% ছিল বৈদেশিক সাহায্য; '৮২-৮৩ সালে এ নির্ভরশীলতা ৭৯.৯২% তে দাঁড়ায়। এরপরের বছরগুলোতে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে '৮৬,৮৭তে ৯৭.৯২% পৌঁছে। '৮৮-৮৯ অর্থ বছরে পরিস্থিতির উন্নতির বদলে আরও অবনতি ঘটে। বিদেশী পণ্যের কাছে প্রতিযোগিতায় মার খায় দেশীয় পণ্য। উৎসাহ মূল্য না পাওয়ায় খাদ্য ও পাটসহ কৃষি উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ে। দেশে কৃষকদের আয় পড়ে যাওয়ায় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদায় সংকট দেখা দেয়। শিল্পে বিনিয়োগ হ্রাস পায়। পরিণতিতে শিল্প উৎপাদনও মন্থর হয়ে পড়ে। স্বনির্ভরতা অর্জনের ঘোষিত লক্ষ্য ভেস্তে যায়। ফলে কৃষি শিল্পসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে বাড়তি কর্মসংস্থানের সুযোগ স্থবির হয়ে পড়ে। উপর্যুপরি বন্যা, খরা ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় দারিদ্রের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। অবনতি ঘটে মজুরি ও ক্রয় ক্ষমতার। পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক এবং বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ইকোনমিক মেমোরেন্ডামে'র খসড়ায় দেশের বিপর্যয়কর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরা হয়।

www.pathagar.com

প্রবৃদ্ধির হারে মন্থর গতি

এরশাদ সরকার বছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৮২-৮৯ সময়কালে ৪.৫% শতাংশ অতিক্রম করেনি। এরশাদ সরকারের প্রথম বছর ছিল ১৯৮২-৮৩ সাল। ঐ বছরে বাজেটে ৬% শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ৩.৬% শতাংশ। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত পরের বছরের বাজেট ঘোষণাকালে এব্যর্থতা স্বীকার করে বলেছিলেন, "দেশে অর্থনৈতিক প্রাণ সঞ্চারের প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়। বাজারের চাহিদা ছিলো নিম্নমুখী। রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ ব্যাহত হয়। শিল্পকারখানার মালিকানা পরিবর্তন উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর সাময়িকভাবে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে বিনিয়োগের হার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে অক্ষম হয়।" ১৯৮৩-৮৪ সালের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৬ শতাংশে। এবছরকে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত 'সঞ্চয়ের বছর' এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'বাস্তবায়নের বছর' আখ্যা দিলেও ঐ বছরের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। জিডিপি-তে প্রবৃদ্ধি আসে মাত্র ৪.২%শতাংশ। প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যাপক আকারে কাটছাঁট করা হয়। দেশের অর্থনীতি '৮৪-৮৫ অর্থ বছরে অধঃগতি থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশমুখী হবার প্রবণতা উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা এম সাইদুজ্জামান তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেন, এবার 'অনিশ্চিত অবস্থা' কেটে যেতে পারে। সে অনিশ্চিয়তা কেটে যায়নি। ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও মাত্র ৩.৭% শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এরশাদ শাসনামলে প্রথম তিন বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় '৮৫-৮৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা নামিয়ে ৫.৫% শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। তবু সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় মাত্র ৪.৪% শতাংশে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বারবার ব্যর্থতার পটভূমিতে '৮৬-৮৭ সালে জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা কমিয়ে ৫.২% শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে প্রবৃদ্ধি ঘটে মাত্র ৪.৫% শতাংশ। মাথাপিছু আয় বাড়ে মাত্র ২৫ টাকা। অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামান স্বীকার করেন, 'এই প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি ও পরিকল্পনায় মূল আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলোকে মোটামুটিভাবে অক্ষুন্ন রাখতে হলে এই প্রবৃদ্ধির হারকে উন্নীত করা অপরিহার্য। আমরা প্রবৃদ্ধির বর্তমান হারকে মেনে নিতে পারি না। প্রবৃদ্ধির হারকে উর্ধ্বমুখী করতেই হবে।' পরের বছর আর্থনীতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরেক দফা নামিয়ে ৫.১% শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে প্রবৃদ্ধির মাত্রা আরো মন্থর হয়ে ২.০৯% শতাংশে আসে। এ

www.pathagar.com

হার বার্ষিক ২.৩% শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে বেশ কম। ফলে মাথাপিছু আয়হ্রাস পায়।

১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষনাকালে অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান বলেছিলেন, "বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীতিমালার বাস্তবভিত্তিক পুনর্বিন্যাস করে এবং সেই সঙ্গে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলে প্রবৃদ্ধির হারকে উন্নীত করার প্রচেষ্টায়ই '৮৭-৮৮ সালের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। মূল লক্ষ্য কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।"

খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনে শ্লথগতি

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য কয়েক দফা পিছিয়েছে। হ্রাসকৃত এসব লক্ষ্যমাত্রাও সাত বছরে বাস্তবের মুখ দেখেনি। ১৯৮৫ সালের মধ্যে ২ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যও কাটছাঁট করে ১ কোটি ৭৫ লাখ টনে নামিয়ে আনা হয়। '৮৪-৮৫ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৫৮ লাখ ৩২ হাজার টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৯০ সালের মধ্যে ২ কোটি টন উৎপাদনের অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়। এ প্রত্যাশার বিপরীতে '৮২-৮৯ এ সাত বছরে উৎপাদন বাড়ে মাত্র ১০ লাখ টন। ৮০-৮১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৫১ লাখ টন। এ সাত বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ কোটি। ফলে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ মূল্য নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে বারবার। আপামর কৃষকের সে প্রত্যাশার বিপরীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য আমদানী করা হয়। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ এ সাত বছরে ক্রমাগত হ্রাস পায়। '৮০-৮১ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০ লাখ টন। '৮৮-৮৯ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ ৩ লাখ ৮২ হাজার টনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়।

বেহিসাবী খাদ্য আমদানির ফলে কৃষক সবচেয়ে মার খেয়েছে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের বন্যা উত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার তড়িঘড়ি করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নগদ অর্থে সর্বাধিক খাদ্য আমদানী করে। এ তিন বছরে নগদ অর্থে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার খাদ্যশস্য এসেছে। এ বিপুল অংকের অর্ধেক অর্থই অপচয় হয়েছে। বেহিসাবী খাদ্য আমদানীর ফলে দেশীয় কৃষক দুর্যোগ পরবর্তী মৌসুমে বাড়তি মূল্যের আশায় অধিক শস্য ফলিয়ে মার খেয়েছে। সার ও সেচসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি তুলে নেয়ায় বিরূপ প্রভাবে খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছে বলে পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করছে।

www.pathagar.com

কৃষিক্ষেত্রে 'যুগান্তকারী বৈপ্লবিক' পদক্ষেপের অংগীকার ঘোষিত হয়েছিল। সাত বছরে সে অংগীকার বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। এ সময় কৃষিখাতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় মাত্র ১.৫% শতাংশ। অথচ ১৯৭২-৮১ সময়কালে এখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৩.৫% শতাংশ। ১৯৮২-৮৯ সময়কাল কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির মন্থরতার জন্য পরিকল্পনা কমিশন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশপাশি কৃষি উপকরণের উপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার, কৃষি বিতরণে ভাটাসহ সামগ্রিকভাবে এ খাতে বিনিয়োগ হ্রাসকে দায়ী করে।

'কৃষি ও গ্রামমুখী' নীতিমালা গ্রহণের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে কৃষি উপকরণ থেকে ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়া হয়, কৃষিতে বিনিয়োগ হ্রাস পায়। কৃষি উৎপাদন '৮৮-৮৯ সালে বাড়ে ৪.৬% শতাংশ। '৮০-৮১ সালে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৮% শতাংশ। '৮৩-৮৪ সালে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার নেমে আসে নামমাত্র ১.৬% শতাংশে। যদিও লক্ষ্যমাত্রা হয়েছিল ৫.৯% শতাংশ। পরের বছর প্রবৃদ্ধি হার ছিল ০.৯%শতাংশ; অথচ লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৫% শতাংশ। '৮৫-৮৬ তে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৩.৪% শতাংশ, লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫% শতাংশ। এর পরের বছর প্রবৃদ্ধি আবারও নেমে যায় ১.৬% শতাংশে, লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৫.৫% শতাংশ। '৮৭-৮৮ সালে যদিও লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ধরা হয় ৩.৭% শতাংশ। বাস্তবে প্রবৃদ্ধির হার আরো নেমে দাঁড়ায় ১.০৫% শতাংশ।

অর্থ উপদেষ্টা এম. সাইদুজ্জামান ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট ঘোষণাকালে স্বীকার করেন, 'জাতীয় অর্থনীতি কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রকৃত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়নি।' তাঁর ভাষায় 'প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি, এতে উৎপাদন ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে।'

শিল্পায়নে বিপর্যয়

এ অবস্থা কমবেশি এখনও চলছে। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিল্পক্ষেত্রেও নেমে এসেছিল বিপর্যয়। শিল্প বিনিয়োগে মন্থরতা কমে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে চাহিদা সংকট, সঠিক নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে শিল্পায়নের ঘোষিত লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। রাষ্টায়ত্ত্ব খাত থেকে '৮২'র পর ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া বহু পাট ও বস্ত্রকল; কিন্তু পরে তা 'লে-অফ' বা বন্ধ হয়ে যায়। শিল্পখাতে '৭২-৮১ সময়কালে যেখানে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১৩.৯% শতাংশ, '৮২-৮৯ এ সাত বছরে এ গড় হার ৩%শতাংশে নেমে আসে। অর্থমন্ত্রী এম.সাইদুজ্জামান '৮৫-৮৬ সালের বাজেট ঘোষণাকালে স্বীকার করেন,

www.pathagar.com

'অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলোর অসন্তোষজনক আর্থিক অবস্থার জন্য সরকারের পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এতে উৎপাদন ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ শিল্প ঋণ আদায় অসন্তোষজনক হওয়ায় সংস্থাগুলোর জন্য সাহায্যদাতাদের কাছে থেকে বৈদেশিক মূদ্রায় ঋণ মোটামুটি স্থগিত থাকে।'

মাথাপিছু আয় বাড়েনি

১৯৮২-৮৯ সময়কালে মাথাপিছু নীট জাতীয় আয় ('৭২-৭৩ সালের স্থিরমূল্যে) বেড়েছে মাত্র ৩৫ টাকা। গড়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় মাত্র ৫% টাকা হারে। এরশাদ সরকারের প্রথম বছর '৮২-৮৩ সালে মাথাপিছু নীট জাতীয় আয় ('৭২-৭৩ স্থির মূল্যে) মাত্র ৫ টাকা বেড়ে ৭৩০ টাকায় দাঁড়ায়। পরের বছর বাড়ে ৮ টাকা। '৮৪-৮৫ সালে মাথাপিছু এ নীট জাতীয় আয় এক পয়সাও বৃদ্ধি পায় নি, ৭৩৮ টাকায় স্থির হয়ে থাকে। এর পরের বার মাথাপিছু এ আয় বাড়ে ১৮ টাকা। '৮৬-৮৭ সালে ২৫ টাকা বৃদ্ধি পায়। পরের বার এ আয় বাড়ে নি, বরং উল্টো ৭ টাকা কমে ৭৭০ টাকায় দাঁড়ায়। মাথাপিছু আয় স্থবির থাকার পাশাপাশি এবছরগুলোতে বৈষম্য বেড়েছে দ্রুতগতিতে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব অনুযায়ী প্রায় দশ হাজার নতুন কোটিপতি তৈরির এ ৯ বছরে ভূমিহীন বেকার এবং সহায়-সম্বলহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বিনিয়োগ চাংগা হয়নি

বেসরকারী বিনিয়োগ চাংগা করার বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয় এ ৯ বছরে। কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতিগত জটিলতা এবং উৎসাহজনক পরিস্থিতির অভাবে তা ফলপ্রসূ হয় নি। বরং উল্টো গত দু'বছর ধরে ক্রমাগত বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। '৮০-৮১ সালে দেশে বেসরকারী বিনিয়োগ ছিল ৯শ' কোটি টাকা, যা চলতি মূল্যে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ। '৮৮-৮৯ বছরে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ২০৩৮ কেটি ৬০ লাখ টাকায় দাঁড়াতে পারে। '৮০-৮১ সালে জিডিপির ৯ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল বেসরকারী বিনিয়োগ।

দেশে সরকারী-বেসরকারী খাত মিলিয়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণও এ বছরে ছিল স্থবির। '৮৭-৮৮ সালে মোট বিনিয়োগ ৪% শতাংশ হ্রাস পায়। '৮০-৮১ সালে জিডিপির ১৬% শতাংশ ছিলো মোট বিনিয়োগ। জিডিপি বিনিয়োগে এ অনুপাত ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলতি '৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৯% শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৮২-৮৯

www.pathagar.com

সময়কালে বছর প্রতি মূল্যস্ফীতি ছিলো সরকারী হিসেবেই প্রায় ১১ শতাংশ। যদিও এ সময় বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির হার নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

আর্থিক শৃঙ্খলার অভাব

সরকারী সম্পদের অপচয় রোধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলেও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়, অপব্যবহারের ব্যাপক ঘটনা ঘটে। '৮২ থেকে '৮৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ অডিট আপত্তি পড়ে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এসব অডিট আপত্তিতে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদের আত্মসাৎ ও অনিয়মের ঘটনা ধরা পড়েছে পাবলিক একাউন্ট কমিটির হাতে।

প্রধান দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক দেশের 'আর্থিক ও আর্থনীতিক শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনার জরুরী তাগিদ দেয়। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মন্দা কাটিয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ফিরে আসার জন্য অবশ্যই অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়ানোর পরামর্শ দেন। এজন্য তিনি প্রশাসনিক অপচয় রোধ, বিত্তবানদের উপর অধিক কর আরোপ, বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়ে আনা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে অধিক বিনিয়োগের উপর জোর দেন। কিন্তু এই সীমাহীন অপচয় ও ভোগ-প্রবণতাকে কমিয়ে অর্থনীতিকে শৃঙ্খলা ও উৎপাদনশীলতার পথে স্থাপন করার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি।

এরশাদ সরকারের আমলে গড়ে প্রতি বছর তিন বারেরও বেশি করে মন্ত্রিপরিষদে রদবদল, সংযোগ ও বিয়োজনের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৮২-র জুন মাসে তদানীন্তন সামরিক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ মন্ত্রিপরিষদে রূপান্তরিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা শুরুতে ১১ থেকে '৮৪-এর মার্চ পর্যন্ত ১৭-এ উন্নীত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৭শে নভেম্বর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'জনদল'-এর আত্মপ্রকাশের পর '৮৪-তে কয়েক দফায় মন্ত্রিপরিষদে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৭ থেকে ২৬-এ উন্নীত হয়। ১৯৮৫তে গণভোট ও উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রিপরিষদের আয়তন বেড়ে গিয়ো ৩৫ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৮৬-তে এক পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা ১ জন প্রধানমন্ত্রী, ৩ জন উপ-প্রধান মন্ত্রী,২৬ জন মন্ত্রী ৬ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৩ জন উপমন্ত্রী নিয়ে ৩৯-এ দাঁড়ায়। ১৯৭৩ সালে ১৪ জুন প্রতিমন্ত্রীসহ ৩৮ জন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী এবং ১৫ জন প্রতিমন্ত্রীসহ মন্ত্রীর সংখ্যা ৩৭। সে হিসেবে এরশাদ সরকারের মন্ত্রীদের সংখ্যা অতীত অতিক্রমকারী। বি এন পি আমলে মন্ত্রীর সংখ্যা ৪৮ পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল। এছাড়া উপমন্ত্রীর মর্যাদায় ২০ জন জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী ছিলেন। এরশাদ সরকারের

www.pathagar.com

আমলে ৬৪ টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। একটি সূত্রের হিসেব অনুযায়ী এরশাদের শাসনামলে সাত বছর চার মাসে ৩০ বারের মত মন্ত্রিপরিষদ বাতিল, গঠন, দপ্তর রদবদল, অন্তর্ভুক্তি, পদত্যাগ ও পদোন্নতির ঘটনা ঘটেছে।" (মেজর রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১)

সামষ্টিক অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদতা

১৯৯০ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল মুনয়েম বলেন, সাহায্য নিতে তাদের (সাহায্য দাতাগোষ্ঠীর) প্রেসক্রিপশন আমাদের মেনে নিতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতকরা ১০০ ভাগ অর্থ আসে এখন বিদেশী সাহায্য থেকে। সাহায্যদাতারা চায় এডিপিতে বাংলাদেশ নিজে আরও অর্থ দিক। তিনি অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "গত দেড় মাস যাবৎ যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ৬ মাস আগেও যদি তা শুরু করা হত তাহলে অবস্থা এতটা শোচনীয় হত না।"

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোশারফ বলেন, "দেশের বর্তমান আর্থিক সংকট ও দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতিসহ নাজুক পরিস্থিতির জন্য সম্পদের স্বল্পতায় নয় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও অব্যবস্থাই দায়ী।" তিনি আরও বলেন, "সরকার যদি রাষ্ট্রীয় অর্থকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে বিবেচনা না করে জাতীয় উন্নয়নে তা ব্যয় করতেন তা হলে আই. এম. এফ এর সাথে ইসাফ চুক্তি সই করার প্রয়োজন হতো না। ১৯৮০-৮১ সালে আমরা মাত্র ৩০০ কোটি টাকা আয় করেই বাজেট নির্ধারন করতে সক্ষম ছিলাম; তা নজির বিহীনভাবে বেড়ে ৬৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে নয়, বরং গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বেড়েছে। সরকার যদি অনুৎপাদন খাতে ব্যয় অর্থনীতিক বাস্তবতার নিরিখে স্থির করতেন তাহলে কোনমতেই আমাদের রাজস্ব ব্যয় ৩৫০০ কোটি টাকার বেশি হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।"

এরশাদের শাসনামলের শেষ দিকে দেশের চারজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আখলাকুর রহমান, মোশারফ হোসেন, রেহমান সোবহান ও মুজাফফর আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব কম করে চিত্রিত করে বা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণ কখনও সম্ভব নয়। তারা গত কয়েক বছরের ভুল ভ্রান্তিকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার এবং সকল নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডকে ঢেলে সাজাবার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও 'ওভার' ও 'আন্ডার ইন ভয়েসে' সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে আমাদের রাজস্বখাতে উদ্বৃত্ত ঘাটতিতে রূপান্তরিত হয়েছে ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়ামের বৈঠকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অভিযোগ ছিল বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও দুর্নীতির কারণে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, জৌলুসী অনুৎপাদক খাতে যথেচ্ছ ব্যয় বেড়ে গেছে, শিশু ও মহিলা বিষয়ক উন্নয়নে উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে, পণ্য ও খাদ্য সাহায্যের প্রতিরূপ তহবিল খেয়াল খুশিমত ব্যয় করা হয়েছে ইত্যাদি। সরকার পক্ষ এসব অভিযোগ খন্ডন করতে পারেনি বলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সরকার সে বছর প্রায় ২০% কম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পায়। এ সম্পর্কে উল্লেখিত চারজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলেন, "এবারকার কনসোর্টিয়াম বৈঠকে আমাদের অর্থনীতির নাড়ী-ভুঁড়ি যেভাবে টেনে বের করা হয়েছে এবং দাতাদের পছন্দমত পুনঃসংস্থাপনের কথা বলা হয়েছে তাতে আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে। যাই হোক আমাদের অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া যে দূষিত ও কলুষিত হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে বিদেশীরা এবার মোটামুটি স্পষ্টভাষী হয়েছেন বলা চলে।"

সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহ্ উদ্দীন মাহ্তাব বলেন, 'গত ৮ বছরের বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ার বদলে আমাদের পরনির্ভরশীলতা বেড়েছে দ্রুতগতিতে। আমরা বিদেশী সাহায্যের দাসত্বের জালে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছি। বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ-এর নজিরবিহীন খবরদারি মেনে নিচ্ছি জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে। আমাদের জাতীয় বাজেট, আমদানী-রপ্তানি নীতি, কর নীতিসহ সামগ্রিক নীতিমালা প্রণয়নের স্বাধীনতা সরকার হারিয়ে ফেলেছে। দাতাদের পরামর্শের বাইরে স্বাধীনভাবে এসব নীতিমালা প্রণয়ন করা এখন সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তবুও দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রতিশ্রুতির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।' সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এরশাদ আমলের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

'৮০-৮১ সালে জাতীয় বাজেটের ৩০% শতাংশ ব্যয় ছিল রাজস্ব ব্যয়, তা নজিরবিহীন বেড়ে '৮৮-৮৯ সালে ৫০% শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের জন্য জাতীয় বাজেটের ৫৫% শতাংশ বরাদ্দ ছিল, '৮০-৮১ সালে তা হ্রাস পেয়ে এখন ৩৯% শতাংশে ঠেকেছে অর্থাৎ '৮০-৮১ সালে রাজস্ব ব্যয়ের চাইতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় ছিল ৮৩% শতাংশ বেশি । এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টে গেছে। সরকার এখন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির চাইতে রাজস্ব ব্যয় বেশি করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, '৮০-৮১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দ ছিল জিডিপি'র ১০.২% শতাংশ, তা ক্রমগত হ্রাস পেয়ে এ মাত্র ৫.৮% শতাংশে ঠেকেছে। অপরদিকে রাজস্ব ব্যয় ৫.৬% শতাংশ থেকে একই সময়ে বেড়ে ৮.৮% শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এজন্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকে দায়ী করে বলেন, "৮২-৮৩ সালে একজন সচিবের মাইনে ছিল ৪১৪৩ টাকা তা প্রকৃতমূল্যে ৪১% শতাংশ বেড়ে '৮৯-৯০ সালে ১১১০২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সহকারী সচিবের বেতন একই সময়ে প্রকৃত মূল্যে বেড়েছে ৯৯% শতাংশ। সরকার সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খুশি করার জন্য এভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রাধিকারকে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি বর্তমান সংকট উত্তরনের স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ফ্রীজ (বর্তমান পর্যায়ে) রাখার পরামর্শ দিয়ে বলেন, প্রয়োজনে বেতনের একটা অংশ সঞ্চয়পত্রের আকারে দেয়া যেতে পারে। এতে জাতীয় সঞ্চয় বাড়বে।

ডঃ মাহতাব বলেন, "দেশে গত আট বছরে বিনিয়োগ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। '৮০-৮১ সালে জিডিপি'র ১৫.৯% শতাংশ ছিল মোট বিনিয়োগ। তা হ্রাস পেয়ে এখন মাত্র ১১% শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ ৭.২% শতাংশ থেকে কমে ৬% শতাংশে ঠেকেছে আর সরকারী বিনিয়োগ ৮.৭% শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫% শতাংশে দাঁড়িয়েছে।"

তিনি বলেন, "উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, বিনিয়োগ কমেছে, দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে অথচ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা গেছে বেড়ে। এর ফলে বিদেশী সাহায্যের দায়দেনা পরিশোধের হারও নজীরবিহীনভাবে বেড়েছে। '৮০-৮১ সালে রপ্তানি আয়ের ১২% শতাংশ ছিল বিদেশী সাহায্যের দায়দেনা পরিশোধ ব্যয়। '৮৮-৮৯ সালে তা বেড়ে ৩১% শতাংশে ঠেকেছে। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির অনুষঙ্গ হিসেবে দাতাদের পরামর্শ সঠিক তবু জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য আমাদের জাতির আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে।" (মেজর রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১)

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, অনুন্নত দেশসমূহে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা, ঢাকাঃ প্রেক্ষিত,১-২ ফাল্গুন, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

২. হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশ বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপরেখা, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

৩. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।

৪. -------, বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

৫. -------, প্রতিরোধের প্রথম প্রহর, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

৬. মোঃ আতাউর রহমান, বাংলাদেশ ইন ১৯৮৩ঃ এ টার্নিং পয়েন্ট ফর দি মিলিটারী, এশিয়ান সার্ভে, ভল্যুম-২৪, নং ২ (ফেব্রুয়ারী,১৯৮৪)।

৭. পিটার জে. বারটোসি, বাংলাদেশ ইন ১৯৮৫ঃ রেজোলিউট এগেইনস্ট দি স্টর্মস, এশিয়ান সার্ভে, ভল্যুম-২৬, নং ২ (ফেব্রুয়ারী,১৯৮৬)।

৮. ক্যাপ্টেন শহিদুল ইসলাম, সৈনিকের রাজনীতি, লন্ডনঃ ইস্ট ওয়েস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯।

৯. মঈদুল হাসান, মূলধারা,৭১, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬।

১০. পরিকল্পনা কমিশন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮০-৮৫, ঢাকা ঃ ১৯৮০।

১১. পরিকল্পনা কমিশন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৬-৯০, ঢাকা ঃ ১৯৮৭।

১১. পরিকল্পনা কমিশন, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯১-৯৫, ঢাকা ঃ ১৯৯১।

১২. পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৬-২০০১, ঢাকা ঃ ১৯৯৭।

১৩. সৈয়দ আবদাল আহমদ ও সৈয়দ মেসবাহ উদ্দিন, নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া, ইনকিলাব প্রকাশনা গ্রুপ, ঢাকা, ১৯৯১।

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

বেগম খালেদা জিয়া

"এই দেশ, এই মাটি, এই মানুষ আমার খুব প্রিয়। যেদিন দেখব এই দেশের উন্নতি হয়েছে, মানুষজন সুখী হয়েছে-সে দিনই ওদের স্বপ্নের অংশীদার হতে পারব আমি।'

– বেগম খালেদা জিয়া

জন্ম	ঃ	১৫ আগস্ট, ১৯৪৫ সাল।
জন্মস্থান	ঃ	জলপাইগুড়ি, আসাম।
পিতা	ঃ	ইস্কান্দার মজুমদার।
মাতা	ঃ	তৈয়বা মজুমদার।
স্থায়ী নিবাস	ঃ	দিনাজপুর শহরের মুদিপাড়া। আদি পিতৃভিটা-ফেনীর শ্রীপুর থানার ফুলগাজী গ্রামের বিখ্যা ত মজুমদার বাড়ি।
শিক্ষা ও কর্মজীবন	ঃ	১৯৬০ সালে দিনাজপুর গার্লস স্কুল থেকে মেট্রিক পাস।

- ❑ দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আইএ-তে ভর্তি এবং ১৯৬৩ সালে আইএ পাশ।
- ❑ কলেজে থাকা অবস্থায় ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ে।
- ❑ ১৯৬৫ সালে স্বামীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে গমন। ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত করাচীতে বসবাস। পরবর্তীতে প্রথমে জয়দেবপুর ও পরে চট্টগ্রামে স্বামীর পোস্টিং হলে তাঁর সাথে সেখানে গমন এবং চট্টগ্রামের ষোলশহর এলাকায় বসবাস।
- ❑ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ জিয়াউর রহমান বাঙ্গালী সেনাবাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ছোট্ট দু'ছেলেকে নিয়ে ১৬ মে নৌপথে ঢাকায় আসেন। বড়বোন খুরশীদ জাহানের বাসায় ২৭ জুন পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। ২ জুলাই সিদ্ধেশ্বরীতে এস আব্দুল্লাহর বাসা থেকে পাক সেনারা দু'ছেলেসহ বন্দী করে। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি মুক্তি পান।
- ❑ জিয়াউর রহমানের সংসারে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ গৃহবধূ। দু'পুত্রকে লালন পালন ও ঘরের কাজ করেই সময় কাটাতেন। এমনকি ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর তাঁর স্বামী জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে রাজনীতি বা কোন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জড়িত করেননি।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবন ঃ ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। এরপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের আহ্বানে তিনি ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারী বিএনপি'র প্রাথমিক সদস্য হওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে যোগদান করেন।

- ১৯৮৩ সালের মার্চে বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত।
- ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল তিনি দলের বর্ধিত সভায় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে প্রথম বক্তৃতা করেন। বিচারপতি সাত্তার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৮৪ সালের ১০ মে পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
- বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে সাত দলীয় ঐক্যজোট গঠিত এবং এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু।
- '৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দেশব্যাপী স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি জনসংযোগে বের হন এবং শত শত জনসভায় বক্তৃতা করতে থাকেন। নিরলস ও নির্ভীকভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন।
- দীর্ঘ ৮ বছর একটানা নিরলস ও আপোষহীন সংগ্রামের পর ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হয়।
- বেগম জিয়ার বিএনপি ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তিনি একাই পাঁচটি আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।
- ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
- ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারের দাবীতে আন্দোলন শুরু।
- ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।
- ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস।
- ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ বেগম জিয়ার পদত্যাগ ও কেয়ারটেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর।
- ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বিশেষ অবদান ঃ ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দান, ১৯৯৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন, যমনা সেতুর নির্মাণ কাজে অগ্রগতি, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন, ছাত্রী উপবৃত্তি প্রবর্তন, এডিপি-তে নিজস্ব সম্পদ যোগানের শতকরা ৪৭ ভাগে উন্নীতকরণ, সংবিধান সংশোধন করে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

উপাধি ঃ দেশনেত্রী।

www.pathagar.com

১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারী বি,এন.পি'র প্রাথমিক সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। একই সালের মার্চ মাসে তিনি দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং দল গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল তিনি দলের বর্ধিত সভায় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে প্রথম বক্তৃতা করেন। ১৯৮৪ সালের ১০ মে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৮২ সালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারী করে দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের সংবিধান স্থগিত, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে জনগণ বিস্মিত হলেও বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা দখলের ৬ মাসের মাথায় ছাত্ররা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৮২ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজ আন্দোলন শুরু করে। ঐ দিন ১৪টি ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মৌন মিছিল করে। ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সামরিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান নতুন শিক্ষা নীতি ঘোষণা করেন। এ শিক্ষানীতি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে ।

১৯৮৩ সালের ২২'ফেব্রুয়ারী রমনার বটমূলে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাস-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বেগম খালেদা জিয়া ভাষণ দানের মাধ্যমে সরাসরি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। ঐ জনসভায় তিনি বিএনপি'র অঙ্গসংগঠনের কর্মীদের জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আপনাদের আন্দোলনের কাফেলায় আমিও শরীক হতে চাই। স্বৈরাচারের তখত তাউসকে খান খান করে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন। আন্দোলনের মাধ্যমেই এ সরকারকে উৎখাত করতে হবে।" বেগম জিয়া এভাবে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেয়ায় সামরিক সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে। জেনারেল এরশাদ স্পষ্টতঃই বুঝতে পারেন যে, বেগম জিয়া রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে নামছেন এবং বিএনপি'র নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন। এর কিছুদিন পরেই বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সামরিক সরকার ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়। ঐ দিনই বিএনপির মহানগর কার্যালয়ে দলের বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় বেগম জিয়া মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

"বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে শহীদ জিয়ার আদর্শ। এজন্য ১৯ দফা সনদ তিনি দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন উৎপাদনের রাজনীতি। আমি সেই জননেতার পত্নী বেগম খালেদা জিয়া। শহীদ জিয়ার আদর্শ ও পথ নির্দেশনার সফল বাস্তবায়নই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমি এদেশের সকল দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ইনশাআল্লাহ, জয় আমাদের হবেই।" (রুহুল আমিন, ১৯৯৩)

বেগম জিয়ার এ বক্তব্যে বিএনপির নেতা-কর্মীরা উদ্দীপ্ত হয় এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। বর্ধিত সভার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে একটু দূরে সরে যান। তিনি বিএনপির চেয়ারম্যান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়াই দলের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এরপর তিনি ঘরোয়া রাজনীতির অংশ হিসেবে বিএনপি আয়োজিত বিভিন্ন ঘরোয়া রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর পরই সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির সমন্বয়ে একটি জোট গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে বিএনপি ও অন্য ছয়টি দলকে নিয়ে সাত দলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হয়। সাতদলীয় জোটভুক্ত দলগুলো হলঃ (১) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), (২) ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), (৩) জাতীয় লীগ, (৪) জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই), (৫) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নুরুর রহমান), (৬) বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও (৭) ডেমোক্রেটিক লীগ (রউফ)। সাত দলীয় জোট গঠনের পর তিনি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করার লক্ষ্যে পনের দলীয় ঐক্যজোটের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর '৮৩ সাত দলীয় ঐক্যজোট ও পনের দলীয় জোটের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সামরিক সরকারকে উৎখাত করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের লক্ষ্যে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবীনামা প্রণীত হয় এবং ৬ সেপ্টেম্বর '৮৩ পাঁচ দফা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয়। পাঁচ দফা দাবি ছিল নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২. অবিলম্বে দেশে জনগণের সকল মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে সকল বিধি-নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩. নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই কেবলমাত্র সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারো নয়।

৪. রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৫. ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংগঠিত ছাত্র হত্যাসহ সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবতকাল ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ সকলের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। *—(রুহুল আমিন-১৯৯৩)*

১৯৮৩ সালের ১৪ অক্টোবর জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ঐদিন থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি করা যাবে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৪ সালে ২৪মে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে তার আগে ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি-র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট এরশাদের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করে ১ নভেম্বর '৮৩ অর্ধদিবস হরতাল পালন করে । ঐ দিন বিএনপি মহানগরী কার্যালয়ের সামনে সাত দলীয় জোটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া ও সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার বক্তব্য রাখেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তার উক্ত সভায় নিজেকে 'বৈধ রাষ্ট্রপতি' হিসেবে দাবী করেন এবং মীর্জা গোলাম হাফিজ নিজেকে জাতীয় সংসদের 'স্পীকার' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ঐ দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত জেনারেল এরশাদ বেগম খালেদা জিয়াকে ফোন করেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন রাজনীতিতে আর না জড়াবার জন্য । রাজনীতি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বেগম জিয়ার ক্ষতি হতে পারে মর্মে তিনি

www.pathagar.com

প্রচ্ছন্ন হুমকিও প্রদান করেন। বেগম জিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জেনারেল এরশাদকে তাঁর ব্যাপারে অযথা মাথা না ঘামানোর জন্য পরামর্শ দেন।

এদিকে ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে 'জনদল' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত এদলটি জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়। ২৮ নভেম্বর ৭ ও ১৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করে । সরকার সচিবালয়ের চারদিকে ১৪৪ ধারা জারী করে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার মানুষ সচিবালয় ঘেরাও করে ফেলে। এক পর্যায় পুলিশ ও ছাত্র-জনতার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটলে সরকার বিডিআর ও সেনাবাহিনী তলব করে। সেনাবাহিনীর গাড়ীগুলো উপস্থিত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি করে। গুলিতে চারজন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এতে করে ছাত্র-জনতা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা সচিবালয়ের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। ঐ দিন বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র-জনতার সাথে থেকে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ করে এবং এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি ছাত্র-জনতার সাথে রাজপথে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জনতাকে উৎসাহ দেন। রাজপথে আইল্যান্ডের উপরে দাঁড়িয়ে তিনি বিনা মাইকে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনীর কর্তব্যরত অফিসারের সাথে তাঁর বাক-বিতন্ডা হয়। সেনাবাহিনীর উক্ত অফিসার বেগম জিয়ার ভয়ে হোক বা সম্মান দেখানোর জন্য হোক সৈন্যদের ছাত্র-জনতার উপর নির্যাতন বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং সৈন্যদের নিয়ে সচিবালয় এলাকা ত্যাগ করে। বেগম জিয়া আহত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের গাড়িতে করে সেনানিবাসস্থ বাসায় গেলে সামরিক জান্তা তাঁকে বাসায় ঢুকতে দেয়নি। এ অবস্থায় তিনি চিকিৎসার জন্য সিএমএইচ-এ যান। কিন্তু সেখানে তাঁকে চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে সেনানিবাস এলাকায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেন। অবশ্য রাতে তাঁকে বাসায় যাবার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ঐ রাতেই বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে স্ব স্ব বাসায় অন্তরীণ করা হয়।

১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ এক সামরিক আদেশবলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে অপসারণ করে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর কয়েকদিন পর সেনাবাহিনীর বেশ ক'জন উচ্চপদস্থ অফিসার বেশ কয়েকবার বেগম খালেদা জিয়ার বাসায় যান। তাঁরা বেগম খালেদা জিয়াকে আর রাজনীতিতে না জড়াবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানান এবং এর বিনিময়ে তিনি যা চাইবেন তাই দেবার জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান। এছাড়া জেনারেল এরশাদ

www.pathagar.com

পর পর দু'বার বেগম জিয়ার সাথে সাক্ষাত করে একটা সমঝোতায় আসার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বেগম জিয়া তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং পাঁচ দফা দাবীর ব্যাপারে তিনি অনমনীয় বলে জানিয়ে দেন।

১৯৮৪ সালের ৬ জানুয়ারী জেনারেল এরশাদ রেডিও, টিভিতে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে পরের দিন থেকে ঘরোয়া রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এবং তার সাথে রাজনৈতিক সংলাপে যোগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে বঙ্গভবনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ১২ জানুয়ারী '৮৪ বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ঐ দিনই তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে রাজনৈতিক সংলাপে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শর্তারোপ করে বলেন, "প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালু না করা হলে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি সংলাপে যাচ্ছেন না।" ২১ জানুয়ারী জেনারেল এরশাদ বিদেশ থেকে ফিরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'পূর্বশর্ত মেনে সংলাপের পক্ষে তিনি নন।' ফলে আন্দোলনরত প্রধান বিরোধী ৭ দলীয় ও ১৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী সংলাপে যোগ না দেয়ায় সংলাপ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

এদিকে নির্বাচন কমিশন ২৪ মার্চ '৮৪ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। বেগম জিয়া উপজেলা নির্বাচনের বিরোধিতা করে বলেন, জনগণ যে কোন মূল্যে উপজেলা নির্বাচন প্রতিরোধ করবে। তিনি সরকারকে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ করার আহ্বান জানান। এর জবাবে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন, উপজেলা নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে। অন্যান্য বিরোধীদলও উপজেলা নির্বাচনের বিরোধিতা করে। উপজেলা নির্বাচন বন্ধের দাবীতে হরতাল, বিক্ষোভ ও অন্যান্য কর্মসূচী পালিত হয়। ফলে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যেতে থাকে। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে সরকার রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে এবং রাজনৈতিক সংলাপের আহ্বান জানায়। এ প্রেক্ষিতে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল ও জোটগুলো সংলাপে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চারদফা পূর্বশর্ত আরোপ করে। শর্তগুলো ছিলো (১) অবাধ রাজনীতি; (২) সামরিক আইন প্রত্যাহার; (৩) রাজবন্দীদের মুক্তি; ও (৪) আলোচনার ভিত্তি হলো ৫ দফা। সরকার '৮৪ সালের ২৬ মার্চ প্রকাশ্য রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং সামরিক আইন অবসানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ ছাড়া ৫ দফার ভিত্তিতে সংলাপে বসতেও রাজী হয়। সরকার সংলাপে বসার জন্য সকল বিরোধী দলীয় জোট ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠায়। বিএনপিসহ সকল বিরোধী জোট ও দল পৃথক পৃথকভাবে জেনারেল এরশাদের সাথে সংলাপে বসে। সংলাপ শেষে বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেন যে, এরশাদ সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দিতে রাজী হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালের ১০ মে বেগম খালেদা জিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১২ জুলাই রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ৮ ডিসেম্বর '৮৪ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর প্রেক্ষিতে সাতদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনে যাওয়া সম্ভব নয়।" এর জবাবে এরশাদ বলেন, বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে এলে পর্যায়ক্রমে সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। এদিকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করে এবং ৮ ডিসেম্বর '৮৪ সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দেয়। এর আগে বেগম খালেদা জিয়া ১৪ অক্টোবর বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক মহাসমাবেশে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বলেন, "আর এক মুহূর্তের জন্যও এরশাদকে ক্ষমতায় রাখা যাবে না। ক্ষমতায় থাকার তাঁর আর কোন অধিকার নাই।" তিনি আরো বলেন, "ব্যক্তি বিশেষের অভিলাষের জন্য সেনাবাহিনীর সুনাম আর বিনষ্ট হতে দেবো না। জনগণ তাদের গণতন্ত্র আনবে।" ঐ জনসভায় ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নিকট থেকে জেনারেল এরশাদ কিভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন তার বর্ণনা দেন।

১৫ ডিসেম্বর রেডিও, টিভিতে প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল এরশাদ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে ৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর এ ঘোষণা বিএনপিসহ সকল বিরোধী দল প্রত্যাখ্যান করে। বিএনপি ৫ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে যাবার জন্য সাতদফা দাবী নামা পেশ করে। দাবীগুলো ছিলোঃ

(১) রাষ্ট্রপ্রধান ও সিএমএলএ কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে পরোক্ষভাবে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশ, শুভেচ্ছা জানাতে পারবেন না। (২) ইউনিয়ন থেকে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রশাসনের নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (৩) নির্বাচিত সংসদ বসার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সকল কর্মকান্ড দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের আওতায় চালু রাখতে হবে এবং সংসদ বসার পর সংসদের অনুমতি ছাড়া নতুন কোন আইন বা অর্ডিন্যান্স জারি করা যাবে না। (৪) সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার পুরোপুরি পুনর্বহাল ও সুপ্রীম কোর্টে রীট এখতিয়ার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। (৫) সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের দন্ডাদেশ বাতিল ও খারিজ করতে হবে। (৬) উপজেলা চেয়ারম্যান নিযুক্ত বন্ধ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে নিযুক্তদের বাতিল ঘোষণা করতে হবে। (৭) শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তি অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে।

www.pathagar.com

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরদার হয়ে উঠলে জেনারেল এরশাদ ২ ডিসেম্বর '৮৪ সামরিক আইনবলে হরতালসহ সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সারাদেশে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ব্যাপক হারে ধরপাকড় শুরু হয়।

১৫ জানুয়ারী '৮৫ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কোনরকম আলোচনা ছাড়াই ৬ এপ্রিল '৮৫ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। ১১ ফেব্রুয়ারী '৮৫ বিএনপি'র বর্ধিত সভায় বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, এখনও অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এ অবস্থায় বিএনপি কিছুতেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। একই দিনে শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ১৫ দলীয় জোট সিদ্ধান্ত নেয় যে, নির্বাচনের নামে কোন প্রহসনমূলক নির্বাচনে ১৫ দলীয় জোট অংশগ্রহণ করতে পারে না। বিরোধী দলের এরূপ অনমনীয় মনোভাব বুঝতে পেরে জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। জেনারেল এরশাদের মতে জাতীয় নির্বাচন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন কিনা এ বিষয়ে জনগণের অভিমত গ্রহণ করা হবে। এরশাদের ঘোষণায় রাজনৈতিক আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসীদের হাতে এক ছাত্রনেতা নিহত হয়। এমতাবস্থায় জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, সংসদ নির্বাচন না হওয়ার প্রেক্ষিতে ২১ মার্চ ১৯৮৫ জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন থেকেই সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কার্ফ্যু জারি করা হয়। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে পুনরায় গৃহবন্দী করা হয়।

২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন ফলাফলে জানায় যে, রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৯৪.১৪% আস্থা ভোট পেয়েছেন। শতকরা ৭২% ভোটার গণভোটে অংশ নেয়। বিরোধী জোট ও দলগুলো গণভোটকে 'প্রহসন' হিসেবে আখ্যায়িত করে। বিদেশী সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ সংস্থাগুলো জানায় যে, উক্ত গণভোটে শতকরা ৪% ভাগ লোক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। দ্যা টাইমস্ পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেনঃ 'কি করে মিথ্যাচার সহ্য করে বাঁচতে হয় সে সম্পর্কে গতকাল (২২ মার্চ) বাংলাদেশ শিক্ষালাভ করে। দেশের স্বৈরশাসককে গণভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্র বলে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী প্রতারণা মাত্র।'

১ সেপ্টেম্বর '৮৫ বিএনপি'র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বেগম খালদা জিয়া অবাধ রাজনীতির সুযোগ দাবী করেন। অন্যথায় বিএনপি আইন অমান্য করে

www.pathagar.com

রাজপথে নামবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। ৭ নভেম্বর '৮৫ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিকালে শহীদ জিয়ার মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বেগম জিয়া ঘোষণা করেন, "স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দিক না দিক, জনগণ তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আর বসে থাকবে না। আমরা আজ থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করলাম।" জনসভা শেষে আনুমানিক ৩০ হাজার লোকের এক মিছিলে বেগম জিয়া ফার্মগেট হতে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত নিজে নেতৃত্ব দিয়ে কর্মী এবং জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধি করেন।

১২ জানুয়ারী '৮৬ বেগম খালেদা জিয়া এক বিবৃতিতে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। ১ মার্চ '৮৬ বেতার ও টিভি ভাষণে এরশাদ জাতির উদ্দেশে সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নিলে প্রার্থী মন্ত্রীদের পদত্যাগসহ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দল ও ১৫ দলীয় জোট তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলে যে, এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনই নিরপেক্ষ হতে পারে না। ১৭ মার্চ উভয় জোটের এক যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে কেউ এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলে জাতির কাছে সে 'বিশ্বাসঘাতকে' পরিগণিত হবে"। এ ঘোষণা সর্বমহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২২ মার্চ মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচী পালিত হবে। ১৯ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ১৫ দলীয় জোটের এক জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, "যারা এই নির্বাচনে অংশ নেবে তারা 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে চিহ্নিত হবেন।" ২১ মার্চ গভীর রাতে সবাইকে হতবাক করে দিয়ে আন্দোলনের শরীক ১৫ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, "তার দল নির্বাচনে যাবে।" উক্ত ঘোষণার সাথে সাথে রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, নির্মল সেনসহ বেশ ক'জন নেতা ১৫ দলীয় জোট ত্যাগ করে ৫ দলীয় 'বামজোট' গঠন করেন। পক্ষান্তরে, বেগম খালদা জিয়া দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "রাজপথে চলমান আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে জনগণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না। নীল-নকশার এই নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করবে না।" তিনি আরো বলেন,"এই নির্বাচনে তিনি ও তাঁর দল অংশগ্রহণ করবে না। এ নির্বাচন সরকার ও আওয়ামী লীগের আঁতাতের নির্বাচন। রক্তে ভেজা জাতীয় দাবী ৫ দফাকে পাশ কাটিয়ে যারা এ নির্বাচনে যাচ্ছে তারা শহীদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। জনতা তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।'

www.pathagar.com

এরপর বেগম খালেদা জিয়া দৃঢ়তার সাথে এ নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণসংযোগ, সভা-সমাবেশ শুরু করেন। সরকার ভীত হয়ে ২৯ এপ্রিল নির্বাচন বিরোধী সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা সম্বলিত এক আদেশ জারী করে। কিন্তু বেগম জিয়া সরকারী নির্দেশকে অমান্য করে পূর্বের ন্যায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল চালিয়ে যান এবং এ দিনই বায়তুল মোকররমের জনসভায় অনমনীয় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে আমাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাবে না।" ৩ মে '৮৬ জামালপুরে এক জনসভা শেষে ঢাকা ফেরার পথে কালিয়াকৈরের কাছাকাছি এক স্থানে পৌঁছতেই পুলিশ বেগম জিয়ার গাড়িটিকে স্কট করে ফেলে এবং তাঁকে ও তাঁর সফর সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে ৯ মার্চ পর্যন্ত বন্দী করে রাখে। এদিকে ৭ মে জাতীয় সংসদের প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে জাতীয় পার্টিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১০ জুলাই '৮৬ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার এক জঙ্গী মিছিল সংসদ ভবন ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে বাংলা মোটর পৌঁছলে পুলিশ অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও বিএনপি নেতৃবৃন্দসহ মিছিলকারীদের বেধড়ক পেটাতে থাকে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এসময় পুলিশের দু'একটি লাঠি বেগম জিয়ার গায়েও পড়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতা এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তায় হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই পুলিশের সাথে খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পুলিশের সাথে এ খণ্ডযুদ্ধের প্রেক্ষিতে মহানগর পুলিশ বেগম জিয়া ও বিএনপি'র সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ ২শ' জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে।

১৫ অক্টোবর '৮৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। তিন জোট এ নির্বাচন বর্জন করে এবং সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। সারাদেশে সফল হরতাল পালিত হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ নির্বাচনে অংশ না নিলেও সরকারিভাবে ৬০% ভাগ ভোট পড়েছে এবং প্রদত্ত ভোটের ৮০% এরশাদ পেয়েছেন বলে ফলাও করে প্রচার করা হয়।

১৯৮৭ সালের শুরুতেই বেগম খালেদা জিয়া এরশাদের পদত্যাগের 'এক দফা'র দাবীতে দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ২৯ মার্চ ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠে বেগম জিয়ার ভাষারই প্রতিফলন ঘটে। তাঁরা দেশের সার্বিক অবস্থা 'হতাশাব্যঞ্জক' বলে বিবৃতি দিয়ে এ অবস্থা হতে মুক্তির উপায় হিসেবে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে'র অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবী করেন। ১২ জুলাই '৮৭ জাতীয় সংসদে জেলা পরিষদ বিল পাস হয়। এ বিলের প্রতিবাদে তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামী ২২ জুলাই থেকে ৫৪ ঘণ্টার

www.pathagar.com

লাগাতার হরতাল ঘোষণা করে। হরতাল চলাকালীন সময়ে ২২ জুলাই বেগম জিয়া গভীর রাতে বৃষ্টির মধ্যে তাঁর বাসায় পাহারারত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে পেছনের দেয়াল টপকে বাসা থেকে বের হয়ে বনানীতে এক আত্মীয়ের বাসায় রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে বনানী থেকে মিছিল সহকারে দীর্ঘ ১২ মাইল পথ হেঁটে বিকেলে প্রেসক্লাবে আসেন। বেগম জিয়া রাস্তায় হাজার হাজার লোকের মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ায় এবং সারাদিন রাজপথে থাকায় মূলত এদিন সমগ্র রাজধানী বিএনপি'র দখলে চলে যায়। ৫৪ ঘন্টা হরতাল চলাকালে ৭ ও ৮ দলীয় জোট আবার কাছাকাছি এসে পড়ে। দেশব্যাপী দাবী উঠতে থাকে দুই নেত্রীকে এক মঞ্চ থেকে আন্দোলন করার জন্য। ২৭ সেপ্টেম্বর তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। জনতার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ অক্টোবর দুই নেত্রী এক অন্তরঙ্গ বৈঠকে বসেন এবং একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ১ ও ১০ নভেম্বর হরতালসহ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। আন্দোলন আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। ফলে সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ ও মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৯ নভেম্বর সারাদিনই ১৪৪ ধারা অমান্য করে নগরীর অলিতে গলিতে মিছিল-সমাবেশ হয়। এদিন বিকালে গুলিস্তান চত্বরে বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন মিছিলে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায় যাতে বেগম জিয়াসহ ১১ জন আহত হন।

১০ নভেম্বর '৮৭ সকাল ১১টার দিকে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি শাপলা চত্বরে উপস্থিত হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার জনতার আন্দোলনে ভীত হয়ে রাজপথ, রেলপথ, পানিপথ বন্ধ করে দিয়ে কার্যত ঢাকা মহানগরীকে একটি বন্দী শিবিরে পরিণত করেছে। ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পাঁচজনের অধিক সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীকে পাইকারি হারে গ্রেফতার করেছে। শত নিপীড়ন ও অত্যাচারের পরও জেল, জুলুম, হুলিয়া এমন কি জীবনের মায়া ত্যাগ করেও শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজকের এ সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে, জনগণ আর এক মুহূর্তের জন্যও স্বৈরশাসক এরশাদকে চায় না। জনতার দাবীর প্রতি যদি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকে তবে তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় জনগণ টেনে-হেঁচড়ে তাকে ক্ষমতা থেকে নামাবে।" সমাবেশ শেষে অনুষ্ঠিত বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন মিছিলটি আল্লাহওয়ালা ভবনের সামনে আসলে উক্ত ভবন থেকে মিছিলে বোমা ও গুলিবর্ষণ করা হয়। মিছিলটি দৈনিক বাংলা অফিসের মোড়ে আসলে পুলিশ ও বিডিআর অতর্কিতে মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে

www.pathagar.com

ঘটনাস্থলেই ২জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। এদিনই বিডিআরের গুলিতে নিহত হয় নূর হোসেন নামের একটি ছেলে—যার বুকে পিঠে লেখা ছিল "গণতন্ত্র মুক্তি পাক-স্বৈরাচার নিপাত যাক"। বেগম জিয়া পরদিন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য হোটেল পূর্বাণীতে অবস্থান করেন। ১১ নভেম্বর সকাল ১০টায় পুলিশ হোটেল পূর্বাণী থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে জীপে তোলে। গ্রেফতারকালে বেগম জিয়া জীপের পা-দানীতে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'স্বৈরাচারী এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, সকল প্রকার কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। তিনি দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সেদিন হোটেল পূর্বাণীতে বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু একটি গোয়েন্দা সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বেগম জিয়ার বিশ্বস্ত দু'জন সাংবাদিককে একথা জানালে তাদের দ্রুত পদক্ষেপে বেগম জিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় সংসদ বাতিল করে ২৮ ফেব্রুয়ারী '৮৮ নতুন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে।

১৯৮৭ সালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বেগম খালেদা জিয়াকে ঘিরেই। নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আপোসহীন ভূমিকা রেখে তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন । বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর আপোসহীন ভূমিকার অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। এসময় তিনি সমগ্র বিশ্বে একজন অনমনীয় ও একজন দৃঢ়চেতা রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আন্দোলনকারীরা তাঁকে 'দেশনেত্রী' খেতাবে ভূষিত করে।

১২ জানুয়ারী '৮৮ বেগম খালেদা জিয়া দেশব্যাপী গণসংযোগ সফর শুরু করেন। গণসংযোগ কর্মসূচীর প্রথম দিনে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথে কমলাপুর রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন পথসভায় সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে তিনি বলেন, '২৮ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচন জনগণ মানবে না। এ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনী বিধিও নিরপেক্ষ হতে পারে না।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা নির্বাচন চাই, তবে জেনারেল এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচন দেশের জনগণ মেনে নেবে না।' তিনি সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপি ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং আগের মত জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসবে।

৫ জুন '৮৮ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে বিএনপির বর্ধিত সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতায় বেগম জিয়া বলেন, 'এদেশটা এদেশের ১০ কোটি মানুষের। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন ভাগ-বাটোয়ারার কোন ফসল নয়। অজস্র মা-বোনের বেদনা আর স্বজন হারানোর অশ্রুতে ভিজে আছে এদেশের মাটি। এদেশের ভৌগলিক অবস্থান আর

www.pathagar.com

পতাকার গায়ে রয়েছে লাখ শহীদের রক্তের দাগ। তাই যেনতেনভাবে ক্ষমতা প্রাপ্তিই মুখ্য বিষয় নয়-১০ কোটি মানুষ সবাই মিলে দেশটাকে রক্ষা করাই মুখ্য। তিনি দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তির প্রতি বৃহত্তম ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "জাতীয় অস্তিত্বের সংকটের মুহূর্তে আজ আর দোদুল্যমানতার কোন সুযোগ নেই। অবৈধ এরশাদ সরকার হটানোর জন্য 'এক দফা'র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

১ নভেম্বর' ৮৯ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ১শ ২৭ জন নেতা-কর্মী নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবীতে গুলিস্তান চত্বরে একটানা ১০ ঘন্টা প্রতীক অনশন পালন করেন। ২৮ নভেম্বর '৮৯ বিএনপি সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। এদিন পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষে বহু আহত হয়। পুলিশ ধর্মঘট পালনরত ছাত্র-জনতার ওপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালায় এবং বেধড়ক পেটায়।

১ জানুয়ারী '৯০ বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, 'স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনকে শাণিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমরা বরণ করছি ১৯৯০ সালকে। গণতন্ত্রহীন এমন এক পরিবেশে আমরা '৯০ সালে পদার্পণ করছি যখন দেশে আইনের শাসন নেই, নেই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। ক্ষুধার জ্বালায় কর্মহীন হাজার হাজার বেকার মানুষ তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি। বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সমাজ তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমাজের সর্বস্তরে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় ও নৈরাজ্যকর অবস্থা আজ জাতিকে গ্রাস করতে বসেছে। সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণআন্দোলনকে পুনর্বার বেগবান করে এই স্বৈরাচারী সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সুষম বন্টনভিত্তিক অর্থনীতি, শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে হবে-এটাই হোক আমাদের নববর্ষের শপথ। শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। জনতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।'

১০ অক্টোবর '৯০ তিনজোট ঘোষিত সচিবালয় অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ১১-৫৫ টায় বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের নেতা-কর্মী ও বিপুল সংখ্যক জনতা পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙ্গে সচিবালয়ের দিকে যাবার চেষ্টা করে। ৫/৭ গজ এগুবার পর পুলিশ বাধা দেয়। ফলে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা সেখানেই বসে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের তর্কাতর্কি শুরু হয়। দুপুর ১২-২০ মিঃ বেগম জিয়া যখন ভাষণ দিতে শুরু করেন তখনই পুলিশ অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং বেধড়ক পেটায়।

www.pathagar.com

৭ দলীয় জোটের মিছিলে এদিন পুলিশের গুলিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উল্লাপাড়া কলেজ শাখার নেতা জেহাদসহ ২ জন নিহত হয়। জেহাদের লাশকে স্পর্শ করে ছাত্ররা শপথ গ্রহণ করে যে, এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা আর ঘরে ফিরে যাবে না। আন্দোলন ক্রমেই জোরালো হয়ে ওঠে। বেগম খালেদা জিয়া ১২ অক্টোবর জেহাদের গ্রামের বাড়ি যান। সেখানে বিরাট প্রতিবাদ সভায় তিনি বলেন, "জেহাদের রক্ত দেশের ছাত্রসমাজকে এক করেছে, লাশ নিয়ে শপথ করা হয়েছে।. . . . .সরকার পতনের লক্ষ্যে আমি ও আমার দল বিএনপি সকলের সঙ্গে বসতে রাজি আছি। ঐক্য করতে প্রস্তুত আছি। আমি কথা দিচ্ছি সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থেকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে যাবো।" ১৪ অক্টোবর '৯০ আট দলীয় জোটের জনসভায় শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এদেশে 'জয়বাংলা' ছাড়া কোন শ্লোগান চলবে না। যারা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, তাদের 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ছাড়তে হবে।" পক্ষান্তরে বেগম জিয়া বলেন, "শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শহীদের রক্তের বিনিময়ে গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা ধরে রাখতে হবে। যারা এ ঐক্যের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করবে জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।"

১০ নভেম্বর '৯০ বিএনপি আয়োজিত গুলিস্তান চত্বরের জনসভায় বেগম জিয়া বলেন, 'এ সরকার কথায় কথায় সংবিধান ও গণতন্ত্রের কথা বলে। ১৯৮২ সালে কোন সংবিধান ও গণতন্ত্রবলে এ সরকার একজন নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতায় এসেছে? নির্বাচিত সংসদ বাতিল করেছে? কোন সংবিধানে লেখা আছে একজন চাকরীজীবী অস্ত্রের জোরে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা গ্রহণ করবে?-------- দৃশ্যত সরকার আর নেই। তার আদেশ-অধ্যাদেশ মানার আর প্রয়োজন নেই।' পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আন্দোলনে মিশে যান, মিছিলে বাধা দেবেন না।

২৩ ও ২৫ নভেম্বর '৯০ বেগম খালেদা জিয়া দেশ ও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে সাহসী পদক্ষেপ নেন। তিনি সংগঠন বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে নীরু, অভি, মাসুদ, জুয়েল, রানা সিকদার, খন্দকার আবু আসফাক, মাহবুব, মনির হোসেন, আলী নেওয়াজ প্রমুখকে বহিষ্কার করেন। উল্লেখ্য, এসব ছাত্রনেতারা অনেক আগেই গোপনে এরশাদ সরকারের সাথে হাত মেলায় এবং সংগঠনের ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতী তৎপরতা চালাতে থাকে এবং আন্দোলনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ২৭ নভেম্বর সকাল ১১টায় সরকারি সশস্ত্র এজেন্টদের গুলিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে বি.এম.এ নেতা ডাঃ মিলন নিহত হলে আন্দোলনের বারুদে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটে। সরকার বেসামাল হয়ে জরুরী অবস্থা জারী

www.pathagar.com

করে এবং দুই নেতা বিশেষ করে বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করার জন্য হন্যে হয়ে পড়ে। কিন্তু বেগম জিয়া সরকারী তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আত্মগোপন করেন এবং আত্মগোপনরত অবস্থা থেকেই সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ৩০ নভেম্বর '৯০ তিনি ভয়েস অব আমেরিকা (ভোয়া)'র ঢাকাস্থ প্রতিনিধি গিয়াস কামাল চৌধুরীর কাছে একটি রেকর্ডকৃত বাণী জনগণের উদ্দেশে পাঠান। ভোয়া এদিন রাতের অনুষ্ঠানে তা প্রচার করে। প্রদত্ত বাণীটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'মাইলস্টোন' হিসেবে কাজ করে। জনতার উদ্দেশে দেয়া বাণীতে তিনি বলেন ঃ "দীর্ঘ আট বছর ধরে আমরা অবৈধ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে আমাদের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। -- -----স্বৈরাচারী সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এই সংগ্রামে আমি আপনাদের পাশেই রয়েছি। আপনারা সর্বদা আমাকে আপনাদের সঙ্গেই পাবেন। -----জনতার বিজয় আসন্ন, স্বৈরাচারের পতন সুনিশ্চিত। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ও সংগ্রামী আহ্বান জানাচ্ছি।"

১ ডিসেম্বর '৯০ আত্মগোপন অবস্থা থেকে তিনি স্বহস্তে লেখা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান নামে একটি প্রচারপত্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জন্য দুপুর দু'টায় প্রেস ক্লাবে পাঠান। উক্ত আহবানে তিনি বলেন, "আপনারা জানেন স্বৈরাচারী খুনী এরশাদ সরকারের দুঃশাসনে দেশ আজ এক চরম সংকটজনক অবস্থায় নিপতিত। দীর্ঘ নয় বছরে দেশীয় সম্পদ লুট, গণতন্ত্র হত্যা, সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে এই স্বৈরশাসক গোটা দেশ ও জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই করে আসছি।----তাই আমি দেশ ও জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশপ্রেমিক সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি জোর আহ্বান জানাচ্ছি-আপনারা পদত্যাগ করে জনতার আন্দোলনে শামিল হোন এবং খুনী এরশাদের যে কোন কার্যকলাপের প্রতি পূর্ণ অসহযোগিতা করুন।--------গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় অনিবার্য। আপনাদের সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন। -খালেদা জিয়া।"

৩ ডিসেম্বর '৯০ রাষ্ট্রপতি এরশাদ নির্বাচনের ১৫ দিন আগে পদত্যাগসহ ১০টি প্রস্তাব সম্বলিত 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' ঘোষণা করলে বেগম খালেদা জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "১৫ দিন আগে নয়, এক্ষুণি পদত্যাগ করতে হবে"। ৪ ডিসেম্বর তিনি প্রথম জনসমক্ষে আসেন এবং গুলিস্তান চত্বরে বিশাল জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'মহান শহীদের আত্মত্যাগ ও জনতার

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া

বাদশা ফাহদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

www.pathagar.com

নির্বাচনে বিজয়ের পর ফুলের তোড়া নিয়ে উৎফুল্ল বেগম জিয়া

www.pathagar.com

আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। স্বৈরাচারী এরশাদ কাত হয়েছে, এখন শুধু জোরে একটা ধাক্কা দিতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'এরশাদের হাত জিয়াউর রহমানসহ বহু অগণিত ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত।' এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। বিশাল জনসমুদ্রে তিনি সেদিন যেন বারুদের মতো জ্বলে উঠেছিলেন। অবশেষে ঐদিন রাত ১০টায় এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং তিন জোটকে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন করার অনুরোধ করেন যার কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ মানুষ রাজপথে নেমে আনন্দ-উল্লাস করতে থাকে। বেগম জিয়া রাতেই রাজপথে নেমে জনতার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ৬ ডিসেম্বর এরশাদ তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

১৯৯১ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। বেগম খালেদা জিয়া একাই ৫টি আসনে জয়লাভ করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন।

বেগম জিয়ার আমলে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা

১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ বেগম খালেদা জিয়ার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় দিন। একদা যিনি ছিলেন একজন গৃহবধূ, ঐদিন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বের ষষ্ঠ মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ১১ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে তিনি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ২০ মার্চ, '৯১ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিরিষদ শপথ গ্রহণ করে। শপথ গ্রহণ শেষে বেগম জিয়া সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ হবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিনি দুর্নীতিমুক্ত সরকার কায়েমের কথাও ঘোষণা করেন।

প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

প্রধানমন্ত্রীত্বের ৩৯ দিনের মাথায় ২৯ এপ্রিল দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ জনপদ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। বিনষ্ট হয় হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ। এ ধরনের দুর্যোগের জন্য সরকারের ন্যূনতম

www.pathagar.com

প্রস্তুতি ছিল না। নবীন প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভাকে নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। তিনি বিপন্ন মানবতাকে সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের বহু দেশ ও সংস্থা বিপুল ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সাহায্যের জন্য একটি 'টাস্কফোর্স' প্রেরণ করেন।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম জিয়ার অনন্য কৃতিত্ব হচ্ছে দেশের শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বিরোধী দলগুলো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে আসছিল। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে ছিল নীরব। বিএনপি-ও দলীয় গঠনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির কথা রয়েছে। এপ্রসংগে বিরোধী দলে থাকাকালে বেগম জিয়া বলেছিলেন, সরকার পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারিত হবে নির্বাচিত সংসদে। ১৯৯১ সালের নির্বাচিত সংসদের অধিকাংশ দলই সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পক্ষে মত ব্যক্ত করে।

বেগম জিয়া তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের পর সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের জন্য সংসদে বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ২ এপ্রিল '৯১ সংসদ নেত্রী বেগম জিয়া সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পেশ করেন। এ ঐতিহাসিক বিলে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং আরেকটি পৃথক বিলে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের স্বপদে ফিরে যাওয়ার বিধান প্রস্তাব করা হয়। বিল দু'টো বাছাই কমিটি ও সংসদের পূর্ণাংগ আলোচনার পর ৬ আগস্ট '৯১ সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। দীর্ঘ সাড়ে ষোল বছরের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশকে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরিয়ে নেয়ার মুহূর্তটি ছিল বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের জন্য একটি মাইলফলক।

পররাষ্ট্র নীতি

সরকার গঠন করে বেগম জিয়া তাঁর সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তিনটি মূলনীতির কথা বলেনঃ (১)স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করা; (২) শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ'র সংগে সহযোগিতা বৃদ্ধি; এবং (৩) দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা।

www.pathagar.com

বেগম জিয়ার সরকার বৈদেশিক নীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির উপর বিশেষ জোর দেয়। এনীতির লক্ষ্য হচ্ছে—বাংলাদেশী পণ্যের বিদেশী বাজার নিশ্চিত করা, বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা, অর্থনৈতিক সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। সরকার যে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী চালু করে বিশ্বব্যাংক তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ঢাকায় বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান মিঃ ক্রিস্টোফার উইলোবি ১৯৯৩ সালে ঢাকায় বলেন, বাংলাদেশ অর্থনীতিতে ম্যাক্রো ও মাইক্রো উভয় পর্যায়েই অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বিএনপি সরকারের নেয়া অর্থনৈতিক সংস্কার ভালোভাবে চলছে ও অতীতের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁর মতে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলেও উন্নতির লক্ষণ সূচিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি বেগম জিয়া আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সমস্যা তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। জাতিসংঘের ৪৮তম সাধারণ অধিবেশনে ভাষণদানকালে বেগম জিয়া ফারাক্কা সমস্যাকে বাংলাদেশের জীবন-মরণ সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে গঙ্গা নদীর পানি সম্পদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাইপ্রাসে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনেও তিনি ফারাক্কা সমস্যাটি উত্থাপন করে পুরো ব্যাপারটিকে 'ক্ষুদ্র দেশের প্রতি অসামরিক হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করেন। সেদিন বেগম জিয়ার বক্তব্য রাণী এলিজাবেথ ও ইসি সদস্যদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। বেগম জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি ওয়াশিংটন ও বেজিং সফর করেন। তাঁর আমলে ঢাকায় সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সার্ক সম্মেলনে 'সাপটা' (South Asian Preferential Trade Arrangement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সত্ত্বেও বেগম জিয়ার আমলে 'তিনবিঘা করিডোর' বাংলাদেশ ফেরত পায়।

অবাধ তথ্য প্রবাহ

বিশেষ ক্ষমতা আইন '৭৫ এর আওতায় অতীতের সরকারগুলো সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতো। বেগম জিয়া ক্ষমতায় এসে বিশেষ ক্ষমতা আইনের উক্ত ধারা বিলুপ্ত করেন। ফলে সংবাদপত্রগুলো অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে এবং প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এসময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিবিসি এবং সিএনএন-এর অনুষ্ঠানমালা প্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

বেগম জিয়ার আমলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

বেগম খালেদা জিয়া ২৩ মার্চ, '৯১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকারের লক্ষ্য হবে গণমুখী প্রশাসন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ। তাঁর সরকার নতুন অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ, বাজার অর্থনীতিকে জোরদারকরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষন এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতি সাধন। লক্ষ্যার্জনের জন্য বর্ধিত ও ফলপ্রসূ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। দেশী-বিদেশী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

কৃষি খাত

বেগম জিয়ার সরকার কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় সভায় ১৫ এপ্রিল '৯১ থেকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া কৃষি ঋণ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির উন্নয়ন কর সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কৃষি খাতে দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার '৯০-৯১ সালে যেখানে ছিলো শতকরা ১.৬ ভাগ ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৮% ভাগে। অবশ্য ১৯৯৪-৯৫ সালে তা কমে শতকরা ০.২% ভাগে দাঁড়ায়। সে বছর ভয়াবহ খরাজনিত কারণে শস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবেহ্রাস পায়। ফলে মোট প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়। তবে বনজ সম্পদ, পশু সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটে। বনজ সম্পদ ১৯৯১-৯২ সালে ২.১% ভাগ থেকে বেড়ে ৯% ভাগে এবং মৎস্য সম্পদ ৫.৮% ভাগ থেকে বেড়ে ৮.৫% ভাগে পৌঁছায়।

কৃষিখাত এককভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

খাদ্য সরবরাহ, কৃষিখাতে কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদির সাথে কৃষিখাতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ২২ লাখ মেট্রিক টন লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হলেও দীর্ঘস্থায়ী খরাজনিত কারণে তা অর্জিত হয়নি। ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন হয় ১ কোটি ৭৫ লাখ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, ৯০ দশকের গোড়াতে দেশে ধানের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৮৯-৯০ সালের ধানের উৎপাদন হঠাৎ বৃদ্ধির পর ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সময় পূর্বে বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে মাত্র ০.৩৭% এ দাঁড়ায়। অথচ ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৯-৯০ সময় পূর্বে বৃদ্ধির হার ছিলো ৩.০৭%। পানির স্তর নীচে চলে যাওয়ায় ও খরার কারণে ১৯৯৪-৯৫ সালে উৎপাদন ঘাটতি ব্যতীত অন্যান্য বছর ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্লথগতি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াই ঘটেছে। ধান উৎপাদনের এ ক্রমঘাটতির কারণ এখনো অজ্ঞাত, এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ কোন জরিপ পরিচালিত হয়নি।

বেগম জিয়ার শাসনামলে মৎস্য সম্পদের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। মাছের উৎপাদন যেখানে ১৯৮৫-৮৬ সালে ছিলো ৮১৫ হাজার টন সেখানে তা ১৯৯৪-৯৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২০০ হাজার টনে। এ পাঁচ বছরে মাছের উৎপাদন মাথাপিছু ৭.৩ কেজি থেকে মাথাপিছু ৯.৬ কেজিতে বৃদ্ধি পায়। এ সময় সরকারী খাতে নিবিড় মৎস্য চাষ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলেই মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৭৫৩ কেজি থেকে ১৩২৬ কেজিতে উন্নীত হয়।

শিল্পায়ন

বেগম জিয়ার আমলে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদার শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়। অর্থনীতিকে আরো উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য শিল্প-ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সরকারী খাতের ভূমিকা ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। সরকারী মালিকানাধীন শিল্প কারখানাগুলোকে বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে 'প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড' গঠন করা হয়। গঠিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে উক্ত বোর্ড বিভিন্ন খাতের ১৮টি সরকারী মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৯১-৯৫ সময়কালে বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)এর প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪% হতে ৫.১ ভাগে বৃদ্ধি পায়। শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯০-৯১ সালে ছিলো মাত্র ২.৪%। তা ৫ বছরে ১০%-এ বৃদ্ধি পায়। বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার '৯০-৯১ অর্থ বছরে যেখানে ছিলো ২% সেখানে ১৯৯৫ সালের শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৩ ভাগে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেও প্রবৃদ্ধির হার ২.৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫%-এ উন্নীত হয়। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে বিনিয়োগ বোর্ড শিল্পখাতে ১২৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব পায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাবের পরিমাণ ছিল ১৫৬ কোটি ৫৯ লাখ মার্কিন ডলার। অপরদিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থায়ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থায় মোট ১০ কোটি ২৫ লাখ মার্কিন ডলারের নতুন বিনিয়োগ হয়। শুধুমাত্র '৯০-৯১ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো শতকরা ৭ ভাগ। ৪ বছরের ব্যবধানে উক্ত প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১৩ ভাগে উন্নীত হয়। প্রধান প্রধান শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণজাত শিল্পে শতকরা ৩২ ভাগ, রাসায়নিক শিল্পে শতকরা ৩৪ ভাগ, বেসিক মেটাল শতকরা ৮৮ ভাগ, তৈরি পোশাক শতকরা ২৬ ভাগ, হোসিয়ারী ও নিটিংওয়্যার শতকরা ৩৭ ভাগ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে শতকরা ৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের উন্নয়ন

বেগম জিয়ার শাসনামলে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫৮১ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ১৯৯৪-৯৫ সালে ক্রমপুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯০৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। এ সময় ৫০৭ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৩৩৮০৯ কিলোমিটার বিতরণ লাইন বৃদ্ধি করা হয়। একই সময় গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধি পায় ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬২৮টি। অপরদিকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৭ হাজার ৯৩৯টি নতুন গ্রামকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনে। অবশ্য চতুর্থ পরিকল্পনা শেষে পিক আওয়ারে (Peak hour) বিদ্যুৎ ব্যবহারের যে লক্ষ্যমাত্রা (২৪৮৫ মেঘাওয়াট) নির্ধারণ করা হয়েছিলো তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা মাত্র ১৯৭০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ফলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৪.৮%। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ডেসারও সিস্টেম লস ১৯৯০-৯১ সালে ছিলো যথাক্রমে ৪১.১১%, ১৬.২৭৫%, ৩৫.৫৫%। ৪র্থ পরিকল্পনাকালে সিস্টেম লসের হার কিছুটা হ্রাস পায়। ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সিস্টেম লসের মাত্রা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় পি ডি বিতে ২২.৫৪%, আর ই বি-তে ১৫.০৪% এবং ডেসায় ৩০%।

www.pathagar.com

পরিবহন ও যোগাযোগ

বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বি এন পি সরকারের আমলে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় ৪৬৫০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ২৯০০০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট, ২৮৮০০ মিটার বেইলী ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। এ সময় তিনটি বড় নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং যমুনা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া ৬৯৩ কিলোমিটার মিটারগেজ ও ২৮৭ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেল লাইন পুনঃস্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়। অপরদিকে ৮৪টি এন জি ও ২৪ টি ব্রডগেজ ব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। যমুনা সার কারখানার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ১৯৯২ সালে তারাকান্দিতে একটি রেল স্টেশন নির্মাণ করা হয়। বার্ষিক ১২০টি লকোমটিভ মেরামতের জন্য ১৯৯২ সালে পার্বতীপুরে একটি আধুনিক ওয়ার্কশপ নির্মাণ করা হয়। এ পরিকল্পনাকালে নিজস্ব সম্পদে সরকার ২১টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ ও ৩টি ক্রেন ও ৯টি মিটারগেজ লকোমটিভ সংগ্রহ করে। এছাড়া ৬৬ টি মিটার গেজ যাত্রীবাহী কোচ সরকারী অর্থে ক্রয় করা হয়। ১৯৯০-৯৫ সময়কালে ৭২৫০৭টি টেলিফোন লাইন এবং ২টি ডিজিটাল মাইক্রোওয়েভ ও আন্তর্জাতিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়।

ভৌত পরিকল্পনা পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ

ভৌত পরিকল্পনাকালে ঢাকা মহানগরীতে ৫০০০ ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৪০০০ সার্বিক প্লট উন্নয়ন করা হয়। ৪৪টি নবসৃষ্ট জেলায় ৩০০০ সরকারী কোয়ার্টার ও ৪৪টি সার্কিট হাউজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়া শুধু ঢাকা মহানগরীতেই ৩০০০ সরকারী কোয়ার্টার নির্মিত হয়। এসময় সমগ্র বাংলাদেশের ৩৬% এলাকা সেনিটেশনের আওতায় আসে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য শহরে ২৫০০০ সেনিটারী লেট্রিন নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও ১৯৮২৮টি নির্মাণ করা হয়। এ সময়কালে পল্লী এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য হাজার হাজার নলকূপ বসানো হয়।ফলে ১৯৯৫ সালে প্রতি ১০৭ জন লোকের জন্য ১টি নলকূপ স্থাপিত হয়। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিলো ১২৫ জনের জন্য ১টি নলকূপ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

৪র্থ পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ কার্যক্রমকে জোরদার করতে সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং তা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত করে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক সংখ্যায় শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের ফলে স্কুলে শিশুদের ভর্তিসংখ্যা

www.pathagar.com

বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিলো ১ কোটি ২১ লক্ষ সেখানে ১৯৯৫ সালে তা ১ কোটি ৭৩ লক্ষে বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির হার ১৯৯১ সালের ৪১% থেকে ১৯৯৪ সালে ৬০%-এ বৃদ্ধি পায়। এসময় বার্ষিক ড্রপ আউটের সংখ্যা ছিলো ৭৪%। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন ছিলো এ সরকারের আমলে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর ফলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গরীব ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ার সংখ্যা হ্রাস পায়। এ পরিকল্পনাকালে ১১৩৪টি নিম্নব্যয় স্কুল নির্মাণ, ৫০৮২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও ৩৪৩২টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। এছাড়া ১৬২০টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও ৪১৫২টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫ সালের জুন পর্যন্ত ৭২৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও ৫৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। আরেকটি প্রকল্পের আওতায় ৬৮৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও ১৫১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন। পল্লী এলাকায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য এ বৃত্তি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা ৫৪ লক্ষ থেকে ৮২ লক্ষে এবং মাধ্যমিক পর্যায় ১০ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষে বৃদ্ধি পায়।

এসময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের হার ছিলো শতকরা ২১ ভাগ। ১৯৯৫ সালে তা ২৭% এ বৃদ্ধি পায়। সরকার নিয়োগ বিধি সংশোধন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের নিয়োগের হার শতকরা ৬০%এ বৃদ্ধি করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও বেগম জিয়ার আমলে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এসময় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৩২ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষে এবং কলেজ পর্যায়ে ৯ লক্ষ থেকে ১৪ লক্ষ ৬০ হাজারে বৃদ্ধি পায়। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ৬৬৮৫ থেকে ৭২৫৫-এ উন্নীত হয়। ১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ৩৪৯০২, ১৯৯৫ সালে তা ৬০,০০০-এ বৃদ্ধি পায়। এ পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রবর্তন ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এ সময় ৬০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯২০টি মাদ্রাসা ও ৪৪৫টি বেসরকারী কলেজের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়। এছাড়া প্রায় সকল বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়। অপরদিকে ১০০টি সরকারী কলেজের উন্নয়ন সাধন করা হয়। এসময় কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।

www.pathagar.com

যুব উন্নয়ন

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন প্রকার যুব উন্নয়ন ও আত্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এসময় ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৪ জন বেকার যুবককে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ৫০ হাজার ৮০৮ জন যুবককে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। একটি প্রকল্পের আওতায় ২৪ হাজার ৫১৮ জন যুবক অর্থনৈতিকভাবে সফলতা লাভ করে। পরিকল্পনাকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের জন্য ৩০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য খাতে যে অগ্রগতি সাধিত হয় তার মধ্যে রয়েছে ঃ শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯১ সালে প্রতি হাজারে ছিলো ১১০জন। ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭৮-এ। ১৯৯১সালে গর্ভকালীন মৃত্যুর হার ছিলো ৫.৭%। ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৫%-এ। ১৯৯১সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিলো ৫৬.১ বছর। ১৯৯৫ সালে তা ৫৮ বছরে বৃদ্ধি পায়। এ সময়কালে দেশে জনগণের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সময়কালে প্রতিদিনে ১৮৫০ ক্যালরি থেকে ২২৬৬ ক্যালরিতে বৃদ্ধি পায়। দেশের নতুন ৭২৪২টি প্রাইভেট ক্লিনিক/হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ৪২টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১ সালে ২.১৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৫ সালে ১.৮২%-এ দাঁড়ায়।

সংস্কার কর্মসূচী

বিশ্বব্যাঙ্ক বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কাঠামোগত উপযোগ সুবিধা (Structural Adjustment Facilities) ঋণ কর্মসূচীর আওতায় সংস্কারের সুপারিশ করেছিলো তা ৮০'র দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়। ৪র্থ পরিকল্পনাকালে এ সংস্কার কর্মসূচী জোরদার করা হয়। এ সময় বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় হার উদারীকরণ, শিল্পখাতের পুনর্গঠন, মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির হার স্বল্প ঘাটতির বাজেট ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণের বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা সম্ভব হয়। কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের ফলে ১৯৮৬-৮৭ সালে বাজেট ঘাটতি ছিলো জি ডি পি'র শতকরা ৮.৪%(৪৫.০৩ মিলিয়ন

www.pathagar.com

টাকা) এবং ১৯৮৯-৯০ সালে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭.৭%। বেগম জিয়া সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে ঘাটতির পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগে নেমে আসে। অবশ্য ১৯৯৪-৯৫ সালে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৮% এ দাঁড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৮.৫৭%। কিন্তু এ সময় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় মাত্র ১৩.১৬%। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রপ্তানি আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯-৯০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিলো ৬২৬৮৩ মিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ১৪.১৬%)। একই সময় আমদানীর পরিমাণও ১৮.২৪% থেকে ২৩.৮৯%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯-৯০ সালে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিলো জিডিপি'র ৫.৬৮ ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা ১৩.০৩%-এ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য '৯৫-৯৬ সালে তা কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১১.৮৬%।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির অগ্রগতি

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে প্রকাশ করা হলেও ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে তা বিএনপি সরকার কর্তৃক সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। খসড়া পরিকল্পনায় মোট ৬৮৯৩০০ মিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হলেও তা কমিয়ে ৬২০,০০০ মিলিয়ন টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও পরিবেশের স্থিতিশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো—

(ক) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করা।

(খ) মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

(গ) আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট সম্পদ বরাদ্দের মধ্যে সরকারী খাতে বরাদ্দ করা হয় শতকরা ৫৬ ভাগ (৩৪৭ হাজার মিলিয়ন টাকা)। অপরদিকে বেসরকারী খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছিলো শতকরা ৪৪ ভাগ (২৭৩ হাজার মিলিয়ন টাকা)। সম্পদ যোগানের লক্ষ্যে পরিকল্পনায় সঞ্চয় প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.৬ ভাগ, বিনিয়োগ ১৪.৮ ভাগ এবং পরিকল্পনা বছরের শেষে ট্যাক্স/ জিডিপি'র অনুপাত ৯.৩ নির্ধারণ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয় স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এসময় ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল ঃ

www.pathagar.com

প্রথমত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস, তৃতীয়ত মুদ্রাস্ফীতির হার কম, চতুর্থত রপ্তানি ও প্রবাসীদের অর্জিত আয় বৃদ্ধি এবং পঞ্চমত নিজস্ব সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচীর সফলতা।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে মাথাপিছু আয় ছিলো ২০৪ মার্কিন ডলার। ১৯৯৬ সালে তা ২৭৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এ সময় জাতীয় শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিলো ৩৮.৮%। ১৯৯৬ সালে তা ৪৫.৬%-এ বৃদ্ধি পায়। এ সময় নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায় ২৪.৫% থেকে ৩৮.৪%-এ। ১৯৯১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তির হার ছিলো ৪৭%। ১৯৯৫ সালে তা ৬৫%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো ২০.৪ ভাগ। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা প্রায় ৩০ ভাগে উন্নীত হয়।

প্রবৃদ্ধি

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫% নির্ধারণ করা হলেও অর্জিত হয় ৪.১৫%ভাগ। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রবৃদ্ধির হার কম হওয়ার প্রধান কারণ ছিলো কৃষি খাতে উৎপাদনে স্থবিরতা। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যেখানে নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৩.৪২% ভাগ, সেখানে অর্জিত হয় মাত্র ০.৯৮% ভাগ। প্রধানত অনাবৃষ্টি, খরার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত না হলেও মোটামুটি সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা ৯.০২% এর বিপরীতে অর্জিত হয় ৭.০৫% ভাগ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে যা লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অনেক বেশি। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৯.২৮% ভাগ; সেক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে ৫.৩১% ভাগ। নির্মাণ খাতের অগ্রগতিও ছিলো সন্তোষজনক। এখাতে লক্ষ্যমাত্রা ৫.৮৬% এর বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৫.৩৪% ভাগ। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৫.৩৯% ভাগ এবং অর্জিত হয়েছে ৫.৬৮% ভাগ। বাণিজ্য ও গৃহায়ণ খাতে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে। বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা খাতে শতকরা ৫% ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৫.৯২% ভাগ। অপরদিকে গৃহায়ণ খাতে ৩.৬২% ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৩.৬৩% ভাগ। জনসেবা খাতে লক্ষ্যমাত্রার ১০.৬৫% ভাগের বিপরীতে অর্জিত হয় ৮.৭৪% ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনায় খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও তার বিপরীতে সাফল্য অর্জনের-হার নিম্নলিখিত সারণীতে তুলে ধরা হল ঃ

www.pathagar.com

সারণীঃ চতুর্থ পরিকল্পনায় খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য অর্জনের হার

খাত	১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা/অর্জিত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কৃষি	১৯০,৩৫৪	১৯৩,৪২১	১৯৭,৬৬২	২০১,২৩০	২০১,৯১৫	১৯৯,৮২২	৩.৪২	০·৯৮
বিদ্যুৎ গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫,৫৬১	৬,৭০৪	৭,৮৭৬	৮,৯৩৩	১০,১৮৪	১১,৩৩৯	৯·২৮	১৫·৩
শিল্প	৪৯,৩২২	৫০,৫০৩	৫৪,২১১	৫৯,১৪০	৬৩,৭৮৬	৬৯,৩০২	৯.০২	৭.০৫
নির্মাণ	২৯,৭৪৯	৩১,০৮৭	৩২,৪৭১	৩৪,০৩২	৩৬,০৭৪	৩৮,৫৯৩	৫·৮৬	৫·৩৪
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৯,০২৪	৬০,৮৪০	৬৩,৩৪৯	৬৬,৪১৬	৭০,০৮৯	৭৪,২০৩	৫·৩৯	৪·৬৮
বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা	১০৫,১২৪	১১০,২৩৭	১১৫,৭৮০	১২২,০৪১	১২৯,৫১৬	১৪০,১১৫	৫·০০	৫.৯২
গৃহায়ণ	৩৮,০৩০	৩৯,৩১৬	৪০,৬৫৬	৪২,১৮৭	৪৩,৭৯২	৪৫,৪৫৭	৩.৬২	৩.৬৩
জনপ্রশাসন	২০,৩৬৩	২২,৩৩৪	২৪,১৮৪	২৬,২৪০	২৮,৪৮৪	৩০,৯৬২	১০.৬৫	৮.৭৪
মোট প্রবৃদ্ধি	৪৯৭,৫২৭	৫১৪,৪৪২	৫৩৬,১৮৯	৫৬০,২১৯	৫৮৩,৮৪০	৬০৯,৭৯৩	৫.০০	৪.১৫

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা–৩।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ৪১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরবর্তী দুই বছরে অর্থাৎ ১৯৯২-৯৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১৩ মিলিয়ন ও ৪০৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৪-৯৫ সালের প্রথম ৬ মাসে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ আসে। সার্বিকভাবে লক্ষণীয় যে, '৮০'র দশকে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের বার্ষিক গড় পরিমাণ যেখানে ছিলো ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে ৯০'র দশকে প্রথম তিন বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৫ মিলিয়ন ডলারে ('কাফকো' বাদে)। কিন্তু এসময় পর্বের বৈদেশিক বিনিয়োগের মূল বৃদ্ধির উৎস ছিলো 'কাফকো' প্রকল্প। এ প্রকল্প সূত্রে ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালে তিন বছরে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে যথাক্রমে ২৩.৫%, ৬৭.৮% ও ৭৮.৫%। বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে 'পোর্ট ফোলিও' বিনিয়োগ। ১৯৯১-৯২ সালে যেখানে 'পোর্ট ফোলিও' বিনিয়োগ ছিলো মাত্র ৬ মিলিয়ন ডলার সেখানে ১৯৯৩-৯৪ সালে 'নীট পোর্ট ফোলিও' বিনিয়োগ হয় ৫৩ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৪-৯৫ সালের ১ম ৬ মাসে 'নীট পোর্ট ফোলিও' আসে ৪৫ মিলিয়ন ডলার যা মোট বিনিয়োগ প্রবাহের ৪৩% ও বেশি।

www.pathagar.com

বাণিজ্য নীতি

বেগম জিয়ার আমলে দেশের বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় ছিলো ১৭১ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার। চার বছরের ব্যবধানে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছে। এসময় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৩৮.১%; অথচ ১৯৯০-৯১ সালে প্রবৃদ্ধি ছিলো মাত্র ১২.৭%। এসময় প্রাথমিক ও শিল্পজাত পণ্য উভয় খাতেই রপ্তানি আয় বাড়লেও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি আয় বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ১৪১ কোটি মার্কিন ডলার। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিলো ২৮৯ কোটি মার্কিন ডলার। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে যেখানে প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি হয়েছিলো ৩০ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে তা ৪০ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এসময় রপ্তানি খাতে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য ছিলো ইতিবাচক। এসময় প্রচলিত পণ্যের চেয়ে অপ্রচলিত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ সালে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের অনুপাত যেখানে ছিলো যথাক্রমে ৬৯ঃ৩১ সেখানে ১৯৯৫ সালে তা দাঁড়ায় ১৩ঃ২৭। রপ্তানি খাতের এ কাঠামোগত পরিবর্তনের পেছনে তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য ও চিংড়ি এবং চামড়াজাত দ্রব্যের মত রপ্তানি সামগ্রীর সম্মিলিত অবদান থাকলেও তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়ের ভূমিকাই ছিলো সবচেয়ে বেশি।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বৈদেশিক রিজার্ভের ক্ষেত্রে বিগত দু'দশকে বিভিন্ন সময় হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও বেগম জিয়ার শাসনামলে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৮১ সালে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিলো ২৫১ মিলিয়ন ডলার যা ১৯৮২ সালে প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। ১৯৮১-৮৯ সময়কালে মাত্র দু'বছর রিজার্ভের পরিমাণ তিন মাসের আমদানীর সমপরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি ছিলো। ১৯৯২ সালের পরবর্তীতে রিজার্ভের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪-৯৫ সময়কালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩২০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছে যা দিয়ে আট মাসের আমদানী ব্যয় চালানো সম্ভব ছিলো। এ বছর বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৫.৭৩% ভাগ।

www.pathagar.com

খালেদা জিয়ার সরকারের অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান উপর্যুপরি মোট পাঁচটি বাজেট জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। উক্ত পাঁচটি বাজেটে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন করারোপ ছাড়াই ক্রমাগত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। এ সময় বিএনপির সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য নিজস্ব সম্পদের যোগান প্রায় শূন্য (০) ভাগ থেকে ৪৭% ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হওয়া। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে যেখানে মোট রাজস্ব আয় ছিলো ৭৮২২ কোটি টাকা, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ২শ' কোটি টাকায়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৫ হাজার ৪শ' কোটি টাকা। অপরদিকে ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ ছিলো ৫,৫০০ কোটি টাকা। অথচ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে তা ১২,১০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। এ উন্নয়ন কর্মসূচীতে নিজস্ব সম্পদের অবদান ছিলো শতকরা ৪৫ ভাগ।

সঞ্চয়

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ১৯৯১-৯৫ সময়কালে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। এর আগে দেশজ উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের শতকরা হার ছিলো মাত্র শতকরা ৪.১ ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ শেষে তা শতকরা ৮.৭ ভাগে বৃদ্ধি পায়। একই সময় জাতীয় সঞ্চয়ের হার শতকরা ১.৯ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৫.৮ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময় মোট বিনিয়োগ দেশজ উৎপাদনে শতকরা ১.৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৫ ভাগে পৌঁছে। সরকারী খাতে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারী খাতের 'অবদানও বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ সময়কালে বিনিয়োগে বেসরকারী খাতের অবদান যেখানে মাত্র ১১ ভাগের মত ছিলো সেখানে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

শেয়ার বাজার

১৯৯১-৯৫ সময়কালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন তালিকাভুক্ত কোম্পানী সিকিউরিটিজ ও মোট বিনিয়োগ সবই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮২ সালে যেখানে 'মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন' ছিলো মাত্র ১০৪০ কোটি টাকা তা ১৯৯৪ সালের

www.pathagar.com

১৯৮৭ সালে হোটেল পূর্বাণী থেকে গ্রেফতার হওয়ার পর রাজপথে জনতার উদ্দেশ্য হাত নাড়ছেন জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

www.pathagar.com

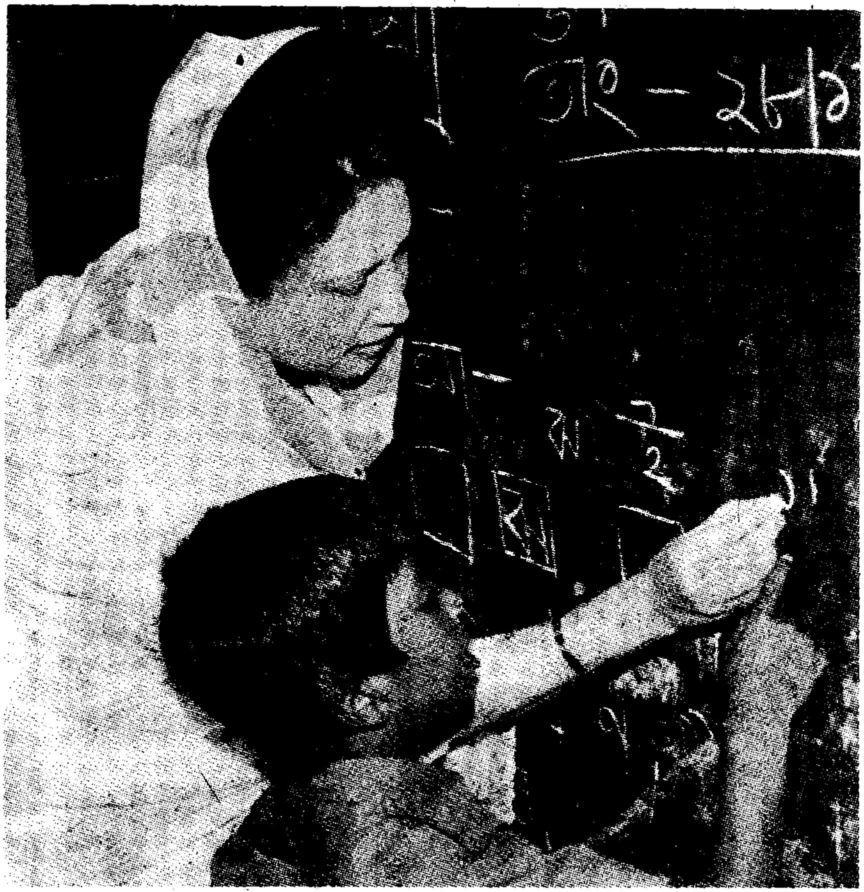

কক্সবাজারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে একজন ছাত্রকে বাংলা বর্ণমালা লেখা শেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

শেষ দিকে বেড়ে ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকায় পৌঁছে। শেয়ারের মূল্যসূচক ২৯৬ হতে ২৮০ পর্যন্ত ওঠে। প্রতিদিনের গড় 'টার্নওভার' মাত্র ১ লাখ টাকা হতে গড়ে প্রায় ২ কোটি টাকায় পৌঁছে। স্টক এক্সচেঞ্জে বিদেশী বিনিয়োগ শূন্য হতে বেড়ে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছায়। ১৯৯০ সালে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা যেখানে ছিলো ১৩৪টি, ১৯৯৫ সালে তা প্রথমার্ধে বেড়ে দাঁড়ায় ১৮০টিতে। ১৯৯০ সালে 'মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন' যেখানে ছিলো মাত্র ১ হাজার ১৩৯ কোটি টাকা, ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকায়। স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতি মানুষের ব্যাপক আগ্রহের কথা বিবেচনা করে চট্টগ্রামে দেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে 'সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ' গঠন করা হয়।

বিনিয়োগ

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে সার্বিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার অত্যন্ত কম। কিন্তু বেগম জিয়ার শাসনামলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯-৯০ সালে জিডিপিতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার ছিলো মাত্র ২.৭০% ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৩৪% ভাগে। এ সঞ্চয় বৃদ্ধি সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই ঘটেছিলো। বিশ্বের অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বংলাদেশে বিনিয়োগের হার অনেক কম। ১৯৯০-৯১ সালে সার্বিক বিনিয়োগের হার ছিলো ১১.৫% ভাগ। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা লক্ষ্যমাত্রার ১৪.৮% ভাগ ছাড়িয়ে ১৬.৬৩% ভাগে পৌছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা ১৬.৯৯% ভাগে বৃদ্ধি পায়। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সম্পদ যোগানোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগের এরূপ অগ্রগতি ছিলো অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩৫৭ হাজার মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এ পরিকল্পনায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বছরভিত্তিক যে বরাদ্দ দেয়া হয় এবং তার বিপরীতে যা বাস্তবায়িত হয় তা নিম্ন সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ

www.pathagar.com

সারণীঃ চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ ও অর্জন

	চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ		এডিপি-র আকার (চলতি মূল্যে)		এডিপি
বছর	১৯৮৯-৯০ সালের মূল্যে	চলতি মূল্যে	সংশোধিত	প্রকৃত	বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তব অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৯০-৯১	৪৮,৪৯০	৫২,৯৪০	৬১,২১০	৫২,৬৯০	৮৬
১৯৯১-৯২	৫৫,০৭০	৬২,৭৮০	৭১,৫০০	৬০,২৪০	৮৪
১৯৯২-৯৩	৭০,১১০	৮১,৮০০	৮১,২১০	৬৫,৫০০	৮১
১৯৯৩-৯৪	৮২,৭০০	১০০,০৯০	৯৬,০০০	৮৯,৮৩০	৯৪
১৯৯৪-৯৫	৯০,৭৩০	১১৪,২০০	১১১,৫০০	১০৩,০৩০	৯২
মোট	৩৪৭,০০০	৪১১,৮১০	৪২১,৪২০	৩৭১,২৯০	৮৮

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা–৯৫

উক্ত পরিকল্পনাকালে যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয় তার বড় অংশ যমুনা সেতু, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা ও বড় পুকুরিয়া কয়লা প্রকল্প, শিক্ষা খাত বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ছাত্রীদের উপবৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ এবং পল্লী সড়ক নির্মান, বিদ্যুতায়ন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাতভিত্তিক যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যমুনা সেতুসহ পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ ১৭.৫২% ভাগ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থাৎ ১৩.৯১% ভাগ বরাদ্দ প্রদান করা হয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে। শিক্ষা খাতে মূল পরিকল্পনায় ৭.৬৬% বরাদ্দ করার কথা থাকলেও তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করে ৯.৫৮% বরাদ্দ করা হয়। একইভাবে পল্লী উন্নয়ন, যোগাযোগ খাতেও মূল বরাদ্দের চাইতে পরবর্তীতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

সম্পদের যোগান

বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। জেনারেল এরশাদের শাসনামলের শেষ দিকে '৯০-৯১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা ছিলো প্রায় ৮০%। বেগম জিয়ার

www.pathagar.com

শাসনামলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে ১৯৯৪-৯৫ সালে তা শতকরা ৫৭%-এ আনা হয়। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নিজস্ব সম্পদের অবদানের হার ছিলো গড়ে ৩১.৭৪ ভাগ। অবশ্য ১৯৯৪-৯৫ সালে এ হার ছিলো সর্বোচ্চ ৪৩.০৩ ভাগ। নিম্নলিখিত সারণীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দ এবং সরকারের নিজস্ব সম্পদের অবদান তুলে ধরা হলঃ

সারণী-বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দ এবং সরকারের নিজস্ব সম্পদের অবদান

অর্থ বছর	মোট এডিপি বরাদ্দ	সরকারের অবদান	মোট বরাদ্দে % হারে
১	২	৩	৪
১৯৯০-৯১	৬১,২১০	১২,৯৮০	২১.২১
১৯৯১-৯২	৭১,৫০০	১৭,৮৭০	২৫.০০
১৯৯২-৯৩	৮১,২১০	২০,৫৩০	২৫.৮৩
১৯৯৩-৯৪	৯৬,০০০	৩৪,৪০০	৩৫.৮৩
১৯৯৪-৯৫	১১১,৫০০	৪৭,৯৮০	৪৩.০৩
মোট	৪২১,৪২০	১৩৩,৭৬০	৩১.৭৪

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭।

বেসরকারী খাতের উন্নয়ন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় সম্পদ যোগানোর ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অবদান ধরা হয় ৪৪% এবং এজন্য মোট বরাদ্দ প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২৭৩ হাজার মিলিয়ন টাকা। খাতওয়ারী বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত বরাদ্দ নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলঃ

www.pathagar.com

সারণীঃ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ

খাত/বর্ষ	১৯৮৯-৯০	১৯৯০০৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	মোট	মোট	অর্জিত সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৃষি	৬,৫০০	৩,৬০০০	৫,৮৫০	৬,৮৬০	৯,২৬০	১০,৮৪০	৩৬,৪১০	৩৬,৭৮০	৯৯
শিল্প	৪,৫০০	১২,৯৫০	১৪,১৫০	১৯,০৬০	২০,৮৬০	২৭,০২০	৯৪,০৪০	৪৪,২০০	২১৩
গৃহায়ন ও নির্মাণ	৭,০০০	৫,৮১০	৫,৮৬০	৮,৮৬০	১২,৮১০	১৬,২৮০	৪৯,৬২০	৪২,০৬০	১১৮
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫,৩০০	৪,৭৩০	৩,৯৯০	৫,৪৪০	৬,০২০	১০,৭১০	৩০,৮৯০	৩৯,০৯০	৭৯
বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা	৭,০০০	১৪,৫৯০	১৪,০৪০	২১,২২০	২৫,৬৫০	৩১,২৭০	১০৬,৭৭০	১১০,৮৭০	৯৬
মোট	৩০,৩০০	৪১,৬৮০	৪৩,৮৯০	৬১,৪৪০	৭৪,৬০০	৯৬,১২০	৩১৭,৭৩০	২৭৩,০০০	১১৬

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা–৯।

১৯৯১-৯৫ সময়কালে বেসরকারী খাতে সম্পদের যোগান লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৮,৬০০ মিলিয়ন টাকায় পৌঁছে। অর্থাৎ প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৬.৪% বেশি। ১৯৯০-৯১ সালে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১৩% ভাগ, ১৯৯১-৯২ সালে ২১% ভাগ, '৯২-৯৩ সালে ২৩% ভাগ, '৯৩-৯৪ সালে ২৬% ভাগ এবং '৯৪-৯৫ সালে ২৮% ভাগে বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে চতুর্থ পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালের চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রথম চার বছরে দেশের দায় পরিশোধ সার্বিকভাবে ছিলো অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। এসময় রপ্তানির পরিমাণ এবং প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ১৯৯১-৯২ সালে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পায়। আমদানী, রপ্তানি ও প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এঁ পরিকল্পনাকালে যথাক্রমে ৯৯.৩৪ ভাগ, ৯৬.২৯ ভাগ ও ৯৯.৩১ ভাগ অর্জিত হয়। অপরদিকে পরিকল্পনায় আমদানী ব্যয় সংস্থানের জন্য রপ্তানি অবদান ৫৫.২১% নির্ধারণ করা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে ৫৩.৮৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

আমদানী

চতুর্থ পরিকল্পনায় আমদানী পণ্যের বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছিলো ৫.০৬ ভাগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৪ ভাগে। খাদ্যশস্য আমদানী ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় ঘটে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৬২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়।

রপ্তানি

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রপ্তানির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১১.৬ ভাগ নির্ধারণ করা হলেও পরিকল্পনা শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২.২ ভাগ। অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির পরিমাণও প্রাক্কলিত ১৫% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.২% এ পৌঁছে।

প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা

ঢাকা মহানগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির হার চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ছিলো ৪.৫%। পক্ষান্তরে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ হার ছিলো ৯.৮%। বেগম জিয়ার আমলে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিলো ১৯৯০-৯১ সালে ৮.৮%, '৯১-৯২ সালে ৫.১%, ৯২-৯৩ সালে ১.৪%, ৯৩-৯৪ সালে ১.৮%, '৯৪-৯৫ সালে ৫.২% এবং '৯৫-৯৬ সালে ৪.১%। এ উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বেগম জিয়ার শাসনকালে মুদ্রাস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিলো।

কর্মসংস্থান

বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আরোহণের পরপরই মন্ত্রিসভার এক বিশেষ বৈঠকে সরকারী চাকরীতে যোগদানের সময়সীমা ২৭ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ বছর করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর আমলে প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৩ সালে বেকারত্বের হার ছিলো ৪১.৯৫% এবং ১৯৮৯-৯০ সালে ৩৭.৪১%। ৪র্থ পরিকল্পনাকালের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সালে বেকারত্বের হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬.৪৬%। ৪র্থ পরিকল্পনাকালে ৫.০৫ মিলিয়ন লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো; তন্মধ্যে ৪.৫৮ মিলিয়ন লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয় যা ছিল লক্ষ্যমাত্রার ৯১% ভাগ।

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার সরকারের জন্য আন্দোলন

প্রধান বিরোধী দলের কতিপয় দাবী অগ্রাহ্য করায় আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে বেগম জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। সংসদে প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ সংসদে লেবাননের হেবরন এলাকায় ইসরাইলী সৈন্যদের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনাকালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমূল হুদার এক মন্তব্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দল সংসদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে। সংসদ বর্জন অব্যাহত থাকাকালে ২০ মার্চ ১৯৯৪ মাগুরায় এক আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি-র বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দল সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। এর আগে জামায়াতে ইসলামী নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (কেয়ারটেকার সরকার) অধীনে ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে আসছিল। মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে আওয়ামী লীগও কেয়ারটেকার সরকারের দাবী জানাতে থাকে। জাতীয় পার্টি এবং বামফ্রন্ট একই দাবীতে আন্দোলনে যোগ দেয়। ক্ষমতাসীন বিএনপি ঐ দাবী উপেক্ষা করায় ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সদস্য একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। সংসদের স্পীকার পদত্যাগপত্রগুলো বৈধ বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগপত্রগুলোর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্ট পদত্যাগপত্রগুলো বৈধ বলে ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে ৯০ দিন সংসদে অনুপস্থিত থাকায় বিরোধী দলীয় সদস্যদের আসন শূন্য হয়ে যায়।

সংবিধানের ১২৩ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের কথা। নির্বাচন কমিশন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (Act of God) কারণ দেখিয়ে শূন্যপদ পূরণের সময়সীমা আরো ৯০ দিনের জন্য বর্ধিত করে। উক্ত সময়সীমার মধ্যেই নির্বাচন কমিশন ২২ নভেম্বর ১৯৯৫ সংসদের ১৪৫টি শূন্যপদ পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ১৫ ডিসেম্বর উপ-নির্বাচন অনুঠানের তারিখ ধার্য করা হয়। এদিকে পঞ্চম সংসদের মেয়াদ অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ৪ জানুয়ারী থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত সময়সীমা কাছাকাছি থাকায় এরূপ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান বাস্তবসম্মত ছিল না। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি মেয়াদ পূর্তির ১৩৩ দিন আগে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

১০ জানুয়ারী ১৯৯৬ নির্বাচন কমিশন বিরোধী দলগুলোর সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ২০ জানুয়ারী তিনটি বিরোধী দল—আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী পৃথক পৃথক পত্রযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আসন্ন সংসদ নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল করার অনুরোধ জানায়। জবাবে নির্বাচন কমিশন বলে যে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশন বাধ্য এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দিবে। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। তারা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করে। ২৩ জানুয়ারী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন কোন প্রার্থী না থাকায় ১৪ জন মন্ত্রীসহ মোট ৪২ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিবাচিত হন।

১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য বিরোধী দলগুলো ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঃ অসহযোগ আন্দোলন, সমাবেশ, অবরোধ, ১০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে গণমিছিল, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে একনাগাড়ে ৪৮ ঘন্টাব্যাপী হরতাল ইত্যাদি। ১৫ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের কর্মসূচীর কারণে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে ঢাকায় ৫% থেকে ১০% ভোটার ভোটদান করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ১৪ জনের মৃত্যু এবং সহস্রাধিক ব্যক্তির আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনে বিএনপি এককভাবে জয়লাভ করে।

দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনকে "ত্রুটিপূর্ণ" বলে নাকচ করে দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্ররা এনির্বাচন রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখবে না বলে মন্তব্য করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী ছ'টি বৈদেশিক সাহায্যদানকারী দেশের রাষ্ট্রদূতগণ ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ঢাকার এক বৈঠকে মিলিত হন। মোট প্রদত্ত ভোটের গড়পড়তা হার শতকরা ১০ ভাগের বেশি নয় এবং নির্বাচনে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। এই নির্বাচন সরকারকে বৈধতা প্রদান করবে না বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা দাবী করেন যে, বিরোধী দলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণ প্রহসনের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি প্রেসিডেন্টকে

www.pathagar.com

অবিলম্বে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের কোনো বিচারপতির কিংবা দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান।

৩ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিল পেশ করা হবে। বিরোধী দলগুলো তাঁর এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবীতে ৯ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১২ দিন যাবৎ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকার ফলে সারাদেশে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ১৯ মার্চ বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ঐদিনই ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে "জনতার মঞ্চ" নির্মাণ করা হয়। এ মঞ্চ থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাজনৈতিক বক্তৃতা, গণসংগীত ও আবৃত্তি প্রচার করা হতে থাকে। এসমাবেশে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশে বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী যখন মেনেই নিয়েছেন, তখন 'ভোট চোরদের' নিয়ে অবৈধ সংসদ চালাবার নাটক বন্ধ করুন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল ও নিজে পদত্যাগ করে মে মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন। ২৪ মার্চ "জনতার মঞ্চ" থেকে শেখ হাসিনার নামে হরতাল, অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সরকারের বিরুদ্ধে ৯০টি ওয়ার্ডে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ বিএনপি সরকার সংসদে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ বিলটি সংসদে আলোচিত হয়। সারারাত আলোচনার পর ২৭ মার্চ সকাল বেলা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী হিসেবে বিলটি গৃহীত হয়। এসংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করে দশজন উপদেষ্টা

www.pathagar.com

নিয়োগ করবেন। নির্দলীয় সরকার ৯০ দিনের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। এ সরকার পরবর্তী নয়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁর আগে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে রাজী না হন, তা'হলে রাষ্ট্রপতি কোন একজন নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করতে পারবেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা কিংবা উপদেষ্টাগণকে অপসারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলেও নতুন সংশোধনীতে তাঁকে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। তা'ছাড়া প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বও তাঁর হাতে দেয়া হয়।

২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা বেগম জিয়া বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল অনুমোদন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং পরবর্তী মে মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি অনুমোদন করেন।

বেগম জিয়ার লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বল্পতম-স্থায়ী সংসদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৫ ফেব্রুয়ারী একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ মাত্র ৪ দিন স্থায়ী হয়। সবগুলো আসনের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার আগেই এবং সংসদ মুলতবী থাকাকালেই তা' বাতিল হয়ে যায়।

নবগঠিত কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ১২ জুন, ৯৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আকতার হোসাইন, ইন কোয়েস্ট অব ডেভেলপমেন্ট, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটিড, ১৯৯৬।

২. আবদুল মতিন, খালেদা জিয়ার শাসনকাল, ঢাকাঃ রেডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭।

৩. সৈয়দ আবদাল আহমেদ ও সৈয়দ মেসবাহ উদ্দিন, নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া, ঢাকা ঃ ইনকিলাব প্রকাশনা, ১৯৯১।

৪. হাবিব জাফরুল্লাহ, এম এ তাসলিম, আনিস চৌধুরী (সম্পাদিত), ঢাকাঃ পলিসি ইস্যুজ ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটিড, ১৯৯৫।

৫. রেহমান সোবহান, বাংলাদেশ প্রব্লেমস অব গভর্ন্যান্স, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটিড, ১৯৯৫।

৬. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটিড, ১৯৯৫।

৭. রুহুল আমিন, বেগম খালেদা জিয়া ঃ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূল ধারার নেতৃত্ব, ঢাকাঃ হীরা বুক মার্ট, ১৯৯৩।

৮. বিশ্ব ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯৪।

৯. বিশ্ব ব্যাংক; বাংলাদেশঃ ফ্রম স্ট্যাবিলাইজেশন টু গ্রোথ (রিপোর্ট নং ১৭২৪-ইউ), ১৯৯৪।

১০. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকা ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

১১. বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮০-৮৫, ঢাকা ঃ বিজি প্রেস, ১৯৮০।

১২. জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, চতুর্থ বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৫।

১৩. ডঃ তারেক শামসুর রহমান, বিএনপি সরকারের বৈদেশিক নীতি, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

১৪. আবদুস শহিদ, নির্বাচনী ঘোষণার আলোকে বিএনপি সরকারের সাড়ে তিন বছরের অর্জন, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

১৫. আলীমুজ্জামান হারুন, বিএনপি-ও নির্বাচনী অঙ্গীকার, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

www.pathagar.com

১৬. ডঃ মোহাম্মদ মাহবুবুল্লাহ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

১৭. রুহুল আমীন, বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

১৮. মাহী, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

১৯. সফিকুর রহমান সফিক, বিএনপি'র ১৬ বছর, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২০. এএম জহীরুদ্দিন, বর্তমান সরকারের শিল্পায়নে উদ্যোগ ও সফলতা, ঢাকা ঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২১. আলী মামুদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংস্কারের দিক-দিগন্ত, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২২. ডঃ খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সফলতা, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২৩. মিডিয়া সিন্ডিকেট, বিদেশী বিনিয়োগ ও রেমিটেন্স-এ যুগান্তকারী সাফল্য, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২৪. ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, অনেক কঠিন সত্যকেও ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে, ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল, তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।

২৫. পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), ঢাকা, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

শেখ হাসিনা

"বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছু পাবার নেই। সব হারিয়ে আমি এসেছি আপনাদের পাশে থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য।"

–শেখ হাসিনা

জন্ম	ঃ	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।
জন্মস্থান	ঃ	টুঙ্গিপাড়া, ফরিদপুর (বর্তমানে গোপালগঞ্জ)।
পিতা	ঃ	শেখ মুজিবুর রহমান।
মাতা	ঃ	বেগম ফজিলাতুন্নেসা।
শিক্ষা	ঃ	১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ।
বিবাহ	ঃ	১৯৬৮ সালে ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে পরিণয়। ডঃ ওয়াজেদ বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৯৯৮ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।
রাজনীতি	ঃ	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হবার সময়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ছিলেন।

- ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে নয়া দিল্লী আগমন এবং ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ।
- ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত।
- ১৯৮১ সালের ১৭ মে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন।
- ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত।
- ১৯৮৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন নেতা গ্রেফতার। ১ মার্চ মুক্তিলাভ।
- ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট পাঁচ দফার ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুগপৎ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু।

www.pathagar.com

- ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর পুনরায় গ্রেফতার এবং ১৯৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ।
- ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনাসহ বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার এবং নির্বাচনের পরে মুক্তি দান।
- ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোটের অংশ গ্রহণ এবং ১০৩ টি আসন লাভ।
- ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বরে গৃহবন্দী এবং ১০ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ।
- ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা ঘোষণা।
- ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর গ্রেফতার ও গৃহবন্দী।
- ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের প্রাক্কালে গণআন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন।
- ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ১০০ টি আসন লাভ এবং বিরোধী দলে অবস্থান গ্রহণ করে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ।
- ১৯৯১-৯৬ সাল পর্যন্ত বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও কেয়ারটেকার সরকারের দাবীতে সংগঠিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দান।
- ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ।

বিশেষ অবদান : ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, যমুনা সেতুর নির্মাণ সমাপ্তকরণ, আশ্রায়ন কর্মসূচী, ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা, কেয়ার টেকার সরকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দান, ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান ইত্যাদি।

পদক : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) -এর 'সেরেস' পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ যখন মর্মান্তিকভাবে নিহত হন, তখন তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানীতে ছিলেন। দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সৌজন্যে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। তিনি এসময়

www.pathagar.com

ছিলেন দেশের বাইরে। সভানেত্রী নির্বাচিত হবার পর তিনি ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেন, "আমার বাবার হত্যাকারীগণ এবং তাদের সহযোগীদের প্রকাশ্য বিচারের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি দানের দাবী উত্থাপন করাই হবে আমার প্রথম কাজ।"

প্রায় ৬ বছরকাল প্রবাস জীবনযাপনের পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানায়। ঐ দিন বিকালে শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউতে তাঁকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। এতে শেখ হাসিনা বলেন,

> "বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছু পাবার নেই। আমি বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ পরবর্তীকালের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। -------আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যে "সিস্টেম" চালু করতে চেয়েছিলেন, তা যদি বাস্তবায়িত করা হতো তা হলে বাংলার মানুষের দুঃখ আর থাকতো না। সত্যিকার অর্থেই সোনার বাংলায় পরিণত হতো।"

১৯৮১ সালে ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন। রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ পূরণের জন্য ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে শেখ হাসিনা ডঃ কামাল হোসেনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী পরাজিত হয়।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তিনি দেশে সামরিক আইন জারী করে সকল রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। শেখ হাসিনা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ঘোষণা করেন, "এ সামরিক শাসন মানি না, মানব না।"

১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), সাম্যবাদী দল, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাসদ, বাকশাল, জাসদ (সিরাজ), ওয়ার্কার্স পার্টি, গণআজাদী লীগ এবং অপর কয়েকটি দলের সমন্বয়ে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। ৯ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

এক সম্মেলনে শেখ হাসিনা জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে ১১ দফা ঘোষণা করেন।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সংবিধান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐদিন ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ১ জন নিহত ও ৩৭ জন ছাত্র আহত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতেও কমপক্ষে ৫ জন নিহত হয় এবং কয়েকশ' আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় ও প্রায় ৪০০ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। হরতাল শেষে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ১৮টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ডঃ কামাল হোসেনের বাসগৃহে এক সভায় মিলিত হয়। সভা শুরু হওয়ার পর সামরিক সরকার শেখ হাসিনা ও ডঃ কামাল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন নেতাকে রাজনৈতিক সভা করার অভিযোগে গ্রেফতার করে। ১ মার্চ সরকার এসকল নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেয়।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট ৫ দফার ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যুগপৎ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ৫ দফার মূলকথা ছিল সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৮টি ছাত্র সংগঠনও জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ১৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বিরোধী দল জেনারেল এরশাদের এ কর্মসূচিকে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি বলে গণ্য করে। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ১ নভেম্বর '৮৩ হরতাল ও বিক্ষোভ পালন করে জেনারেল এরশাদকে অবিলম্বে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ১৪ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলা মেনে চলার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে ২৪ মে' ৮৪ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ২৫ নভেম্বর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরশাদের এ ঘোষণায় বিরোধী দলগুলো কোন উৎসাহ প্রকাশ করেনি। তারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে আন্দোলন করতে থাকে।

www.pathagar.com

২৭ নভেম্বর '৮৩ জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে 'জনদল' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ২৮ নভেম্বর বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল ও জোট যুগপৎ ঘেরাও আন্দোলন শুরু করে। ঢাকায় পুলিশ ও প্রায় ২৫ হাজার বিক্ষোভকারী জনতার মধ্যে ৫ ঘন্টাব্যাপী খণ্ডযুদ্ধের পর সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকায় ২৩ ঘন্টাব্যাপী কার্ফ্যু জারি করে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক আইনের আওতায় বিধি-নিষেধ আরোপ করে। ৩০ নভেম্বর অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতি পদ দখল করে জেনারেল এরশাদ বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়সূচী সম্পর্কে তিনি যে কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর সাথে আলোচনা করতে রাজী আছেন। তিনি আরো বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে না। ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়া হয়। সদ্য কারামুক্ত নেতৃবৃন্দ বলেন, বিনা শর্তে জেনারেল এরশাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। শেখ হাসিনা ১৫ দলীয় জোটের পক্ষে বলেন, আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। তিনি বলেন, "৫ দফা কর্মসূচী হবে আলোচনার ভিত্তি এবং জেনারেল এরশাদকে তা মেনে নিতে হবে।" শেখ হাসিনা রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানান। বিরোধী দলগুলোর প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও বিরোধীতার মুখে জেনারেল এরশাদ উপজেলা নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হন।

জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে ১৯৮৪ সালে ২৪ ও ২৫ মে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিরোধী দল তার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। বিরোধী দল তার এ ঘোষণাও প্রত্যাখ্যান করে। জেনারেল এরশাদ এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি ১৯৮২ সালের চালু সংবিধান পুনর্জীবিত করবেন। এর অর্থ ছিলো সামরিক শাসন জারির পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন করা। ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি করেন।

১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

"সামরিক বাহিনী আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আজ তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি ঢুকিয়ে তার নৈতিক মনোবল ক্ষুন্ন করা হয়েছে। আপনারা জানেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালে বঙ্গবন্ধু এই সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি সেনাবাহিনী গঠন সংক্রন্ত বিধান সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের মর্যাদা জাতীয়ভাবে তুলে ধরেন। --- সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং জওয়ান ও অফিসারদের মৃত্যুর জন্য কোন রাজনৈতিক দল দায়ী নয়। তার জন্য সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষী অফিসাররাই দায়ী। তাই আমরা বলতে চাই যে, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়, আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে ঐ উচ্চাভিলাষী কিছু সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যারা আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে, ক্ষমতা দখলের উচ্চভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করেছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির জনককে হত্যা করে যে ক্ষমতা ক্যান্টনমেন্টে কুক্ষিগত করা হয়েছে, সেই ক্ষমতা আমরা লড়াই করে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেব।"

ইতোপুর্বে মোট তিনবার স্থগিতের পর জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৫ সালের ১৫ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আওয়ামী লীগ এনির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। বিএনপি ও অন্যান্য দলও নির্বাচন বর্জনের অনুরূপ ঘোষণা দেয়। এমতাবস্থায় জেনারেল এরশাদ ২১ মার্চ, ৮৫ তারিখে আস্থাভোট অর্জনের জন্য এক গণভোটের আয়োজন করেন। এসময় এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনা গণভোটের বিরোধিতা করে অবিলম্বে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী করেন। ৩ মার্চ সামরিক জান্তা শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দী করে। ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল এরশাদ দাবী করেন যে ভোটারদের মধ্যে ৭১% এর বেশী ভোট দান করে। লন্ডনের "দি গার্ডিয়ান" পত্রিকায় বলা হয় যে, বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও অন্যান্য নির্দলীয় পর্যবেক্ষকরা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আগত ভোটারদের সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ৩০ এর বেশী নয় বলে মনে করেন। "দি টাইমস" পত্রিকার প্রতিনিধি বলেন, কি করে মিথ্যাচার সহ্য করে বাঁচতে হয় সে সম্পর্কে গতকাল (২১ মার্চ) বাংলাদেশ শিক্ষা লাভ করে।

১ মার্চ '৮৬ বেতার ও টিভি ভাষণে এরশাদ জাতির উদ্দেশে সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নিলে প্রার্থী মন্ত্রীদের

www.pathagar.com

পদত্যাগসহ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলে যে, এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনই নিরপেক্ষ হতে পারে না। ১৭ মার্চ ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের এক যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে কেউ এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলে জাতির কাছে 'বিশ্বাসঘাতকে' পরিগণিত হবে"। এ ঘোষণা সর্বমহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২২ মার্চ মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচী পালিত হবে। ১৯ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ১৫ দলীয় জোটের এক জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, "যারা এই নির্বাচনে অংশ নিবে তারা 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে চিহ্নিত হবেন।" ২১ মার্চ গভীর রাতে সবাইকে হতবাক করে দিয়ে আন্দোলনের শরীক ১৫ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, তার দল নির্বাচনে যাবে। উক্ত ঘোষণার সাথে সাথে রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, নির্মল সেনসহ বেশ ক'জন নেতা ১৫ দলীয় জোট ত্যাগ করে ৫ দলীয় 'বামজোট' গঠন করেন। জামায়াতে ইসলামীও নির্বাচনে অংশ নেবে বলে ঘোষণা দেয়। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে বলেন যে,

> "সামরিক অভ্যুত্থান, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য আওয়ামী লীগ যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার অঙ্গ হিসেবে সাধারণ নির্বাচনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমরা ক্ষমতার লোভে নির্বাচনে যাচ্ছি না। সামরিক শাসনের অবসান ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য এই নির্বাচনকে গণভোট বলে গণ্য হবে। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভীতি এবং নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক শ্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জনসাধারণকে বোকা বানাতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।"

৫ মে শেখ হাসিনা নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি এতে তাঁর দলের নির্বাচনে অংশ নেয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ৭ মে, '৮৬ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকার মতে ব্যাপক গুন্ডামি ও ভোট কারচুপির ফলে ১৯৭৯ সালের পর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন যে, "এটা সাধারণ কারচুপি নয়, সরাসরি ডাকাতি।" নির্বাচনে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

www.pathagar.com

নির্বাচনের আগে জেনারেল এরশাদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনের পর সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। কিন্তু নির্বাচনের পর তাঁর সুর বদলায়। সামরিক আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সংসদ কর্তৃক বৈধ বলে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আইন প্রত্যাহার করা হবে না বলে তিনি ঘোষণা করেন। শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, ঐক্যজোটের নির্বাচিত সদস্যগণ ৩ জুলাই দলীয় শপথ গ্রহণ করবেন, কিন্তু সামরিক আইন প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করা হলে ১০ জুলাই তারা সংসদের প্রারম্ভিক অধিবেশনে যোগদান করবেন না। ১০ জুলাই ৮ দলীয় ঐক্যজোটের ১০৩ জনসহ বিভিন্ন বিরোধী দলের ১১৯ জন সদস্য সংসদের প্রারম্ভিক অধিবেশন বর্জন করেন। পরবর্তীতে সংসদে যোগদান করে শেখ হাসিনা জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

১৪ জুলাই জেনারেল এরশাদ অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। ২ সেপ্টেম্বর, '৮৬ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপরই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।

১৫ অক্টোবর '৮৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। তিন জোট এ নির্বাচন বর্জন করে এবং সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করে। সারাদেশে সফল হরতাল পালিত হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ নির্বাচনে অংশ না নিলেও সরকারিভাবে ৬০% ভাগ ভোট পড়েছে এবং প্রদত্ত ভোটের ৮০% এরশাদ পেয়েছেন বলে ফলাও করে প্রচার করা হয়।

১০ নভেম্বর,৮৬ জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে "ইনডেমনিটি বিল" পাশ হয়। এর মাধ্যমে চার বছরের অধিককাল স্থায়ী সামরিক শাসনের বৈধতা দেয়া হয়। এ বিল পাশ হওয়ার ঘন্টাখানেক পর জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

১ জানুয়ারী, '৮৭ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ হাসিনা এবং বেগম সাজেদা চৌধুরী যথাক্রমে দলের সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

১২ জুলাই, '৮৭ জাতীয় সংসদে জেলা পরিষদ বিল পাস হয়। এ বিলের প্রতিবাদে তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামী ২২ জুলাই থেকে ৫৪ ঘন্টার লাগাতার হরতাল ঘোষণা করে। ৫৪ ঘন্টা হরতাল চলাকালে ৭ ও ৮ দলীয় জোট আবার কাছাকাছি এসে পড়ে। দেশব্যাপী দাবি উঠতে থাকে দুই নেত্রীকে এক মঞ্চ থেকে আন্দোলন করার

www.pathagar.com

জন্য। ২৭ সেপ্টেম্বর তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ অক্টোবর দুই নেত্রী এক বৈঠকে বসেন এবং একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ১ ও ১০ নভেম্বর হরতালসহ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। আন্দোলন আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। ফলে সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ ও মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৯ নভেম্বর সারাদিনই ১৪৪ ধারা অমান্য করে নগরীর অলিতে গলিতে মিছিল সমাবেশ হয়। ১০ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। এদের মধ্যে নূর হোসেন ছিল অন্যতম। নূর হোসেনের উদোম শরীরের বুকে পিঠে সাদা রঙ দিয়ে লেখা ছিলঃ বুকে "স্বৈরাচার নিপাত যাক" এবং পিঠে "গণতন্ত্র মুক্তি পাক"। নূর হোসেনের মৃত্যু আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। তার ছবি জনমনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে নূর হোসেনের বুকে-পিঠে লেখা শ্লোগান সম্বলিত ছবি ব্যবহার করে। ১২ নভেম্বর শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দী করা হয়। বেগম জিয়া আত্মগোপন করেন; তবে পরে এক হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ২২ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৩ দিনব্যাপী আন্দোলনে কমপক্ষে ২১ জন নিহত হয়। সরকার স্বীকার করে যে, ১৩ দিনের আন্দোলনে দেশে শিল্পোৎপাদন ও রফতানি বাণিজ্য বানচাল হওয়ার ফলে প্রতিদিন পাঁচ কোটি ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এরশাদ ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে দেশে এক মাসের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। জনগণকে কতিপয় মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক সপ্তাহ পর জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করে। জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান বলেন, সংসদ পুরোপুরি অকর্মণ্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর দলের সদস্যগণ পদত্যাগ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আওয়ামী লীগ ও সংসদের অন্যান্য বিরোধী দলীয় সদস্যগণ শীঘ্রই পদত্যাগ করবেন। "দি গার্ডিয়ান" পত্রিকার সংবাদদাতা বলেন যে, জামায়াতে ইসলামী দলভুক্ত সদস্যদের পদত্যাগ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদের পদত্যাগে অনুপ্রেরণা যোগায়। শেখ হাসিনা গৃহবন্দী থাকায় তাঁর অনুমোদন নিয়ে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যরা স্পীকারের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দেয়। ১০ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়াসহ মোট ১৯ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

মুক্তি পাওয়ার পর শেখ হাসিনা এরশাদের সংগে কোন প্রকার আলোচনা হবে না উল্লেখ করে বলেন, "তাকে পদত্যাগ করতে হবে। সে একজন খুনী। গত মাসে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ৩০ জনকে সে খুন করেছে। কোন অবস্থাতেই আমি একজন খুনীর সাথে কথা বলতে রাজী নই।"

সরকার জাতীয় সংসদ বাতিল করে ২৮ ফেব্রুয়ারি '৮৮ নতুন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে। এসময় শেখ হাসিনা বলেন, "এরশাদ নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার জন্য নতুন নির্বাচনের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু জনগণ তাকে পুনরায় তার পুরাতন চাল খাটাতে দেবে না। তাঁর অধীনে কোন নির্বাচনই নিরপেক্ষ হতে পারে না।" ৩ জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সমাবেশে শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া বলেন, এরশাদের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনে তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন না। ২১টি বিরোধী দল এক মাসব্যাপী নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচী পালন করে। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করলেও ২ জানুয়ারী ৭০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ সম্মিলিত বিরোধী দল নাম দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা দেয়। এদিকে প্রধান বিরোধী জোট ও দলগুলোর আন্দোলনের কর্মসূচীর কারণে নির্বাচনের তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ৩ মার্চ নির্ধারণ করা হয়।

২৪ জানুয়ারী,৮৮ চট্টগ্রামের লালদীঘি এলাকার আট-দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী শেখ হাসিনার সভায় যোগদানেচ্ছু হাজার হাজার জনতার মিছিলের উপর পুলিশ ও বিডিআর বিনা উস্কানিতে নির্বিচারে জালিয়ানওয়ালাবাগ কায়দায় গুলীবর্ষণ করে। এর ফলে কম পক্ষে ৩৮ জন নিহত এবং ৩'শরও বেশী আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৪ জনের লাশ পুলিশ পুড়িয়ে ফেলে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাত্র ৮ জনের প্রাণহানির কথা স্বীকার করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৫ শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ "পুলিশ বি ডি আর বাহিনী জননেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ী লক্ষ্য করে সরাসরি গুলিবর্ষণ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ ঘটনা শেখ হাসিনার প্রাণনাশের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।" ঢাকায় ফিরে এসে শেখ হাসিনা এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, "আক্রমণের উত্তর আক্রমণের মাধ্যমে দেয়া হবে"।

নির্বাচন বিরোধিতার অংশ হিসেবে বিরোধী জোটগুলো ২ মার্চ থেকে ৩৬ ঘন্টাব্যাপী লাগাতার হরতাল ঘোষণা করে। নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলো পাহারা দেয়ার জন্য ৯ হাজার সৈন্য ও কমপক্ষে ৩ লক্ষ পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। নির্বাচনে মারাত্মক আকারে ভোট কারচুপি সংঘটিত হয়। বিভিন্ন সূত্রের মতে, শতকরা এক থেকে তিনজন ভোটদাতা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে, বাংলাদেশের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটার ব্যাপক 'বয়কট'-এর মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে। সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫৯ এবং সম্মিলিত বিরোধী গ্রুপ ১৯ টি আসন পেয়েছে। শেখ হাসিনা একে 'মিডিয়া ক্যু' বলে অভিহিত করেন।

১৯৮৮ সালের ১৩ মার্চ বরিশালের শর্ষিনায় এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করে বলেন যে, নতুন সংসদ পবিত্র কোরআনকে ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করবে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ১৬ বছর আগে তৈরী ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধন করবে। ১১ মে সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিল উত্থাপন করা হয়। এর প্রতিবাদ করে শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ সরকার ক্ষমতার ভিত্ মজবুত করার জন্যই এ বিল এনেছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতি নিয়ে সে রাজনীতি শুরু করেছে। শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি একে একে ধ্বংস করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার পথ খোলা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে মুছে ফেলে দেশকে সাম্প্রায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এ সংশোধনী বিল আনা হয়েছে।

প্রহসনের নির্বাচন, জরুরী অবস্থা, রাষ্ট্রধর্ম, রাজনৈতিক নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জোটগুলো তাদের আন্দোলন জোরদার করে। হরতাল, বিক্ষোভ ইত্যাদি কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে ৬ সপ্তাহব্যাপী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বিচলিত হয়ে জেনারেল এরশাদ ২৭ নভেম্বর, '৯০ পুনরায় সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও ৭ দলীয় নেত্রী বেগম জিয়াকে আটক করা হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরদিন কেবলমাত্র ঢাকা শহরে ১৩ জন নিহত হয়। ঢাকার বাইরেও বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। এসময় এক সপ্তাহে সারা দেশে ৭৫ জন নিহত, ৩ হাজারের বেশী আহত ও ৫২ হাজারের বেশী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে ৪ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ১৩৯টি আসন, আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র দলগুলো ১০০টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামায়াত ১৮টি এবং অন্যান্য আসনগুলো ক্ষুদ্র দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করে। জামায়াতে ইসলামীর

www.pathagar.com

সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনা নির্বাচনে "সূক্ষ্ম কারচুপি" হয়েছে বলে দাবী করেন। পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ নেতা ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, "নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান, ভোটার তালিকায় ত্রুটি-বিচ্যুতি, কতিপয় অনিয়ম, কালো টাকার অবৈধ প্রভাব ইত্যাদি ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এমুহূর্তে নির্বাচনের সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রকারান্তরে তা জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণমানুষের প্রদত্ত রায়কে অবমাননা করা হবে।"

সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে শেখ হাসিনা ৩ মার্চ '৯১ দলের সভানেত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৪ মার্চ সকাল বেলা এখবর ছড়িয়ে পড়ার পর "পদত্যাগ মানি না" শ্লোগান দিয়ে হাজার হাজার মানুষ ছোট ছোট মিছিল করে 'বঙ্গবন্ধু' ভবনে যায়। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ প্রত্যাহারের দবীতে মিছিল করে। মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, দলের কার্যনির্বাহী সংসদে সকল সদস্য, জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও মহিলা লীগসহ সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামালের অনুরোধে শেখ হাসিনা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছেন।

কেয়ারটেকার সরকারের জন্য আন্দোলন

প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কতিপয় দাবী অগ্রাহ্য করায় আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। সংসদে প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ সংসদে লেবাননের হেবরন এলাকায় ইসরাইলী সৈন্যদের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনাকালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার এক মন্তব্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দল সংসদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে। সংসদ বর্জন অব্যাহত থাকাকালে ২০ মার্চ ১৯৯৪ মাগুরায় এক আসনে উপনিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি-র বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দল সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। এর আগে জামায়াতে ইসলামী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (কেয়ারটেকার সরকার) অধীনে ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে আসছিল। মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে আওয়ামী লীগও কেয়ারটেকার সরকারের দাবী জানাতে থাকে। জাতীয় পার্টি এবং বামফ্রন্ট একই দাবীতে আন্দোলনে যোগ দেয়। ক্ষমতাসীন বিএনপি ঐ দাবী উপেক্ষা করায় ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের

www.pathagar.com

১৪৭ জন সদস্য একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। সংসদের স্পীকার পদত্যাগপত্রগুলো বৈধ বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগপত্রগুলোর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্ট পদত্যাগপত্রগুলো বৈধ বলে ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে ৯০ দিন সংসদে অনুপস্থিত থাকায় বিরোধী দলীয় সদস্যদের আসন শূন্য হয়ে যায়।

সংবিধানের ১২৩(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের কথা। নির্বাচন কমিশন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (Act of God) কারণ দেখিয়ে শূন্যপদ পূরণের সময়সীমা আরো ৯০ দিনের জন্য বর্ধিত করে। উক্ত সময়সীমার মধ্যেই নির্বাচন কমিশন ২২ নভেম্বর ১৯৯৫ সংসদের ১৪৫টি শূন্যপদ পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ১৫ ডিসেম্বর উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য করা হয়। এদিকে পঞ্চম সংসদের মেয়াদ অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ৪ জানুয়ারী থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত সময়সীমা কাছাকাছি থাকায় এরূপ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান বাস্তবসম্মত ছিল না। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি মেয়াদ পূর্তির ১৩৩ দিন আগে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

১০ জানুয়ারী ১৯৯৬ নির্বাচন কমিশন বিরোধী দলগুলোর সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ২০ জানুয়ারী তিনটি বিরোধী দল-আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী পৃথক পত্রযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আসন্ন সংসদ নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল করার অনুরোধ জানায়। জবাবে নির্বাচন কমিশন বলে যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশন বাধ্য এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দিবে। আওয়ামী লীগসহ প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। তারা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করে।

১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলগুলো ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঃ অসহযোগ আন্দোলন, সমাবেশ, অবরোধ, ১০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে গণমিছিল, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে একনাগাড়ে ৪৮ ঘন্টাব্যাপী হরতাল ইত্যাদি। ১৫ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের কর্মসূচীর কারণে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে ঢাকায় ৫% থেকে ১০% ভোটার ভোটদান করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ১৪ জনের মৃত্যু এবং সহস্রাধিক ব্যক্তির আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

১৬ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা দাবী করেন যে, বিরোধী দলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণ প্রহসনের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি প্রেসিডেন্টকে অবিলম্বে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের কোনো বিচারপতির কিংবা দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান।

৩ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিল পেশ করা হবে। বিরোধী দলগুলো তাঁর এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবীতে ৯ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১২ দিন যাবৎ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকার ফলে সারাদেশে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ১৯ মার্চ বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ঐদিনই ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে "জনতার মঞ্চ" নির্মাণ করা হয়। এ মঞ্চ থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাজনৈতিক বক্তৃতা, গণসংগীত ও আবৃত্তি প্রচার করা হতে থাকে। এসমাবেশে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী যখন মেনেই নিয়েছেন, তখন 'ভোট চোরদের' নিয়ে অবৈধ সংসদ চালাবার নাটক বন্ধ করুন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল ও নিজে পদত্যাগ করে মে মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন। ২৪ মার্চ "জনতার মঞ্চ" থেকে শেখ হাসিনার নামে হরতাল, অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সরকারের বিরুদ্ধে ৯০টি ওয়ার্ডে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ বিএনপি সরকার সংসদে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ বিলটি সংসদে আলোচিত হয়। সারারাত আলোচনার পর ২৭ মার্চ সকাল বেলা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী হিসেবে বিলটি গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করে দশজন উপদেষ্টা

www.pathagar.com

নিয়োগ করবেন। নির্দলীয় সরকার ৯০ দিনের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। এই সরকার পরবর্তী নয়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁর আগে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে রাজী না হন, তা'হলে রাষ্ট্রপতি কোন একজন নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করতে পারবেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা কিংবা উপদেষ্টাগণকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হলেও নতুন সংশোধনীতে তাঁকে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। তা'ছাড়া প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বও তাঁর হাতে দেয়া হয়।

২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা বেগম জিয়া বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল অনুমোদন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং পরবর্তী মে মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি অনুমোদন করেন।

বেগম জিয়ার লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

নবগঠিত কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ১২ জুন '৯৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

শেখ হাসিনার শাসনামলে রাষ্ট্র ও প্রশাসন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পর শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো দেশের জন্য একজন সর্বগ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দেয়া। তিনি রাষ্ট্রপতি পদটিকে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে এ পদে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

www.pathagar.com

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে মনোনয়ন দেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া সত্ত্বেও দলীয় কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন না দিয়ে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল

১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সামরিক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে উক্ত হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরপরই ১৯৭৫ সালে জারিকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে 'মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী' আখ্যায়িত করে তা বাতিল করার জন্য জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যার বিচার এবং চার নেতার জেল হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সংসদকে কার্যকর এবং মন্ত্রণালয়সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি

প্রায় দুই যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথাকথিত শান্তি বাহিনীর কার্যকলাপে অশান্তি বিরাজ করছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে সরকারী ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে ১২ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সরকারের বিশেষ প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে দীর্ঘ আলাপ-

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন শেখ হাসিনা

জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

শান্তিবাহিনীর নেতা শন্তু লারমার কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সৌদি বাদশাহ ফাহাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

আলোচনার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তির ফলে শান্তি বাহিনী ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সর্বপ্রথম অস্ত্র সমর্পণ করে এবং কয়েক দফায় শান্তি বাহিনীর ২০০০ সদস্যের অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত ১২ হাজারেরও অধিক উপজাতীয় পরিবারের ৬৪ হাজার ৪ শ' সদস্য দেশে প্রত্যাবর্তন করে। একজন উপজাতীয় সংসদ সদস্যকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠন করে একজন উপজাতীয় সংসদ সদস্যকে উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। চুক্তির আলোকে তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য স্থানীয় পরিষদ আইনসমূহ সংশোধন করা হয়। সরকার পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে ২২০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের চাকরীতে পুনর্বহালসহ ৭০৫ জন পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হয়। জাতিসংঘসহ দেশ বিদেশে এ শান্তি চুক্তি প্রশংসিত হয়। এ চুক্তির জন্য শেখ হাসিনাকে ইউনেস্কো পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তি

গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ক্ষেত্রে ভারতের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিলো। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালের পর থেকে কোন চুক্তি ছাড়াই গঙ্গার পানি বন্টিত হচ্ছিল এবং ভারত একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে নেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ফারাক্কায় দুই দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম বৈঠকে একটি যৌথ বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া পানি বন্টন চুক্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশন পুনরুজ্জীবিত হয়।

গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ

গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ঢাকায় তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা সম্মেলন ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থার পানি বিশেষজ্ঞগণ গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের অপরিহার্যতা বিষয়ে

www.pathagar.com

একমত হন এবং এ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে ভারত ও নেপাল পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এছাড়া গঙ্গাবাধ নির্মাণে আইডিবি, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাপান, ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড আর্থিক ও কারিগরি সহয়োগিতা দেয়ার আশ্বাস দেয়। উল্লেখ্য, গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের সাফল্য গড়াই নদীর পুনঃ খনন বাস্তবায়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই শেখ হাসিনার সরকার ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে গড়াই নদী পুনঃখনন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে।

১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যা ও খাদ্য পরিস্থিতি

১৯৯৮ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকা দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ বন্যাকবলিত হয়। এর ফলে দেশের ৫৩ টি জেলার ৩৭৫ টি থানার প্রায় ৩ কোটি লোক এবং ৯০ লক্ষ কৃষি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষি খাতে বন্যায় ৩ হাজার ৬শ' কোটি টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিশেষ করে আমন শস্য উৎপাদনে মারাত্মক ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে দেশে নিয়মিত খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪৩ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি পায়। বন্যা পরিস্থিতিতে দেশের কোন লোক যাতে না খেয়ে মৃত্যুবরণ না করে সেজন্য সরকার দ্রুতগতিতে খাদ্যশস্য দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছে দেয়। খাদ্য সংকট মোকাবেলায় ও আপদকালীন খাদ্যশস্য মওজুদ গড়ে তোলার জন্য সরকার বিশেষভাবে খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করে। নগদ অর্থে বিদেশ থেকে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশী দাতা ও সংস্থাগুলোর নিকট খাদ্য সাহায্যের আবেদন জানানোর ফলে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। সরকার নিয়মিত ৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সাহায্যের পরিবর্তে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মোট ১৬.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পায়। তন্মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বন্যা পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যেই দেশে এসে পৌঁছায়। আমদানি নীতি উদারীকরণের ফলে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বেসরকারী খাতে আমদানি করা হয়। এক হিসাবমতে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বেসরকারি খাতে আমদানি করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শেষে সরকারীভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মওজুদ থাকে। দেশে খাদ্য মওজুদ সন্তোষজনক থাকায় ভয়াবহ বন্যার পরেও কোন প্রকার খাদ্য সংকট দেখা দেয়নি। সাহায্য দাতাদের প্রদত্ত খাদ্য সাহায্যের দ্বারা ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ৪৪ লক্ষ দুঃস্থ ও গরীব পরিবারকে প্রতি মাসে ২০ কেজি করে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ১০ লক্ষ ন্যায্য মূল্য কার্ড এবং ওএমএস এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিক্ষেত্রের পুনর্বাসনের জন্য সরকার ৪৪ কোটি টাকার স্বল্পমেয়াদী কৃষি পুনর্বাসিন কর্মসূচী গ্রহণ করে। মধ্যমেয়াদী কর্মসূচীর আওতায় ১০১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার ৭টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদী কৃষি পুনর্বাসিন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৬৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ের ৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

শেখ হাসিনার আমলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন

১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে কৃষিখাতে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এ সময় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ২ কোটি ৫০ হাজার মেট্রিক টন। অপরদিকে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ২ কোটি ৫ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকার কৃষক ও কৃষিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি" প্রণয়ন করে। বীজ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার জন্য "বীজ আইন ১৯৭৩" সংশোধন করে "বীজ আইন সংশোধিত ১৯৯৭" প্রবর্তন করা হয়। সরকার কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য "বঙ্গবন্ধু পুরস্কার" পুনঃ প্রবর্তন করে। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়েছিল।

কৃষিঋণ বিতরণ

কৃষিঋণ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋণ তহবিলে সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকার শস্যঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। সরকার কৃষকদের সহজ শর্তে দ্রুত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। কৃষকরা আগের ঋণ পরিশোধ না করেও নতুন ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়; এমন কি বর্গাচাষীদের জন্যও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য শেখ হাসিনার সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬-৯৭ সালে অর্থনৈতিক খাতে ৫.৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার স্থলে

www.pathagar.com

দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ৫.৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ৫.২ শতাংশ বলে সরকার দাবী করেন। ১৯৯৮ সালে দেশে ভয়াবহ বন্যা পরেও প্রবৃদ্ধির এই হার সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন মহল থেকে সংশয় প্রকাশ করা হয়। বিএনপি সরকারের সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ মঈন খান বলেন, অর্থনীতির প্রত্যেকটি খাতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ বিগত বছরের চেয়ে কম। যে সমস্ত নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির হারকে ৫.২ ভাগে উন্নীত করার জন্য যেটা করা হয়েছে-তা হলো, একটি মাত্র খাতের মাত্রাতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি-তা হচ্ছে বোরো উৎপাদন। সরকার দাবী করেন যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্যই বোরো উৎপাদন ৮১.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.০৫ কোটি মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। একইভাবে গম উৎপাদন ১৮ লক্ষ মেঃ টন থেকে ২০ লক্ষ মেঃ টনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা '৯৯-তে প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনের ১১টি খাতের মধ্যে একমাত্র কৃষি খাত ছাড়া সকল খাতেই গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে শতকরা ৫ ভাগ যা গত বছর ছিল ২.৯ ভাগ। কোয়ারিং ও মাইনিং খাতে গত বছরের ৩২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২১.৫ ভাগে। শিল্প খাতে (মেনুফ্যাকচারিং) গত বছরের ৯.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। নির্মাণ খাতে ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রবৃদ্ধি ধরা হয় ৬.৫ ভাগ যা গত বছর ছিল ৭.০ ভাগ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সেনিটারী সেবা খাতে গত বছরের ৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। পরিবহন, মওজুদ ও যোগাযোগ খাতে ৬.৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬ শতাংশে, বাণিজ্য সেবা খাতে ৬.৭ ভাগ থেকে কমে ৫.৭ ভাগে, গৃহায়ণ সেবা খাতে ৩.৯ ভাগ থেকে ৩.৫ ভাগে, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতে ৮.৬ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে, ব্যাংক ও বীমা খাতে ৩.৭ ভাগ অপরিবর্তিত এবং বিভিন্ন সেবা খাতে ৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭-৯৮ দু'বছরে দেশে দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ১৭২টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়। ফলে ২ লক্ষ ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দ্রুতগতিতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এপরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ধরা হয়। এর মধ্যে সরকারী খাতে ৪৪ শতাংশ এবং বেসরকারী খাতে ৫৬ শতাংশ বিনিয়োগ ধরা হয়। মোট বিনিয়োগের ৭৮ শতাংশ অভ্যন্তরীণ সম্পদের এবং ২২ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে সংকুলানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

www.pathagar.com

রপ্তানি

১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৪ হাজার ৩৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত রপ্তানি আয় হয় ৪৪১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৮-৯৯ সালে রপ্তানী মাত্র ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সরকার রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার অতিরিক্ত মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, সিরাজগঞ্জ ও সৈয়দপুরে নতুন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনের কাজ হাতে নেয়।

আমদানীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্কহার ৪০%এ নামিয়ে আনা হয়েছে। ১০৭টি এইচএস কোডভুক্ত সমজাতীয় পণ্যের শুল্কহার সমান করা হয়েছে। আমদানি ও রপ্তানিকারক এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে সরকার প্রথমবারের মতো ৫ বছর মেয়াদী আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ

শেখ হাসিনার সরকার ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে 'দেউলিয়া আইন ১৯৯৭' এবং 'অর্থ ঋণ আদালত আইন ১৯৯১' এর সংশোধনী আনয়ন করে। ব্যাংকিং খাতকে সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে ব্যাংক সংস্কার কমিটি এবং আইন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকার ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনাদায়ী ১১ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণের মধ্যে ১৯৯৮ এর জুন পর্যন্ত ৩ হাজার কোটি টাকা আদায় হয়।

সরকার বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করে। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে মার্চ '৯৮ পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধীকৃত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১ হাজার ৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৫৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ সালে নিবন্ধীকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এর আওতায় দেশী বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাবের সংখ্যা ২৭৮টি। জুলাই '৯৮ পর্যন্ত ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী বিনিয়োগ দেশে এসে পৌঁছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ জোরদার করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

১৯৯৯ সালের ৩১ মে তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৫১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। ১৯৯১ সালের পর বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ

www.pathagar.com

এত নিম্ন পর্যায়ে আর কখনো নামে নি। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩০৭ কোটি ডলার। ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ২০৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। ১৯৯৭-৯৮ সালে ছিল ১৭৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল ১৭১ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

বেসরকারীকরণ

সরকারের বিরাষ্ট্রীকরণ নীতিমালার আলোকে ১৯৯৮ সালের জুন পর্যন্ত ১৮টি সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হয়। আরো ৬৮টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম বছরেই ৫২৫ কিঃমিঃ পাকা সড়ক, ৩৩৯ কিঃ মিঃ ইট বিছানো সড়ক ও ১০৪০৮ কিঃ মিঃ মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এ সময় ১৫০০ মিটার কংক্রিট সেতু, ৩২০ মিটার বহনযোগ্য ইস্পাত সেতু এবং ১০৭৬০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ সেতু এবং বাংলাদেশের একক বৃহত্তম স্থাপনা যমুনা সেতু উদ্বোধন করেন। শেখ হাসিনার সরকার উক্ত সেতুর নামকরণ করে "বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু"। প্রায় ৩৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও ১৮.৫ মিটার প্রস্থ সেতুটিকে রেল লাইন, গ্যাস, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সেতুর উপর রেলপথ নির্মাণের পাশপাশি রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন সেকশনে ৫০০ কিঃ মিঃ রেললাইন পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়।

শিক্ষা

শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি সরকারের বিবেচনার জন্য প্রতিবেদন পেশ করে। শেখ হাসিনার সরকার মনে করে যে '১৯৭৫ সালে জাতির জনকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ২১ বছর জাতীয়

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকসমূহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় বীরদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল।' এসরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের 'প্রকৃত ইতিহাস' তুলে ধরা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১২টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর্মসূচির অধীনে ৬ টির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এসময় বিভিন্ন মহিলা পলিটেকনিকসহ ১৬ টি পলিটেকনিক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে দেশে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৬% ভাগে উন্নীত হয়। ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ৫৬% ভাগে।

•

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ

আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৯৬-৯৮ সময়কালে দেশে মোট ২৩টি অনুসন্ধান ব্লকের মধ্যে ৮ টিতে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য স্থানীয় ও বিদেশী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। এ সময় অতি দ্রুততার সাথে কাজ সম্পাদন করে আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস পাইপলাইন চালু করে। ফলে চট্টগ্রামে অতিরিক্ত ৮২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এসময় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দৈনিক ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট-এর অধিক গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এযাবৎ কালের সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদনের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের ২ বছরের আমলে ৪টি প্রধান গ্যাস সঞ্চালন লাইনের কাজ সমাপ্ত করে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের নতুন কূপের গ্যাস জাতীয় সিস্টেমে সংযুক্ত হয়। এসময় সাংগু গ্যাস ক্ষেত্রটি উৎপাদনে আসে। যমুনা সেতুতে গ্যাস লাইন সংযুক্ত হওয়ায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হয়। দেশের আটটি ব্লকে উৎপাদন চুক্তির আওতায় চারটি কোম্পানী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কাজ করছে। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১২ টি ব্লকের জন্য দ্বিতীয় রাউন্ড বিডের প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করে ৫টি কোম্পানীকে চুক্তি চূড়ান্তকরণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। জ্বালানী সরবরাহে আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে কৈলাশটিলায় ১টি এলজিআই প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয় এবং মে '৯৮ থেকে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়। এ প্রকল্পে বছরে ৫ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি গ্যাস উৎপাদিত হবে।

www.pathagar.com

সরকার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সঞ্চালন ব্যবস্থাকে আলাদা করার জন্য 'পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ' গঠন করে। এ সংস্থা পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা অধিগ্রহণ করবে এবং পরিচালন, সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের দায়িত্বে থাকবে। সরকার ১৯৯৬ সালে বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী খুলনা, হরিপুর এবং শিকলবাহাতে বেসরকারী উদ্যোগে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে নীতিমালা গ্রহণ করা হয় তার আওতায় বেসরকারি পাওয়ার কোম্পানীগুলোকে ১৫ বছরের জন্য আয়কর মওকুফ এবং শুল্ক কর ও ভ্যাট ব্যতিরেকে মালামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। বেসরকারী খাতে (বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের সাথে ৪ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে ১৯৯৬-৯৮ সময়কালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ২৪,৩০৮ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ করে ৬৩০০টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ৭ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে।

টেলিযোগাযোগ

শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৯৬-৯৭ সালে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার নতুন ডিজিটাল টেলিফোন লাইন সংযোগ দেয়া হয়। এ সময় ১৩টি জেলার এক্সচেঞ্জকে পুরাতন এনালগ পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে পুরানো ঢাকায় ৬৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭ হাজার ৫০০ লাইনের নতুন ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উদ্বোধন করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়। গ্রাহকদের বহুবিধ পছন্দের সুবিধা প্রদানের জন্য সরকার তিনটি বেসরকারি কোম্পানীকে সেলুলার মোবাইল টেলিফোন চালু করার লাইসেন্স প্রদান করে। ফলে এখাতে দীর্ঘদিনের মনোপলি ব্যবসার অবসান ঘটে এবং প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এছাড়া এসময় পেজিং, রেডিও ট্রাংকিং ও রিভারাইন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য দু'টি কোম্পানী কাজ শুরু করে। আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ১৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়া টি এন্ড টি বোর্ড নিজস্ব অবকাঠামোতেও ইন্টারনেট ও ই-মেইল সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। সরকার প্রথমবারের মতো ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর চালু করে।

www.pathagar.com

সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম

শেখ হাসিনার সরকার গ্রাম বাংলার অসহায় দরিদ্র ও বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণে প্রথমবারের মতো বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করেন। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডের ১০ জন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দরিদ্র ব্যক্তি প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে বছরে ১২০০ টাকা বয়স্ক ভাতা পায়। ১০ জন বয়স্ক লোকের মধ্যে অন্তত ৫ জন মহিলাকে এ সুবিধা প্রদান করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচী

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন করা হয়। একই স্থানে "স্বাধীনতা স্তম্ভ" নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের প্রতীক হিসেবে টুঙ্গীপাড়ায় তাঁর মাজারকে ঘিরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ শুরু করা হয়। ঐতিহাসিক মুজিবনগরে "মুজিবনগর কমপ্লেক্স" স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরীতে ৩০% কোটা বরাদ্দ এবং শহীদ ও যুদ্ধাহত যোদ্ধার দু'জন অধ্যয়নরত সন্তানদের প্রত্যেককে ১৬০০ টাকা হিসাবে প্রতি বছর শিক্ষা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া প্রতি থানা বা ওয়ার্ডে ২ জন করে মোট ১৫০০০ টাকা সুদবিহীন প্রকল্প ঋণ দেয়া হয়। সরকার প্রবীণ ও সহায়-সম্বলহীন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা দিয়ে 'মুক্তিযোদ্ধা পল্লী' গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে।

আশ্রয়ণ কর্মসূচী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে সরকার ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য 'আশ্রয়ণ' নামে একটি আর্থ-সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রধানত উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় স্বল্পব্যয়ে ৩৫১টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩৫১০টি পরিবারের গৃহায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো

www.pathagar.com

৩৬৪টি ব্যারাক নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্পে পুনর্বাসিতদেরকে স্বামী-স্ত্রীর যৌথনামে বিনামূল্যে চিরস্থায়ীভাবে গৃহ ও গৃহস্থিত ৮ শতাংশ জমি প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য প্রতিজনকে ১০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়।

জনপ্রশাসন সংস্কার

শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জনপ্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন জন প্রশাসনের সংস্কারের লক্ষ্যে আংশিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ শেষ করে সরকারের নিকট দাখিল করে এবং সরকার তার কতিপয় সুপারিশ বিবেচনা করে (১৯৯৯)। সরকার ১৯৯৭ সালের জুলাই থেকে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন জাতীয় বেতন স্কেল নির্ধারণ করে। নতুন স্কেলে সর্বোচ্চ বেতন ১৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া মাসিক ১৫০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে টিফিন ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন এবং অফিসের সময়সূচী পরিবর্তন করে সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত নির্ধারণ করেন।

স্থানীয় সরকার কাঠামো

জনকল্যাণমুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই স্থানীয় সরকার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করেন। উক্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় সংসদে বিল উপস্থাপন করে। এর ফলে উপজেলা পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য আইন জারি করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের সরাসরি নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নের নবগঠিত ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে একটি করে মোট তিনটি আসন শুধু মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি মহিলাদের সাধারণ আসনের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রাখা হয়।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার তিন বছরের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের তিন বছরের (১৯৯৬-১৯৯৯) শাসনকাল সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয় দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে সরকারের বিশেষ সাফল্য হচ্ছে ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যা ও পরবর্তীকালে খাদ্য সংকট সফলভাবে মোকাবিলা করা। ফলে এত দুর্যোগের পরেও কোন প্রকার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। অপরদিকে সরকারীভাবে আর যেসব সাফল্যের দাবী করা হয় তন্মধ্যে রয়েছে গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, যমুনা সেতু চালু ইত্যাদি। এসকল বিষয়ে সরকার ঐতিহাসিক সাফল্যে দাবী করলেও বিরোধী দলগুলো তীব্র সমালোচনা করে থাকে।

গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের বিষয় চুক্তির মেয়াদ ১৯৮০ সালে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে চুক্তি ছাড়াই চলছিল। এ নিয়ে দু'দেশের সরকারী পর্যায়ে বহুবার যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোন সমঝোতা হয়নি এবং নতুন চুক্তি সম্পাদন বা পুরাতন চুক্তি নবায়নের ব্যবস্থা হয়নি। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরপরই ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতীত সরকারগুলোর ব্যর্থতা উল্লেখ করে দাবী করেন যে, তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়েছে। বিরোধী দল, বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞরা এ বলে চুক্তির সমালোচনা করেন যে, চুক্তিতে কোন প্রকার গ্যারান্টি ক্লজ রাখা হয়নি। ফলে বাংলাদেশ যদি শুকনো মৌসুমে ন্যায্য হিস্যা না পায় সেক্ষেত্রে কিছুই করার থাকবে না। এমন কি এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ তার ন্যায্য দাবী নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামেও তা উত্থাপনের অধিকার পাবে না। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিরোধী দলগুলো অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে যে, বাংলাদেশ গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। পদ্মার উজানে বহু খাল শুকিয়ে যাচ্ছে। পানির অভাবে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন শান্তি বাহিনীর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। তাঁদের মতে, ঐ চুক্তির ফলে দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করা হলো। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঐ চুক্তিকে 'বিষবৃক্ষের' সাথে তুলনা করেন। কথিত শান্তি চুক্তি বাতিলের দাবীতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলগুলো হরতাল, লংমার্চ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সরকার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এর ফলে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হতে বাংলাদেশী চাকমা শরনার্থীদের প্রত্যাবাসন

www.pathagar.com

শুরু হয় এবং সরকার ৬ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির তথা শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। ১০ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার নেতৃত্বে ৭৩৯ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৩-৬ মে '৯৮ তারিখ জাতীয় সংসদে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল এবং ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিল অনুমোদিত হয়। বিএনপি ও জামায়াত এ সময় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। বিরোধী দল অভিযোগ করে যে, যে সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনীর হাতে হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে সরকার তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কার দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আরোহণের পর পরই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা শুরু করার জন্য "ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স" বাতিল করে। এরপর শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঐ মামলার রায় ঘোষিত হয়। মোট ১৯ জন আসামীর মধ্যে ১৫ জন আসামীকে প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেয় আদালত। ২০ মাস ধরে এ মামলা চলে। ১৯ জন আসামীর মধ্যে ৭ জন আসামী কারাগারে এবং বাকী ১২ জন পলাতক। আসামী পক্ষ জেলা ও দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করে।

১৯৯৮ সালের ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা সেতু) উদ্বোধন করেন এবং বলেন, বঙ্গবন্ধু সেতু আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে এককভাবে একটি সুস্পষ্ট মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী বেগম জিয়ার সরকারের আমলে এ সেতুর ৭৫% ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। গঙ্গার পানি চুক্তি ও শান্তি বাহিনীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সমালোচিত হবার আরো একটি বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সেটি হচ্ছে ভারতকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুযোগ প্রদানের জন্য ২৮ জুলাই, ৯৯ তারিখে গৃহীত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ভারতের এক অংশ থেকে অন্য অংশে ভারতীয় পণ্য পরিবহনে সরকার সম্মত হয়েছে এবং প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো। সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো প্রতিবাদ করতে থাকে। হরতাল, রোডমার্চ, লংমার্চ, বিক্ষোভ, সংসদ বর্জন, সচিবালয় ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরোধী দলগুলো ভারতকে ট্রানজিট/করিডোর প্রদানের ঐ সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য দাবী জানায়। সরকার দাবী করে যে, ভারতকে ট্রানজিট বা করিডোর নয়; বরং ট্রান্সশিপমেন্টের সুযোগ দেয়া হবে। তাতে বাংলাদেশ বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা আয় করবে এবং ৯ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। বিরোধী দলগুলো সরকারের ঐ হিসাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারীভাবে ভিন্নভিন্ন হিসাব প্রদানকে 'হাস্যকর' বলে আখ্যায়িত করে। সর্বোপরি ট্রান্সশিপমেন্টের নামে

www.pathagar.com

ট্রানজিট/করিডোর দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে। সরকার অবশ্য বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করে।

১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রে জবাবদিহিতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, বিচারকরা তাদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচার বিভাগকে সরাসরি লক্ষ্য করে এমন মন্তব্য করেন যা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত কাজ করে। সকল মহল থেকে নিন্দার ঝড় ওঠে। সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সংবাদপত্র মহলে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। একই সময় সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য "জননিরাপত্তা আইন" নামে বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়নের কথা ঘোষণা করে। বিরোধী দলগুলো প্রস্তাবিত আইন বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্যাতন ও হয়রানির জন্যই প্রণীত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে সরকারের অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করে বিরোধী দল ও বুদ্ধিজীবী মহল সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার নিন্দা করেন।

শেখ হাসিনার তিন বছরের শাসনামলে আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটে। বিশেষ করে হত্যা, সন্ত্রাস ও নারী ধর্ষণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। পুলিশের নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রী ধর্ষণ হলে তার কোন কঠোর বিচার হয়নি। পুলিশ কর্তৃক বিএনপি'র মিছিলে একজন নারীর বস্ত্রহরণের ঘটনা সারা দেশে নিন্দার ঝড় তোলে। মার্কিন সরকারের মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়।

দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে ভারতমুখী ও নতজানু বলে অভিহিত করে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারি দলকে ভারতের স্বার্থে কাজ করার জন্য অভিযোগ করা হয়। ভারতের বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে অহরহ হামলা, ভারতের পুলিশ কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে অনুসন্ধান চালানো, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ইত্যাদি ঘটনায় শেখ হাসিনা সরকারের নীরবতায় সরকারকে ভারতমুখী নীতির জন্য সমালোচনা করা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার তিন বছরের শাসনে বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং কতিপয় ক্ষেত্রে নেতিবাচক ঘটনাবলি সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে। ১৯৯৬-৯৭ সালে শেয়ার বাজারে উত্থান-পতনের যে নাটকীয় ঘটনা ঘটে তা সরকারের ভূমিকাকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তোলে। অভিযোগ করা হয় যে, ভারতের মাড়োয়ারীদের চক্রান্তে বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ধস্ নামে এবং এতে বাংলাদেশের হাজার হাজার বিনিয়োগকারী পথে বসে এবং অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার তিন বছরের শাসনামলে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয় ১৫ বার। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব সরকারের ৩ বছরে ৮ বার, জিয়ার শাসমানলে ৩ বার এবং এরশাদের ৯ বছরের আমলে ১১ বার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর টাকার এত বড় ধরনের অবমূল্যায়ন আর করা হয়নি। শেখ হাসিনার ৩ বছরের শাসনকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে একটি দৈনিকের এক নিবন্ধে যা নিম্নরূপ ঃ

"..... গত তিন তিনটা বছর কি দেখছি আমরা? বর্তমান সরকারের বন্ধু-সহযোগী আত্মীয়স্বজন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক বিশাল অংশ আজ কি রকম ঋণ-খেলাপী এবং কাজের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ ভাগাভাগি বা লুটপাট তথা অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ ইত্যাদি অর্থনৈতিক রাজনীতির খেলায় উম্মাতাল। এ সরকারের এসব অর্থনৈতিক রাজনীতির ধাক্কা সামলাতে আজ সরকারি ব্যাংকগুলো প্রায় দেউলিয়া, শিল্পোৎপাদন নেমে এসেছে জিডিপির শতকরা ৩৮ ভাগে, রপ্তানির পরিমাণ কমে গেছে সর্বকালের নিম্নতম পর্যায়ে। বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য বৈষম্য আকাশ ছোঁয়া। বৈষম্য ভারতের সাথে ৯৯ ঃ ১-এ পৌঁছেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। দেশের শিল্প-কারখানাগুলো ক্রমাগত একের পর এক বন্ধ হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। দেশের একমাত্র স্টিল মিল আজ বন্ধ। কর্ণফুলী রেয়ন মিলও বন্ধের পথে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে।"

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সফররত প্রতিনিধিদলের নেতা লিন্ডা ইয়াংস ঢাকায় এক প্রতিবেদনে বলেন যে, সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনীহা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, চাঁদাবাজি, বিনিয়োগ সংকোচন নিষ্ফল পুঁজিবাজার, মাথাপিছু আয় ও রফতানি হ্রাস, শিল্পঋণ ও চলতি মূলধন প্রদানে ব্যর্থতাসহ বাজার অর্থনীতির আলোকে সংস্কারে পিছপা হওয়ার কারণে অর্থনীতিতে সংকট শুরু হয়েছে।" রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, বর্তমান সরকারের আমলে দেশে শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ গত তিন বছরের আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে ৩ থেকে ৪ ভাগ। তিন বছর আগে যে জিডিপি ছিল চার দশমিক ২ ভাগ, তা এখন কমে ৩ দশমিক ৬ ভাগ থেকে ৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। (ডঃ এস এম লুৎফর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব, ১১/৯/৯৯)

আওয়ামী লীগ সরকারের তিন বছর পূর্তির সময় ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাতে বিরোধী দলীয় এমপি ডঃ আবদুল মঈন খান উল্লেখ করেন ঃ

"দেশের প্রবৃদ্ধি আসে মোট ১১টি খাত থেকে। এছাড়া ২টি খাতকে আরো বিভক্ত করলে সেখানে রয়েছে অতিরিক্ত ৬টি উপখাত। আশ্চর্যের বিষয় খাত-উপখাত মিলিয়ে

www.pathagar.com

১৫টি লাইন আইটেমের একটিমাত্র উপখাত ব্যতিরেকে কোথাও বিগত বছরের চেয়ে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ এ বছর বাড়েনি। বর্তমান পরিসরে কেবলমাত্র একটি উদাহরণই দেবো। শিল্পখাতের অবস্থা তো রীতিমত শোচনীয়। বিগত বছরের শতকরা ৯.৫ ভাগ থেকে একেবারে বর্তমান বছরে সাকুল্যে ২.৫ ভাগ। দেশী ও বিদেশী খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদরা যেখানে বারবার বলেছেন, বর্তমান বছরে অর্থনীতির হার শতকরা ৩.৬-৩.৮ ভাগের উপরে কিছুতেই যেতে পারে না–বর্তমান সরকারের দাবি শতকরা ৫.২ ভাগ, যা সর্বমহলে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হলো, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় নিজেই উল্লেখ করেছেন বিআইডিএস এবং এডিবি-এর শতকরা ৬ ভাগ। সেই ৬ ভাগ পুষিয়ে আরও অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.২ ভাগ। তাদের এ হিসাবের ফলশ্রুতিতে বর্তমান বছরের প্রবৃদ্ধি আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা সম্ভবত আর অধিক আলোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়।"

দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, আগামী মাসগুলোতে সংস্কার কর্মসূচির অগ্রগতি না হলে সহজ ও সুবিধাজনক শর্তে বিশ্ব ব্যাংক, আইডিএ, আইএমএফ থেকে ঋণ পাওয়ার পথ সংকুচিত হতে পারে। দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো ভঙ্গুর ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বেসরকারিকরণের অচলাবস্থা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লংঘনে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের মধ্যবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক ফ্রেডারিক টি টেম্পল দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের এই উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি বলেছেন, দাতা দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সংস্কার কাজে ধীরগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা উল্লেখ করেছে, কাঠামোগত সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনও বিলম্বিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, সংস্কার কর্মসূচির যদি অগ্রগতি না হয় তাহলে বাংলাদেশকে আইডিএ'র অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব হবে না।

বৈঠকে অনুরূপ উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন বাংলাদেশে আইএমএফ প্রতিনিধি। মিঃ ফ্রেডারিক টেম্পল তার মন্তব্যে বলেন, বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার জন্য যে কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন বাংলাদেশ সরকার তেমন কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী জনাব কিবরিয়া যদিও তার সরকারের শক্তিশালী অর্থনৈতিক কর্মসূচি অনুসরণ করার কথা বলেছেন, কিন্তু দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের ধীরগতির সংস্কার কাজে বার বার তাদের হতাশা প্রকাশ করে চলেছেন।

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাংক আবাসিক পরিচালক ফ্রেডারিক টি টেম্পল বলেন, সরকার সাধারণভাবে উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করলেও পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে যে কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন তা বাস্তবায়ন করতে অত্যন্ত সীমিত সাফল্যই অর্জন করেছে। সরকারের বেসরকারিকরণ কর্মসূচি অচল হয়ে পড়েছে। সরকারি খাতগুলোতে সরকারি সম্পদের অপচয় হচ্ছে। আর্থিক খাতের কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু করা হলেও ব্যাংকিং-এ ভঙ্গুর অবস্থা অব্যাহত রয়েছে যা বেসরকারি খাতের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি বলেন, বিদ্যুৎ খাতের এবং চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান অত্যন্ত নিচু। তিনি বলেন, অম্বুডসম্যানের নিয়োগ এখনো হয়নি, মানবাধিকার কমিশন গঠনে আইন তৈরির বিষয়টি এখনো ঝুলছে। বিশ্বব্যাংক পরিচালক বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সেই সাথে ব্যবসায়ী মহল সহিংসতা ও চাঁদাবাজির শিকার হয়ে পড়ছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি প্রসঙ্গত গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংকের পর্যালোচনা বোর্ডের অগ্রগতি রিপোর্টের বরাত দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের কয়েকটি মূল দাতাদেশ সংস্কার কাজের অব্যাহত ধীরগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে পরামর্শ দিয়েছে যে, আগামী মাসগুলোতে যদি সংস্কার কাজে পর্যাপ্ত অগ্রগতি না হয়, তাহলে বর্তমান পর্যায়ের আইডিএ সহায়তা পাওয়া কঠিন হবে। বিশ্বব্যাংক আবাসিক পরিচালক হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, সেভাবেই ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব সহকারে ভালভাবে বাংলাদেশের সংস্কার কাজের অগ্রগতি মনিটর করতে বলা হয়েছে। ফলে এভাবে সত্যিই এটি একটি বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যে, যদি সংস্কার কাজের গতি ত্বরান্বিত না হয়, তাহলে বাংলাদেশের জন্য সুবিধাজনক শর্তে আইডি-এর অর্থ পাওয়ার সুযোগ সংকুচিত হবে।

ফ্রেডারিক টি টেম্পল সম্প্রতি প্রকাশিত "সাহায্য নিরূপণ পর্যালোচনার" কথা উল্লেখ করে বলেন, অনুকূল আভ্যন্তরীণ নীতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে কার্যকর সাহায্য পাওয়ার বিষয়টি দাতাদেশগুলো গুরুত্বারোপ করছে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলো কিভাবে তাদের প্রাপ্ত সাহায্য ব্যবহার করছে। আগামী বছরগুলোতে সাহায্য পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে, গ্রহিতা দেশগুলোর বিরাজমান অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবেশের ওপর।

বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক ফ্রেডারিক টি টেম্পল বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশে বর্তমান প্রশাসন ও মানবাধিকার প্রশ্নে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সরকারের এসব পদক্ষেপে ঢাকায় শহরাঞ্চলের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথমত নারায়ণগঞ্জে পতিতাদের উচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় ঢাকায় বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ। তাদের আগাম কোন নোটিশ না দিয়ে এবং তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা

www.pathagar.com

না করে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি বলেন, সুশীল সমাজের অন্যান্য গ্রুপগুলোর মত দাতাদেশ ও সংস্থাগুলোও মনে করে যে, এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লংঘন করেছে এবং এতে করে সরকারের প্রশাসনিক সংকটের বিষটি ধরা পড়ে। তিনি বলেন, এসব পতিতালয় ও বস্তিতে অপরাধীরা আশ্রয় নিয়ে থাকে বলে সরকার দাবি করলেও তাদের প্রদক্ষেপে অপরাধীরা নয়–অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। তাদের দুর্ভোগই শুধু বেড়েছে। তাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) একই ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে যে, বাংলাদেশের জন্য সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করবে সংস্কারের ব্যাপারে কতটা অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তার ওপর।

আইএমএফ-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি বলেন, অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রগতির ব্যাপারে গত এপ্রিল মাসে দাতাদের পক্ষ থেকে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়ছিল ৬ মাস পরে তারই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশী-বিদেশী দু'ধরনের বিনিয়োগই মন্থর ও বেসরকারি খাতের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সন্তোষজনক নয় এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া এখনো ভঙ্গুর পর্যায়ে রয়েছে। আইএমএফ অনুৎপাদনশীল খাত বিশেষ করে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধিরও তীব্র সমালাচনা করে। আইএমএফ প্রতিনিধি সামরিক বাহিনীর জন্য মিগ যুদ্ধবিমান ক্রয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এটা উদ্বেগের একটা বড় কারণ। গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাতে বিদেশী বিনিয়োগের প্রেক্ষাপটে একটি ভারসাম্য রক্ষার জন্য গ্যাস রফতানির ব্যাপারটি বিবেচনার জন্য আইএমএফ পরামর্শ দিয়েছে। দাতারা বলেন যে, বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় কোন অগ্রগতি হয়নি। যদিও আর্থিক খাতে সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে; তবুও ব্যাংকিং খাত এখনো ভঙ্গুর অবস্থানে রয়েছে। তারা বলেন, বিদ্যুৎ খাত ও চট্টগ্রাম বন্দর এত খারাপভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে যে, এর ফলে ব্যবসার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার মান খুবই নীচু বলে তারা মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. আব্দুল মতিন, শেখ হাসিনা একটি রাজনৈতিক আলেখ্য, রেডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, রেডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৩. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনা ঃ ডটার অব ডেমোক্রেসি (এ প্রোফাইল), ঢাকা, ১৯৯১।

৪. বেবী মওদুদ (সম্পাদিত), জনতার জয়, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

৫. মনির হোসেন (সম্পাদিত), বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে গণ-অভ্যুত্থান '৯০; রানা, ঢাকা।

৬. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদে ১৯৯৯ বছরের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

৭. এসএমএএস, কিবরিয়া, বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী, ১৯৯৯ সালে জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতা।

৮. দৈনিক ইনকিলাব, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ও ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

৯. উন্নয়নের তিন বছর, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১০. আবুল কাসেম হায়দার, ট্রান্সশিপমেন্ট, ট্রানজিট, করিডোর, ঢাকা ঃ প্যানোরমা পাবলিকেশন, ১৯৯৯।

১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

www.pathagar.com

ISBN 984-31-0529-X